শক্তিশালী সামরিক বাহিনীর স্বপক্ষে

মোবায়েদুর রহমান

শক্তিশালী সামরিক বাহিনীর স্বপক্ষে

মোবায়েদুর রহমান

রিদম প্রকাশনা সংস্থা

www.pathagar.com

©
লেখক

প্রথম প্রকাশ
একুশে বইমেলা ২০০৩

প্রকাশক
মোঃ গফুর হোসেন
রিদম প্রকাশনা সংস্থা
৩৪, নর্থব্রুক হল রোড, (৩য় তলা)
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রচ্ছদ
নাজিম উদ্দিন মামুন

বর্ণ বিন্যাস
কম্প্রিন্ট মিডিয়া এন্ড পাবলিশার্স
৩৪, নর্থব্রুক হল রোড, (৩য় তলা)
বাংলাবাজার, ঢাকা।

দাম ঃ ১২০.০০ টাকা

Shaktishali Shamorik Bahinir Shopokkhe

By: Mobaidur Rahman Published by
Md. Gofur Hossain, Rhidom Prokashona
Songstha, 34 North Brook Hall Road,
Banglabazar, Dhaka-1100
Phone : 0171328720
Price : Taka 120.00 Only.
US $ 8
ISBN 984 - 8319 - 04-2

www.pathagar.com

উৎসর্গ

আমার একমাত্র পুত্র **আদনান শাহরিয়ার সজীব**। এখন অষ্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েলস্ বিশ্ববিদ্যালয়ে তথ্য বিজ্ঞানে এম, এস করছে। ১২/১৩ বছর আগে সজীব আমার লেখাগুলোর ডিক্টেশন নিতো। লেখা ছাপা হলে পত্রিকা বগলে নিয়ে ওর প্রিয় টিচার আলী আহম্মদ স্যারকে দেখাতো। দেখিয়ে পির্তৃ গর্বে অপার আনন্দ পেত। সুদূর অষ্ট্রেলিয়ায় অধ্যয়নরত আমার আদরের সন্তান সজীবের আনন্দ ও উচ্ছাস এর প্রতি গ্রন্থটি উৎসর্গীকৃত হল।

মোবায়েদুর রহমান

www.pathagar.com

রিদম প্রকাশনা সংস্থা থেকে প্রকাশিত
লেখকের অন্যান্য বই

- ❒ বাংলাদেশ ভারত সম্পর্ক
- ❒ রাজনীতির দশ দিগন্ত
- ❒ মার্কিন বর্বরতা আফগানিস্তানের পর ইরাক
- ❒ সাবলাইম মেডিটেশন

www.pathagar.com

আমার কথা

অবশেষে 'শক্তিশালী সামরিক বাহিনীর স্বপক্ষে' গ্রন্থটি প্রকাশিত হল। এ জন্য সর্বাগ্রে শুকরিয়া জানাই আমার সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তাকে।

এই গ্রন্থটি প্রকাশে আমি ব্যক্তিগতভাবে অত্যন্ত আনন্দিত। কারণ এই বইয়ের বিষয়বস্তুর সাথে আমার সম্পর্ক আবেগের। সেই আবেগ ছাপার কালো কালিতে মূর্ত হলো, সে জন্যই আমার এই আনন্দ। এই গ্রন্থের বিষয়বস্তুর সাথে আমার সম্পর্ক আবেগের কেন এই প্রশ্নের একটি জবাব দেওয়া দরকার।

১৯৬৭ সালের আরব ইসরাইল যুদ্ধে আরববিশ্ব শোচনীয় মার খাওয়ায় আমি একদিকে যেমন প্রচণ্ড আহত হই, অন্যদিকে তেমনি হতভম্ব হয়ে পড়ি। কারণ ইসরাইল তখন ছিল একটি লিলিপুট। তাঁর চারধারে মিশর, সিরিয়া, জর্ডান, লেবানন ইত্যাদি রাষ্ট্র। আসলে ঐ যুদ্ধে ইসরাইলকে চারদিক থেকে গিলে খাওয়ার কথা। অথচ ঘটনা ঘটলো সম্পূর্ণ বিপরীত। ইসরাইল বরং মিশর, সিরিয়া ও জর্ডানের বেশ কিছু অংশ দখল করে বসলো। এটা কেমন করে সম্ভব হলো? তখন বয়স ছিল অনেক কম। ঘটনাটি ছিল ৩৬ বছর আগেকার। সুতরাং আজকের মত বয়স ছিল না অত পরিণত, অথবা আজকের মত তথ্য প্রবাহ এত উন্নত ও অবাধ ছিল না। তাই ইসরাইল কেন এই গাবুর মার দিতে পারলো সেটা বুঝতে পারিনি। কিন্তু প্রশ্নটি অনুক্ষণ আমার মনে নাড়া দিয়ে যাচ্ছিল। এরপর থেকেই সামরিক বা প্রতিরক্ষা বিষয়ে আমার জানার আগ্রহ বাড়তে থাকে। আমি তখন থেকেই এ বিষয়টি নিয়ে নাড়া চাড়া করতে থাকি।

এখানে প্রাসঙ্গিকভাবে দু'একটি পারিবারিক সাহায্য ও সহায়তার কথা না বললে আমার বক্তব্য অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। আমার আপন ছোট বোন ইংল্যাণ্ডের ম্যানচ্যাষ্টারে থাকে। ওর নাম রুমী শাহ্‌রিনা আরজু। ডাক নাম পলিনা। ঢাকা ভার্সিটি থেকে রাষ্ট্র বিজ্ঞানে অনার্স ও এম, এ করে ও এখন স্বামী সন্তানসহ ইংল্যাণ্ডের স্থায়ী বাসিন্দা। আমার আগ্রহের কথা জানতে পেরে পলিনা বিশ্বের সবচেয়ে মর্যাদাবান ও নির্ভরযোগ্য সামরিক জার্নাল মিলিটারী ব্যালান্স ইংলিশ পাউন্ড দিয়ে কিনে আমার কাছে পাঠায়। আমার ছোট ভাই মাহমুদুর রহমান মান্না বর্তমানে আওয়ামী লীগের অন্যতম কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক। সে প্রায় এক যুগ আগে যখন প্রথম আমেরিকা যায়, তখন আমার জন্য কিছু সামরিক তথ্য সম্বলিত বইপত্র ও ম্যাগাজিন কিনে আনে। এসব বই পড়ে পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের সামরিক শক্তি সম্পর্কে একটি প্রাথমিক ধারণা লাভ করি। এসব পত্রপত্রিকায় শুধুমাত্র অস্ত্রশস্ত্রের ফিরিস্তিই থাকে না, থাকে বিভিন্ন দেশের সামরিক চিন্তাধারা এবং মিলিটারী স্ট্র্যাটেজি। এ ছাড়া ঢাকায় স্থানীয়ভাবে আরো কিছু বইপত্র ও সাময়িকী যোগাড় করি। এসব পত্রপত্রিকা, সাময়িকী ও গ্রন্থপাঠ তথা গবেষণার পর আমার বুঝতে আর কোনো অসুবিধা হয় না যে ইসরাইল কেন আরবজাহানকে সন্ত্রস্থ রেখেছে।

www.pathagar.com

এই উপলব্ধির পর বাংলাদেশের নিরাপত্তা ভাবনা আমাকে আন্দোলিত করে। অবাক ব্যাপার হল এই যে, বাংলাদেশেরই এক শ্রেণীর লেখক, সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবি প্রকাশ্যে বলেন যে, বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা নিহিত রয়েছে ভারতে। অনেকে বলেন যে, বাংলাদেশ যুদ্ধ করবে কার সাথে? ভারত বিশাল প্রতিবেশী। তার সাথে যুদ্ধ করে আমরা কয় ঘন্টা টিকে থাকতে পারব? সুতরাং তাদের সুপারিশ হল এই যে, বাংলাদেশের তেমন বড় একটি সেনাবাহিনী রাখার প্রয়োজন নাই।

এসব প্রচারণা আমি একাডেমিক পর্যায়ে বিচার বিশ্লেষণ করি। তখন আমার সামনে আসে হংকং, তাইওয়ান, সিঙ্গাপুর, কিউবা প্রভৃতি রাষ্ট্রের উদাহরণ। আমার এই উপলব্ধি ঘটে যে, আমাদের চারপাশে ভারত– এটি যেমন সত্যি এবং এটি যেমন বাংলাদেশের জন্য একটি বিয়োগ চিহ্ন, তেমনি পশ্চিম ভারত ও পূর্ব ভারতের মধ্যে অবস্থিত হওয়ায় এই ভৌগোলিক অবস্থান বাংলাদেশের জন্য একটি বিরাট যোগ চিহ্ন। আমি ভাবতে থাকি। ভারতের কঠোর বাস্তবতা বিবেচনায় রেখেও বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা নীতি কি হওয়া উচিত সেটা নিয়ে অবশেষে একটি সুচিন্তিত ধারণায় উপনীত হয়েছি। আমার সেসব ধারণা 'ইনকিলাব', 'দিনকাল', 'সংগ্রাম' 'মর্নিংসান,' 'বাংলাবাজার পত্রিকা, 'ঢাকা ডাইজেস্ট', সাপ্তাহিক 'পূর্ণিমা' প্রভৃতি পত্রিকায় প্রবন্ধ নিবন্ধের মাধ্যমে জনগণের কাছে পেশ করেছি। এখন সেগুলোকে সংকলন করে 'শক্তিশালী সামরিক বাহিনীর স্বপক্ষে', নাম দিয়ে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করলেন রিদম প্রকাশনা সংস্থার স্বত্ত্বাধিকারী জনাব মোঃ গফুর হোসেন।

দীর্ঘদিন আধা সরকারী চাকরি করার পর আমি যখন লেখালেখির জগতে ফিরে আসি তখন শুরুটা হয়েছিল সামরিক বিষয় নিয়ে। আজ থেকে একযুগ আগে আমাকে অনেকে ডিফেন্স এ্যানালিষ্ট বলে সম্বোধন করতে থাকেন। পরবর্তীকালে অবশ্য আমি রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি, সাহিত্য, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক প্রভৃতি বিষয় নিয়ে লেখালেখি শুরু করি। যেহেতু প্রতিরক্ষা বিষয় নিয়ে আমার লেখালেখি শুরু এবং প্রতিরক্ষা বিষয়ে বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা নীতি সম্পর্কে আমি একটি রূপরেখা আঁকতে সমর্থ হই তাই প্রতিরক্ষা ভাবনার সাথে আমার আবেগ জড়িত। সেজন্যই শুরুতে বলেছি যে, এই বইটির সাথে জড়িত আমার আবেগ। তাই আমি আনন্দিত।

প্রতিরক্ষা বিষয় সম্পর্কে আমি যখন লিখে চলেছি তখন আমি একটি মারাত্মক সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হয়ে শয্যাশায়ী ছিলাম। তখন আমার একমাত্র পুত্র আদনান শাহরিয়ারের বয়স ছিল ১৩ বছর। সে তখন নবম শ্রেণীর ছাত্র। সেই কচি বয়সে সে আমার ডিক্টেশন নিত। আজ সে বুয়েট থেকে পাশ করার পর একজন প্রকৌশলী। তথ্যপ্রযুক্তি তথা তথ্যবিজ্ঞানে সে অস্ট্রেলিয়ার নর্থ সাউথ ওয়েলস বিশ্ববিদ্যালয়ে এম, এস করছে। এই বই প্রকাশের আবেগঘন মুহূর্তে আমি ওকে খুব মিস করছি। আমার জৈষ্ঠ্য কন্যা শাহনামা

www.pathagar.com

শারমিন সুচী তখন ভিকারুন নিসা নুন স্কুলের ছাত্রী। এখন সে অনার্স এবং এম, এ করে স্কলাস্টিকা স্কুলের শিক্ষিকা। সেও আমার অনেক ডিক্টেশন নিয়েছে। ওদের আম্মা জিনাত রহমান শুধু আমার জীবন সঙ্গিনী নন, আমার লেখালেখির জগতেরও সক্রিয় সহকারী। আমার জায়া ও পুত্র কন্যার সহযোগীতা ছাড়া আমার লেখাগুলো কলমের কালিতে বন্দী হতো না এবং আজ গ্রন্থাকারে সূর্যের মুখ দেখত না।

আমার অনুজ প্রাক্তন ডাকসু ভিপি ও বর্তমানে আওয়ামী লীগ নেতা মাহমুদুর রহমান মান্না এবং ইংল্যাণ্ড প্রবাসী অনুজা রুমী শাহরিনা আরজু পলিনার বইপত্র না পেলে আমার শুরুটা সম্ভব হত কিনা জানিনা। ধন্যবাদ জানিয়ে ওদেরকে ছোট করতে চাই না।

প্রকাশক জনাব মোঃ গফুর হোসেন আমার যেসব বই প্রকাশ করবেন তার মধ্যে এই বইটিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তাই বইটির প্রকাশ সম্ভব হল। দৈনিক ইনকিলাব এসব লেখা প্রকাশ না করলে প্রতিরক্ষা বিশ্লেষক হিসেবে আমি পরিচিত হতাম না। তাই 'দৈনিক ইনকিলাব', 'দৈনিক দিনকাল' অধুনালুপ্ত 'মিল্লাত', 'ঢাকা ডাইজেস্ট', 'মর্নিংসান', 'বাংলাবাজার পত্রিকা', 'সংগ্রাম' প্রভৃতি পত্রিকার প্রতি রইল আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা। প্রতিরক্ষা ভাবনা সম্পর্কে বিশেষ করে শক্তিশালী সামরিক বাহিনীর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে এই বই পড়ে কিছুসংখ্যক বাংলাদেশীও যদি সচেতন হন তাহলে এই গ্রন্থের প্রকাশ সার্থক হবে বলে আমি মনে করি।

মোবায়েদুর রহমান

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

জনাব মোবায়েদুর রহমানের সাথে বিভিন্ন সময় আলাপ-আলোচনার এক পর্যায়ে আমি জানতে পারি যে, বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সামরিক বিষয় সম্পর্কে তিনি প্রচুর লেখালেখি করেছেন এবং এখনো করে যাচ্ছেন। আলোচনার এক পর্যায়ে সামরিক বিষয়ে প্রকাশিত তাঁর রচনাবলীর কয়েকটি পাণ্ডুলিপি দেখার সুযোগ আমার হয়। আমি তখন তাঁর কাছে প্রস্তাব দেই যে, এই বিষয়ে তাঁর একটি গ্রন্থ আমি প্রকাশ করতে চাই। জনাব মোবায়েদুর রহমানও আমার প্রস্তাবে সানন্দে সম্মতি জ্ঞাপন করেন।

সামরিক বিষয় সম্পর্কে এ ধরনের একটি গ্রন্থ প্রকাশে আমার আগ্রহী হওয়ার অনেকগুলো কারণ রয়েছে। সকলেই জানেন যে, বাংলাদেশে সামরিক বাহিনী বা সামরিক বিষয় সম্পর্কে তেমন একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি। কালেভদ্রে যে দু'একটি গ্রন্থ চোখে পড়ে তাও প্রচারধর্মী। সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহ প্রতিরক্ষা দপ্তরে বিশেষ করে সামরিক বাহিনীর উন্নয়ন সম্পর্কে ক্রোড়পত্র বা বুকলেট প্রকাশ করেন। কিন্তু আমাদের এবং বিদেশের অন্যান্য দেশের সামরিক বাহিনী এবং তার তিনটি শাখার বিন্যাস কেমন সে সম্পর্কে বলতে গেলে কোন তথ্যই পাওয়া যায় না। সমরাস্ত্র সম্পর্কে কোন তথ্য বা পরিসংখ্যান পাওয়া বলতে গেলে প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। অনেকে জানেন না যে, এ সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্য কোথায় পাওয়া যাবে।

জনাব মোবায়েদুর রহমানের প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত কয়েকটি লেখা পড়ে বুঝলাম যে তার লেখাগুলো সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমী। কারণ আমি দেখলাম তার রচনাবলীতে তিনি সেনাবাহিনী, বিমানবাহিনী এবং নৌবাহিনী সম্পর্কে খাতওয়ারী ও শাখাওয়ারী তথ্য ও পরিসংখ্যান দিয়েছেন। বাংলাদেশ বা অন্য কোন দেশের সমরশক্তি কত। সংশ্লিষ্ট দেশটির আর্মীতে জনবল কত রয়েছে, নৌ ও বিমানবাহিনীতে জনবল কত, কতগুলো ট্যাঙ্ক, কতগুলো জঙ্গী বিমান, কতগুলো সাবমেরিন, কতগুলো ডেস্ট্রয়ার বা ফ্রিগেট রয়েছে তার খুটি নাটি বিবরণ দিয়েছেন। সেই দেশটিতে পারমাণবিক বোমা রয়েছে কি না, ক্ষেপনাস্ত্র আছে কিনা, এসব তথ্যও তিনি সন্নিবেশ করেছেন। শুধু অস্ত্রের বিবরণ এবং সংখ্যাই দেননি। কোন উৎস হতে সেসব অস্ত্র সংগৃহীত হয়েছে তারও বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। তাঁর লেখায় আমি আরো দেখতে পেলাম ওপরের বর্ণনাগুলো দিয়েই তিনি শেষ করেননি। তিনি সংশ্লিষ্ট দেশের সামরিক ভাবনা এবং প্রতিরক্ষা স্ট্র্যাটেজিও বর্ণনা করেছেন। সত্যি কথা বলতে কি, এ ধরনের আলোচনা বিশ্লেষণ এবং সামরিক অবস্থার প্রজেকশন সম্বলিত গ্রন্থ বাংলাদেশে একটিও নাই।

জনাব মোবায়েদুর রহমান ইতিমধ্যেই একজন ডিফেন্স এ্যানালিস্ট হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনি ডিফেন্সের অনেক গভীরে প্রবেশ করেছেন। আমার মনে হল এই সব ব্যাপক তথ্য পরিসংখ্যান নিয়ে একটি বই যদি প্রকাশিত হয় তাহলে প্রতিরক্ষার এই অজানা জগতটি সাধারণ মানুষের কাছে কিছুটা হলেও উন্মোচিত হবে। সেই প্রত্যাশা নিয়েই এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হল।

বাংলাদেশের বর্তমান সমরশক্তি প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। কেন আমাদের সামরিক শক্তি বাড়ানো দরকার সে সম্পর্কে একটি ধারণা গঠনে এই বইটি কিছুটা হলেও যদি সাহায্য করে তাহলে এই গ্রন্থের প্রকাশ স্বার্থক বলে বিবেচনা করব।

মোঃ গফুর হোসেন

www.pathagar.com

সূচিপত্র

বাংলাদেশের শক্তিশালী সামরিক বাহিনী আফগান ও ইরাকের শিক্ষা /১১
স্বাধীনতার স্বার্থে শক্তিশালী প্রতিরক্ষা / ১৯
সামরিক শক্তির স্বপক্ষে / ২৬
যদি ভারত বাংলাদেশের বিরুদ্ধে হামলা চালায়, তা'হলে...?/ ৩২
বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা ঃ ভারতীয় জুজু ঃ কিউবা ও তাইওয়ানের শিক্ষা / ৩৭
বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা ঃ গোল টেবিল বৈঠকে লেখকের বক্তব্য / ৪০
শক্তিশালী সামরিক বাহিনীর সন্ধানে /৪৮
সামরিক ব্যয় ঃ ভারত পাকিস্তান বাংলাদেশ / ৫১
সামরিক দর্শন ঃ মুজিব, জিয়া, এরশাদ, খালেদা / ৫৮
সামরিক শক্তিতে বার্মা বাংলাদেশের চেয়ে এগিয়ে / ৬৪
হয় এ্যাটম বোমা না হয় ডিফেন্স প্যাক্ট –ড. তালুকদার মনিরুজ্জামান / ৬৮
দোহাই, সামরিক বাহিনীকে বিতর্কে জড়াবেন না / ৭৩
এয়ার ভাইস মার্শাল জামাল উদ্দিনের ইন্টারভিউ ঃ কতিপয় জলন্ত প্রশ্ন / ৭৮
গণচীন থেকে এফ-৭ জঙ্গী বিমান ক্রয় নিয়ে একটি মিথ্যাচার / ৮২
৪টি মিগ-২৯ অচল ঃ স্যাবর এফ-৮৬ এ-৫ এফ-৬ এফ-৭ এবং মিগ-২১এর প্রসঙ্গ কথা / ৮৭
মাত্র ৮টি মিগ-২৯ জঙ্গী বিমান ক্রয় নিয়ে অসংখ্য অভিযোগ / ৯২
সীমান্তে রক্তপাত ঃ ছায়ার সাথে যুদ্ধ / ৯৬
বাংলাদেশে মিগ-২৯ জঙ্গী বিমান ঃ রুশ ভারত অক্ষশক্তির বিপজ্জনক পুনরুত্থান / ১০১
শেখ হাসিনার সামরিক দর্শন / ১০৬
ভারতীয় 'অগ্নির' লেলিহান শিখা / ১১০
সোফা ও হানা ঃ থাকে শুধু অন্ধকার মুখোমুখি বসিবার, বনলতা সেন / ১১৪
পৃথ্বী বনাম শাহিন, ঘোরী বনাম অগ্নি কেহ কারে নাহি পারে সমানে সমান / ১১৯
মুসলিম বিশ্বের সমর সম্ভার ঃ একটি তুলনামূলক আলোচনা / ১২৩
আণবিক যুদ্ধের দুয়ার থেকে ফিরে এসেছে পাক-ভারত / ১৩০
ভারতের নসীহৎ ঃ কুজোও চায় চিৎ হয়ে শুতে / ১৪৬
পাকিস্তান ও ভারতের নিজস্ব অস্ত্র উৎপাদন / ১৪৯
সর্বশেষ ঃ ভারত ইরান প্রতিরক্ষা চুক্তি ঃ পাকিস্তানের কি হবে? / ১৫২
ভারতের মোকাবেলায় হাইড্রোজেন বোমা নির্মাণের পথে পাকিস্তান / ১৫৬
নৌশক্তি বৃদ্ধি ঃ আধিপত্য বিস্তারের নীলনকশা / ১৫৯

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বাংলাদেশের শক্তিশালী সামরিক বাহিনী ঃ আফগান ও ইরাকের শিক্ষা

আমেরিকা কর্তৃক ইরাক দখলের সবচেয়ে বড় শিক্ষা হলো ডকট্রিন অব প্রিয়েম্পশন (Doctrine of Preemption)। এই ডকট্রিন বা তত্বটি বাংলাদেশের জন্য বিশেষভাবে প্রযোজ্য। আমেরিকা ইরাক দখলের জন্য একেক সময় একেক বাহানা খাড়া করেছে। প্রথমে বললো যে ইরাকে গণবিধ্বংসী অস্ত্র আছে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো পারমাণবিক অস্ত্র, জীবানু অস্ত্র এবং রাসায়নিক অস্ত্র। এসব অস্ত্রের সন্ধান এবং ধ্বংস করার জন্য জাতিসংঘের তরফ থেকে তদন্ত টিম পাঠানো হয়। তদন্ত টিম দীর্ঘদিন ইরাকে অনুসন্ধান করে জাতিসংঘে রিপোর্ট দেয় যে তারা ইরাকে কোন গণবিধ্বংসী অস্ত্রের সন্ধান পায়নি। এরপর ইরাকে হামলা চালাবার স্বপক্ষে আমেরিকার আর কোন যুক্তি থাকে না। গত দুই মাস হলো ইরাক দখল সম্পূর্ণ হয়েছে। এখন সমগ্র ইরাক আমেরিকার হাতের মুঠোয়। লক্ষাধিক মার্কিন সৈন্য ইরাক কন্ট্রোল করছে। কিন্তু তারাও এই দুই মাস ধরে গরু খোঁজার পরেও কোনো অস্ত্র পায়নি। কিন্তু না পেলে কি হবে? দূর্জনের ছলনার অভাব হয় না।

তাই আমেরিকা আরেকটি যুক্তি দিয়ে রাখে যে ইরাকের দুই কোটি মানুষ নাকি সাবেক প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের জুলুমে অস্থির। তাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত। তারা মুক্তির জন্য ছটফট করছে। মার্কিন সৈন্যরা ইরাকী জনগণকে সাদ্দামের দুশাসন থেকে মুক্তি দেবে। তাই যখন মার্কিন সৈন্য ইরাকে প্রবেশ করে তখন আমেরিকা হানাদার বাহিনী হওয়া সত্ত্বেও নিজেদেরকে মুক্তিদাতা বা 'লিবারেটর' হিসাবে জাহির করে। কিন্তু যাদেরকে লিবারেট করার জন্য তারা গেল সেই ইরাকী জনগণ পরদিন থেকেই স্লোগান দিতে থাকে, "মার্কিনীরা ইরাক ছাড়"। সুতরাং মুক্তিদাতা বা পরিত্রাতার ভূমিকাও যুক্তির ধোপে টেকে না। সুতরাং দূর্জন এখানে আরেকটি ছলনার আশ্রয় নেয়। এটিই হলো সবচেয়ে ভয়াবহ। এই ছলনার নাম হলো ডকট্রিন অব প্রিয়েম্পশন। এই থিওরীতে বলা হয় যে কোনো রাষ্ট্র যদি অপর রাষ্ট্রকে মনে করে যে ঐ রাষ্ট্রটি তার নিরাপত্তার জন্য হুমকি হয়ে দাড়িয়েছে তাহলে সে আগে ভাগেই ঐ রাষ্ট্রটির বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। এই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার মধ্যে সামরিক ব্যবস্থাও থাকতে পারে। প্রেসিডেন্ট বুশ থেকে শুরু করে বড় বড় মার্কিনী মন্ত্রীরা গাইতে থাকেন যে ইরাকীরা তাদের নিরাপত্তার প্রতি হুমকি স্বরূপ। সেই হুমকি প্রতিরোধের জন্য আগে ভাগেই ইরাকের বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা সহ অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এই যে নিরাপত্তার প্রতি হুমকি বলে একটি কথা অপর রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বলা হচ্ছে সে অভিযোগ

www.pathagar.com

সত্যি কি মিথ্যা সেটি প্রমাণ করার কোন প্রয়োজন নাই। আমি মনে করলাম, আপনি আমার ক্ষতি করতে চান। সুতরাং আমাকে আপনার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। আপনি সত্যি আমার ক্ষতি করতে চান কিনা সেটা প্রমাণ করার কোন প্রয়োজন নাই। ইরাক থেকে আমেরিকা হাজার হাজার মাইল দূরে। কোনোরূপ নিরাপত্তা হুমকি আমেরিকার ত্রিসীমানার মধ্যে নাই। কিন্তু তেল সম্পদ লুণ্ঠনের উদ্দেশ্য হউক, অথবা অস্ত্র ব্যবসা হউক, অথবা ইসরাইলের পথ নিষ্কণ্টক করার জন্যই হউক না কেন, আমেরিকা ইরাকের উপর হামলা করেছে এবং দেশটি দখল করেছে। এটি হলো ডকট্রিন অব পিয়েস্পশন।

ভারতের সাথে পাকিস্তানের সম্পর্ক খুবই খারাপ। বাংলাদেশের সাথেও সম্পর্ক সুবিধার নয়। ভারতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইতোমধ্যেই বলেছেন যে, যে ডকট্রিন অব পিয়েস্পশনের অধীনে আমেরিকা ইরাক দখল করেছে সেই একই তত্ত্বের অধীনে পাকিস্তানের উপরেও হামলা করা যায়। তার মতে হামলা করার জন্য পাকিস্তান একটি ফিট কেস। সেই একই তত্ত্বের অধীনে ভারত হামলা চালাবার জন্য বাংলাদেশকেও ফিট কেস মনে করতে পারে। এসব ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে, প্রতিপক্ষ অত্যন্ত দূর্বল হলেই ঐ তত্ব অনুযায়ী হামলা চালানো হয়। আফগানিস্তানের কোনো সামরিক শক্তিই ছিল না। আমেরিকা বলতে গেলে বিনা বাধায় দেশটি দখল করে নিয়েছে। আফগানিস্তানে বলতে গেলে তারা ওয়াকওভার পেয়েছে।

(দুই)

ইরাকের ক্ষেত্রে ঠিক ওয়াকওভার না হলেও মোকাবেলাটি ছিল অত্যন্ত অসম। কতখানি অসম সেটা বোঝার জন্য আসুন কয়েকটি সামরিক পরিসংখ্যানের দিকে দৃষ্টি দেওয়া যাক। কাগজে কলমে ইরাকের ছিল ৩১৬টি জঙ্গী বিমান। কিন্তু সেটা সেই "কাজীর গরু কেতাবে আছে গোয়ালে নাই," এর মত অবস্থা। পৃথিবীর একমাত্র নির্ভরযোগ্য এবং মর্যাদাশীল প্রতিরক্ষা গবেষণাপত্র 'মিলিটারী ব্যালান্স' অনুযায়ী এই ৩১৬টি জঙ্গী বিমানের মধ্যে ৫৫ শতাংশই সম্পূর্ণ অকেজো। এ ছাড়া ৯১ সালের প্রথম উপসাগরীয় যুদ্ধের পর থেকেই আমেরিকার ইচ্ছা অনুযায়ী আরোপিত জাতিসংঘের হাজারো নিষেধাজ্ঞা ও অবরোধের কারণে বিদেশ থেকে আমদানি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ রয়েছে। বলতে গেলে জীবন রক্ষাকারী ওষুধ এবং অতি প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী ছাড়া কোনো কিছুই ইরাককে আমদানি করতে দেওয়া হয়নি। ফলে নতুন জঙ্গী বিমান, ট্যাংক, কামানসহ যুদ্ধাস্ত্র তো আমদানির প্রশ্নই ওঠে না। এমনকি সোভিয়েতে তৈরি যেসব ২৫/৩০ বছর আগের সেকেলে অস্ত্রশস্ত্র ইরাকের ভাণ্ডারে ছিলো সেগুলোর যন্ত্রাংশ আমদানি করতেও দেওয়া হয়নি। এর ফলে যা হবার তাই হয়েছে। ইরাকের তরফ থেকে একটি জঙ্গী বিমানও আকাশে উড়লো না। অর্থাৎ উড়তে পারলো না। যন্ত্রাংশের অভাবে একটি জঙ্গী বিমানেরও উড্ডয়নের ক্ষমতা নাই। এর পরিণতি হয়েছে ভয়াবহ। আরো কয়েকটি কারণে ইরাকের জঙ্গী বিমান আকাশে উড়তে পারেনি। হানাদার বাহিনীর প্রবল বোমাবর্ষণ ও ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে ইরাকের বিমান ঘাঁটিগুলোর রানওয়ে নষ্ট হয়ে গেছে। রাডারসহ আর যেসব বিমান স্থাপনা আছে সেগুলোও আংশিক বা পুরো নষ্ট হয়ে গেছে। জঙ্গী বিমান আত্মরক্ষার কাজেই ব্যবহৃত হোক অথবা আক্রমণাত্মক হামলায় ব্যবহৃত হোক না কেন, গোয়েন্দা তথ্য এসব ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ধারণা করা হচ্ছে যে, ইরাকের কাছে প্রয়োজনীয় গোয়েন্দা তথ্য ছিল না। প্রযুক্তির ক্ষেত্রে আমেরিকা আজ যে পর্যায়ে

www.pathagar.com

উন্নীত হয়েছে সেই পর্যায় থেকে তারা উপগ্রহ বা অন্যান্য মাধ্যমে প্রতিপক্ষের বিমানের ওঠানামা পর্যবেক্ষণের জন্য উপগ্রহ ও পর্যবেক্ষণ বিমানের মাধ্যমে নজরদারি করতে পারে। ফলে ইরাকী বিমান উঠানামা করলে ঐ স্থানটি চিহ্নিত হয়ে যাবে। এরপর হানাদারদের বিমান ও ক্ষেপণাস্ত্র শক্তি, স্থাপনা ও সমরাস্ত্রসহ ইরাকের বিমান শক্তিকে চুরমার করে দেবে। এসব কারণে অল্পসংখ্যক যে কয়েকটি বিমান আকাশে উড়তে পারতো সেগুলোও ওড়েনি বলে বিশেজ্ঞরা মনে করেন।

কারণ যাই হোক না কেন ইরাকের আকাশ আগ্রাসনের প্রথম দিন থেকেই হানাদারদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে ছিল। তারা ইচ্ছামত প্রেসিডেন্ট প্রাসাদ, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, রিপাবলিকান গার্ডসহ বিভিন্ন সামরিক স্থাপনার ওপর বোমা ও ক্ষেপণাস্ত্রের হামলা চালিয়েছে। ইরাক কোথাও বিশাল কলাম করে তার ট্যাংক সাঁজোয়া বহর এবং গোলন্দাজ বাহিনী নিয়ে বেশীদূর এগুতে পারেনি। ঝাঁকে ঝাঁকে শত্রুপক্ষের বিমান এসেছে, বোমা মেরেছে এবং শত শত ক্ষেপণাস্ত্র তাদেরকে আঘাত করেছে। ফলে ইরাকী বাহিনী হয় পিছু হটেছে, না হয় ছত্রভঙ্গ হয়েছে, অথবা বীর বিক্রমে লড়াই করেছে।

স্থল যুদ্ধে আফগানরা যেমন সুবিধা করতে পারেনি তেমনি ইরাকীরাও প্রবল বাধার সম্মুখীন হয়েছে। আফগানিস্তানে তো কোনো সুশৃঙ্খল সেনাবাহিনী ছিল না। একটি নিয়মিত বাহিনীর ট্যাংক, গোলন্দাজ, সাঁজোয়া ও মেকানাইজড ডিভিশন তাদের ছিলো না। পদাতিক বাহিনীতেও দূরপাল্লার কামান, বিমান বিধ্বংসী মিসাইল ইত্যাদি তাদেরকে ব্যবহার করতে দেখা যায়নি। ফলে এ ক্ষেত্রেও মার্কিনীরা ওয়াকওভার পেয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে ইরাকীদের অবস্থা কিছুটা ভিন্ন। '৯০, '৯১ এ উপসাগরীয় যুদ্ধের আগে ইরাক ছিলো মধ্যপ্রাচ্যের সবচেয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্র। তাদের সৈন্য সংখ্যা ছিলো ১০ লাখ, ট্যাংক ছিলো ৬ হাজার এবং জঙ্গী বিমান ছিলো ১ হাজার। কিন্তু একটি ভুল তারা করেছিলো। কারো উস্কানিতেই হোক বা পাতা ফাঁদে পা দিয়েই হোক ইরাক কুয়েত দখল করেছিলো। সুতরাং ইরাককে কুয়েত থেকে হটানোর জন্য আমেরিকা যে কোয়ালিশন বাহিনী গঠন করে, সেই বাহিনীতে রাশিয়া, চীন, ফ্রান্স, ইংল্যান্ডসহ ৫০টি দেশ যোগ দেয়। সেই অকল্পনীয় বিশাল শক্তি নিয়ে আমেরিকার নেতৃত্বাধীন কোয়ালিশন বাহিনী ইরাককে শুধু কুয়েত থেকেই হটিয়ে দেয়নি সেই সুযোগে ইরাকের বিশাল সমরশক্তি মিসমার করে দেয়। ১০ লাখ থেকে ইরাকের সৈন্য সংখ্যা সাড়ে ৩ লাখ, বিমান সংখ্যা ১ হাজার থেকে ৩১৬, ট্যাংকের সংখ্যা আড়াই হাজারে নেমে আসে। লক্ষ্য করার বিষয় হলো এই যে, যতটুকু শক্তি ইরাকের আছে সেটিও পুরোপুরি এই যুদ্ধে কাজে লাগানো যায়নি। এর অর্ধেকেরও অনেক বেশী যন্ত্রনাংশের অভাব এবং অন্যান্য কারিগরি ঘাটতির জন্যে অকার্যকর থাকে। এ ছাড়াও আগেই বলেছি যে, যৎসামান্য শক্তি ইরাকের হাতে অবশিষ্ট ছিলো সেটিও সেই ৬০ দশকে অর্থাৎ ৪০ বছর আগের অস্ত্রশস্ত্র। এই নিয়েই ইরাক মোকাবেলা করেছে আমেরিকাকে।

(তিন)

এর বিপরীতে মার্কিন শক্তি দেখুন। এই হামলায় আমেরিকা ৫টি বিমানবাহী জাহাজ নিয়োজিত করে। এগুলোর মধ্যে ৩টি মোতায়েন করা হয় পারস্য উপসাগরে এবং দু'টি

www.pathagar.com

ভূ-মধ্যসাগরে। এর বিপরীতে ইরাকের কোনো বিমানবাহী জাহাজ তো দূরের কথা, কোনো যুদ্ধজাহাজ তথা নৌ-বাহিনীকে মোটেই দেখা যায় নাই। আমেরিকা যেসব বিমানবাহী জাহাজ মোতায়েন করেছিলো সেগুলো হলো - (১) কিটি হক (২) থিওডর রুজভেল্ট (৩) আব্রাহাম লিঙ্কন (৪) নিমিতিজ (৫) কন্সটিলেশন। এই হামলায় হানাদার বাহিনী ৮০০ টোমাহক ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র মেরেছে। ১৯৯১ সালের প্রথম উপসাগরীয় যুদ্ধে আমেরিকা যে টোমাহক ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করে তার তুলনায় এবারের টোমাহক মিসাইল ছিলো আরো উন্নত এবং সর্বশেষ প্রযুক্তিতে সমৃদ্ধ। এসব ক্ষেপণাস্ত্রের মধ্যে কম্পিউটার প্রযুক্তি সজ্জিত করা ছিল। লক্ষ্যবস্তু স্থির করে ইলেকট্রনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে ইরাকী টার্গেটসমূহের ওপর আঘাত হানা হয়। এ কারণে নিশানা ছিলো মোটামুটি অব্যর্থ।

হানাদারদের বিমানবাহিনী থেকে যেসব বোমাবর্ষণ করা হয় সেই বোমা বহনকারী বিমানগুলোও ছিলো ইলেকট্রনিক প্রযুক্তিতে সমৃদ্ধ। সেই কোরিয়ার যুদ্ধের মতো চোখের আন্দাজে বোমা মারা হয়নি। উড়ন্ত বিমানেই ইলেকট্রনিক প্রযুক্তিতে লক্ষ্যবস্তু স্থির করা হয় এবং সেই মোতাবেকই বোমা ফেলা হয়। ফলে দেখা গেছে যে মাত্র মুষ্টিমেয় কয়েকটি ক্ষেত্রে টার্গেট ভুল হয়েছে। এ ছাড়া অবশিষ্ট অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিশানা নির্ভুল হয়েছে। যে কয়েকটি ক্ষেত্রে নিশানায় আঘাত পড়েছে সেটাকে হামলাকারীরা বলেছে 'ফ্রেন্ডলি ফায়ার।' এই হামলায় একশ্রেণীর বিমান ব্যবহার করা হয়েছে যেগুলো রাডারকে ফাঁকি দিয়ে অনেক নীচু দিয়ে উড়ে যেতে পারে। যেসব অত্যাধুনিক জঙ্গী বিমান এই হামলায় ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলোর মধ্যে নিম্নলিখিত অস্ত্রসমুহ উল্লেখের দাবীদার। বি-১, বি-২, বি-৫২ বোমারু বিমানগুলো। সংযোজিত করা হয়েছে বি-২ বোমারু বিমান (এ বিমান রাডারে ধরা পড়ে না)। আর ফাইটার বিমান বহরের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে এফ ১১৭-এর মতো স্টিলথ বিমান। অগ্রগামী সাঁজোয়া বহরকে সর্বতোভাবে বিমান সহযোগিতার জন্য আক্রমণকারী অ্যাপাচি হেলিকপ্টার আর এ-১০ এর মতো জঙ্গী বিমান। এসবই ক্রমান্বয়ে ইরাকে ব্যবহৃত হয়েছে। বিগত উপসাগরীয় যুদ্ধে প্রথমবারের মতো ব্যবহৃত ক্রুজ মিসাইল বলে পরিচিত টোমাহকগুলোকে জিপিএস (GPS: Global Positioning System) সংযোজন করে আরো কার্যকর করা হয়। এগুলো এখন অত্যন্ত নিখুঁতভাবে নির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তুর ওপর ব্যবহার করা যায়। এ নতুন প্রযুক্তির টোমাহক বর্তমানে ইরাক যুদ্ধে প্রথমবারের মতো ব্যবহার করা হয়েছে। এ মিসাইলটি রণতরী এবং বিমান উভয় মাধ্যমের দ্বারা নিক্ষেপ করা যায়। এ পর্যন্ত ইরাকে ৮০০ এর বেশী টোমাহক মিসাইল নিক্ষেপ করা হয়েছে (পাঠকদের জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি যে, প্রতিটি মিসাইলের মূল্য ১০ লাখ মার্কিন ডলার)। এ মিসাইল এবং বোমা সম্ভারে আরো রয়েছে ১ হাজার ৫০০ পাউন্ড ওজনের 'ডেইজি কাটার', যা ভিয়েতনামের পর আফগানিস্তানে ব্যবহৃত হয়েছিলো, জেডাম (JDAM), প্রথমবারের মতো আফগানিস্তানে ব্যবহৃত থারমোবেরিক অস্ত্র। থারমোবেরিক অস্ত্র ব্যবহার করা হয় গুহায় লুকিয়ে থাকা শত্রুদের জন্য। একটি বিস্ফোরণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভেতরের অক্সিজেন টেনে বের করে অক্সিজেন শূন্য করে যে কোনো জীবন্ত প্রাণীর মুহূর্তে মৃত্যু ঘটায়। আরো রয়েছে জিবিইউ-২৮ বাঙ্কার বাস্টারের মতো বোমা। এ বোমাটি মাত্র কয়েকদিন আগে

www.pathagar.com

বাগদাদে ব্যবহার করা হয়েছে। সেনাবাহিনীতে গতি সঞ্চারের জন্য রয়েছে এম-১, এ -১ এবরাম ট্যাঙ্ক। ট্যাঙ্ক বাহিনীর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ পদাতিক সৈনিকদের জন্য এম-২, এ-৩ ব্রেডলি ফাইটিং ভেহিকেল। নতুন সংযোজিত হয়েছে এম-১০৯, এ-৬ প্যানাদিন হাউইটজার আর এম-২৭০ মাল্টিপল রকেট লঞ্চ সিস্টেম। শত্রুপক্ষের ছোঁড়া ক্ষেপণাস্ত্রকে ধ্বংস করার জন্য প্যাট্রিয়ট মিসাইল সিস্টেমেরও সন্নিবেশ করা হয়েছে। এক কথায় সামরিক অভিযানকে দ্রুতগতিতে সম্পন্ন করার জন্য বিশ্বের সবচেয়ে উন্নত প্রযুক্তিতে তৈরি অস্ত্রের সমাবেশ করে ফোর্স মডার্নাইজেশন করা হয়।

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর একজন সাবেক সেনা নায়কের মতে আট বছরের ইরাক-ইরান যুদ্ধ, কুয়েত দখল, উপসাগরীয় যুদ্ধে ব্যাপক পরাজয়ের পর ১২ বছর জাতিসংঘের অবরোধে থাকা ইরাক জর্জরিত। ইরাকের ৩ লাখ ৫০ হাজার সদস্যের সেনাবাহিনীর হাতে মার্কিন প্রযুক্তি মোকাবিলা করার মতো প্রযুক্তি সম্পন্ন অস্ত্রের অভাব আর সে সঙ্গে রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ৩৫০টি যুদ্ধবিমান। এ সবই ইরাকের প্রতিকূলে। ইরাকের ট্যাংক বাহিনীর সংখ্যা ২ হাজার ৬০০ হলেও বেশীর ভাগ তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের টি-৫৫,৫৭ আর ৭২ মডেলের সংখ্যাই বেশী, যা মার্কিন প্রযুক্তির সামনে নিম্নমানের। তার ওপর রক্ষণাবেক্ষণের সংকটের কারণে অর্ধেকের বেশী অচল। এ নিয়েই ইরাকের স্পেশাল রিপাবলিকান গার্ড , রিপাবলিকান গার্ড আর নিয়মিত সেনাবাহিনী যুদ্ধ করেছে বিমান বাহিনীর সাহায্য ছাড়াই।

সামরিক বাহিনী এবং সমরাস্ত্র সম্পর্কে যাদের বিন্দুমাত্র ধারণা আছে তারা ওপরের পরিসংখ্যান ও তথ্যাবলী থেকে বিলক্ষণ বুঝতে পারবেন যে, খালি হাতে যেমন তলোয়ার বা বর্শার সাথে যুদ্ধ করা যায় না তেমনি রকেট লাঞ্চার দিয়ে বা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের এন্টি এয়ারক্রাফট গান দিয়ে টোমাহক মিসাইল বা 'স্টিলথ' বোমারু বিমানকে ঘায়েল করা যায় না। ইরাকীরা ২১ দিন ধরে বীরের মত প্রতিরোধ করেছে। তারা মার্কিন বাহিনীকে পরাস্ত করবে, এমন ধারণা কি করা যায়? অনেকগুলো গুন্ডা এসে কোনো এক ব্যক্তিকে যদি আক্রমণ করে তাহলে ঐ আক্রান্ত ব্যক্তি হাত দিয়ে সেই প্রহার ঠেকানোর চেষ্টা করে। তাই বলে সেই আক্রান্ত ব্যক্তি কতগুলো গুন্ডাকে পাল্টা মার দিয়ে তাড়িয়ে দেবে, এটা কেউ ধারণা করবে না। তবে কিছুক্ষণ ঠেকিয়ে রাখতে পারলে আশেপাশের কেউ সাহায্যে এগিয়ে আসতেও পারে, এটিই একমাত্র আশা। দুঃখের বিষয় ২১ দিন ধরে ইরাকিরা ইঙ্গ-মার্কিন হানাদারদের ঠেকিয়ে রেখেছে। ঠেকিয়ে রাখতে গিয়ে হাজার হাজার সামরিক ও বেসামরিক মানুষ অসহায়ভাবে প্রাণ দিয়েছেন। তারপরেও কেউ সাহায্যের হাত বাড়াননি।

(চার)

আমি একটু আগেই বলেছি যে, মুসলিম উম্মার সদস্য হওয়া সত্ত্বেও আফগানিস্তান বা ইরাকের স্বপক্ষে প্রত্যক্ষভাবে কোনো রাষ্ট্র এসে দাঁড়ায়নি। অথচ তাদের সংখ্যা ৬০। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে মুসলিম জাহান সম্পর্কে পাঠকদের খেদমতে কয়েকটি তথ্য ও পরিসংখ্যান পেশ করছি। এই পরিসংখ্যান ও তথ্যাবলী একটি ইংরেজী সাপ্তাহিক থেকে নেয়া হয়েছে। পাকিস্তানের করাচী থেকে প্রকাশিত এই সাপ্তাহিকে ৪-১০ এপ্রিল সংখ্যায় বলা হয়েছে যে, পৃথিবীতে বর্তমানে রয়েছে ৬১টি মুসলিম দেশ। এত দিন ধরে অনেকের ধারণা ছিল যে পৃথিবীতে রয়েছে ৫৬টি মুসলিম রাষ্ট্র। যাই হোক, এইসব

www.pathagar.com

মুসলিম রাষ্ট্র হল- (১) আজারবাইজান, (২) আইভোরি কোষ্ট (৩) এডেন, (৪) উজবেকিস্তান, (৫) আফগানিস্তান, (৬) আলবেনিয়া, (৭) আলজেরিয়া, (৮) ইন্দোনেশিয়া, (৯) ইথিওপিয়া, (১০) ইরান, (১১) সুদান, (১২) বাহরাইন, (১৩) ব্রুনাই, (১৪) বাংলাদেশ, (১৫) বসনিয়া, (১৬) পাকিস্তান, (১৭) তাজিকিস্তান, (১৮) তুর্কমেনিস্তান, (১৯) তুরস্ক, (২০) তানজানিয়া, (২১) তানিন, (২২) টোগো, (২৩) চাঁদ, (২৪) সৌদি আরব, (২৫) সিয়েরা লিওন, (২৬) জর্ডান, (২৭) সেনেগাল, (২৮) সিরিয়া, (২৯) সোমালিয়া, (৩০) ইরাক, (৩১) ওমান, (৩২) ফিলিস্তিন, (৩৩) কাজাকিস্তান, (৩৪) কাতার, (৩৫) কুয়েত, (৩৬) কমোরো, (৩৭) ক্যামেরুন, (৩৮) গিনি, (৩৯) গিনিবিসাও, (৪০) গাম্বিয়া, (৪১) গ্যাবন, (৪২) লেবানন, (৪৩) লিবিয়া, (৪৪) মৌরিতানিয়া, (৪৫) মালদ্বীপ, (৪৬) মালি, (৪৭) আমিরাত, (৪৮) মরক্কো, (৪৯) মিশর, (৫০) মালয়েশিয়া, (৫১) মোজাম্বিক, (৫২) নাইজেরিয়া, (৫৩) মধ্য আফ্রিকা, (৫৪) ইয়েমেন, (৫৫) উগান্ডা, (৫৬) বেনিন, (৫৭) জিবুতি, (৫৮) গায়ানা, (৫৯) নাইজার, (৬০) কিরগিজিস্তান।

এই ৬০ দেশের সম্মিলিত আয়তন ৪ কোটি ৩৮ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার। মোট সম্মিলিত জনসংখ্যা ১৪০ কোটি ৩১ লক্ষ। এই ৬০টি মুসলিম দেশের সম্মিলিত সৈন্য সংখ্যা ৬৬ লক্ষ। তাদের সম্মিলিত প্রতিরক্ষা বাজেট হল ৭৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। বাংলাদেশী মুদ্রায় ৪ লক্ষ ৬২ হাজার কোটি টাকা। এদের মধ্যে শুধুমাত্র সৌদি আরবের বাৎসরিক প্রতিরক্ষা বাজেট ২২ বিলিয়ন ডলার। অর্থাৎ বাংলাদেশী মুদ্রায় ১ লক্ষ ৩২ হাজার কোটি টাকা। তুরস্কের প্রতিরক্ষা বাজেট ১০.৫ বিলিয়ন ডলার। অর্থাৎ বাংলাদেশী মুদ্রায় ৬৩ হাজার কোটি টাকা।

পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা বাজেট সাড়ে তিন বিলিয়ন ডলার। অর্থাৎ ২১ হাজার কোটি টাকা। কুয়েতের মতো একটি পিচ্চি দেশের প্রতিরক্ষা বাজেট হল সোয়া ৩ বিলিয়ন ডলার, অর্থাৎ ১৯ হাজার ৫শ' কোটি টাকা। মিশরের বাজেটও ১৯ হাজার ৫শ' কোটি টাকা। ইরাক, মরক্কো, ওমান এবং কাতার প্রত্যেকের বাজেট ২.২ বিলিয়ন ডলার, অর্থাৎ ১৩ হাজার ২শ' কোটি টাকা।

উপরের পরিসংখ্যানসমূহ ভাল করে পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় যে, মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ ঐক্যবদ্ধ থাকলে তারা পৃথিবীর যে কোন পরাশক্তির মোকাবিলা করতে পারত। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, ইসলামী ঐক্য, মুসলিম উম্মা, মুসলিম জাহান, ইসলামী ঐক্য সংস্থা, ইসলামী কমন মার্কেট ইত্যাদি কত বড় বড় এবং ভালো ভালো কথা যুগের পরে যুগ ধরে শুনে আসছি। কিন্তু যতই দিন যাচ্ছে মুসলিম দেশগুলো ততই ঐক্যবদ্ধ ও সংহত হওয়ার পরিবর্তে অনৈক্য এবং পশ্চিমা দুনিয়ার তাঁবেদারীতে দূর্বল এবং গুরুত্বহীন হয়ে পড়ছে। ১৯৭৩ সালের আরব-ইসরাইল যুদ্ধের পূর্বে সমগ্র আরব জাহান বা মুসলিম জাহানে একজন বৃটিশ বা মার্কিন সৈন্য ছিল না। কিন্তু আজ অন্তত ১৫টি দেশে মার্কিন সৈন্য সশরীরে হাজির আছে। এই ১৫টি দেশে কম করে হলেও আমেরিকার ৩২টি সামরিক ঘাঁটি রয়েছে। এসব দেশ হল - (১) বাহরাইন, (২) কুয়েত, (৩) জর্ডান, (৪) কাতার, (৫) সউদী আরব, (৬) ওমান, (৭) আরব আমিরাত, (৮) ইয়েমেন, (৯) জিবুতি, (১০) মিশর, (১১) তুরস্ক, (১২) আফগানিস্তান, (১৩) পাকিস্তান, (১৪) উজবেকিস্তান, (১৫) তাজিকিস্তান।

www.pathagar.com

সকলেই জানেন যে, আফগানিস্তান এবং ইরাক উভয় ক্ষেত্রে আমেরিকা আকাশে একচ্ছত্র প্রভাব বিস্তার করেছিল। এই দু'টি দেশের আকাশ লাড়াইয়ের প্রথম দিন থেকেই মার্কিনীদের করায়ত্ত হয়ে যায়। বিমান বাহিনীর অপ্রতিদ্বন্দ্বী শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে প্রতিপক্ষের সামরিক স্থাপনা হানাদাররা হয়ত ধ্বংস করতে পারে। কিন্তু একটি দেশ দখল করতে হলে আক্রমণকারীগণকে স্থলপথে আসতে হবে। আসতে হবে ট্যাংক, কামান, সাঁজোয়া গাড়ী ইত্যাদি। অর্থাৎ পদাতিক গোলন্দাজ ও সাঁজোয়া গাড়ীর বহরকে আক্রান্ত দেশে প্রবেশ করতে হবে। ইরাকের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। লাখ লাখ হানাদার সৈন্য এবং ট্যাংক ও সাঁজোয়া বাহিনী নিয়ে মার্কিন বাহিনী কিভাবে ইরাকের মাটিতে ঢুকল? তারা এসেছে কুয়েত থেকে। আরেকটি বিশাল কলাম ঢুকেছে উত্তর থেকে। বাগদাদের পতনের ২৪ ঘন্টা আগে থেকে আরেকটি কলাম ঢুকেছে পশ্চিম দিয়ে। অর্থাৎ হানাদাররা ইরাক, জর্ডান, কুয়েত, তুরস্ক এসব পথ দিয়ে ঢুকেছে। সেজন্যই বলছিলাম যে, মুসলিম উম্মা এবং ইসলামী ঐক্যের কথা তারস্বরে উচ্চারিত হলেও সেই ঐক্য আজও সোনার হরিণ হয়ে আছে। এমন একটি পরিস্থিতিতে তাহলে মুসলিম দেশসমূহের সামনে মুক্তির পথ কি? আমার ব্যক্তিগত মতে, এটি একটি মিলিয়ন ডলার প্রশ্ন।

(পাঁচ)

এসব পরিসংখ্যান পেশ করার পর এখন মূল কথায় ফিরে আসছি। ভারত যদি বাংলাদেশের উপর হামলা চালায় তা হলে আমাদের অবস্থা কি হবে? এই বিষয়টি বোঝার জন্য আসুন বাংলাদেশ ও ভারতের সামরিক শক্তির দিকে নজর বুলানো যাক।

সামরিক শক্তি ঃ ভারত

(ক) সামরিক বাহিনী ঃ ১২ লক্ষ ৬৩ হাজার।(রিজার্ভ ৫ লক্ষ ৩৫ হাজার)।
(খ) সেনাবাহিনী ঃ ১১ লক্ষ।
(গ) নৌবাহিনী ঃ ৫৩ হাজার।
(ঘ) বিমানবাহিনী ঃ ১ লক্ষ ১০ হাজার।
(ঙ) ট্যাঙ্ক ঃ ৩ হাজার ৪১৪ (এর মধ্যে রয়েছে রুশ টি– ৫৫, টি-৭২ বৈজয়ন্তী এবং অর্জুন)
(চ) ক্ষেপণাস্ত্র ঃ অগ্নি, পৃথ্বি এবং নাগ (ট্যাঙ্ক বিধ্বংসী)।
(ছ) নৌবাহিনী ঃ (i) বিমানবাহী জাহাজ। একটির নাম বিরাট। আরেকটির নাম এডমিরাল গরশব। এটি এখনো ভারতে এসে পৌছেনি।
(ii) সাবমেরিন-১৬
(iii) ডেস্ট্রয়ার-৮
(iv) ফ্রিগেট-১১
(v) নৌ-জঙ্গী বিমান– জনবল ৫ হাজার, বিমান সংখ্যা ৬৭।
(vi) ক্ষেপণাস্ত্র ঃ সাগরিকা।
(জ) বিমান বাহিনী ঃ ১ লক্ষ ১০ হাজার।
(i) জঙ্গী বিমান ঃ ৭৩৮।
(ii) জঙ্গী হেলিকপ্টার ঃ ২২টি।
(ঝ) ক্ষেপণাস্ত্র ঃ ত্রিশূল।
(ঞ) প্যারামিলিটারী ঃ ১০ লক্ষ ৮৯ হাজার।

www.pathagar.com

সামরিক শক্তি ঃ বাংলাদেশ

(ক) সদস্য সংখ্যা ঃ ১ লক্ষ ৩৭ হাজার।
(খ) সেনাবাহিনী ঃ ১ লক্ষ ২০ হাজার।
(গ) নৌবাহিনী ঃ ১০ হাজার ৫০০
(ঘ) বিমান বাহিনী ঃ ৬ হাজার ৫০০
(ঙ) ট্যাঙ্ক ঃ
(i) ১০০টি, টি ৫৯
(ii) ১০০টি, টি- ৫৪/৫৫
(চ) নৌবাহিনী ঃ
(i) সাবমেরিন নেই
(ii) ডেস্ট্রয়ার- নেই
(iii) ফ্রিগেট-৫টি
(vi) পেট্রোল ও উপকূলীয় ক্ষুদ্র রণতরী-৪১।
(ছ) বিমান বাহিনী ঃ
(i) জঙ্গী বিমান-৮৩। এর মধ্যে ১৮টি চীনা এ-৫
(ii) ৮টি রুশ মিগ-২৯।
(iii) ১৬টি এফ-৬
(iv) ২৩টি এফ -৭
(v) ১০টি এফ টি-৬
(vi) ৮টি এল-৩৯
(vii) জঙ্গী হেলিকপ্টার নেই।
(জ) বি, ডি, আর ঃ ৩৮ হাজার
(ঝ) আমর্ড পুলিশ ঃ ৫ হাজার
(ঞ) আনসার ঃ ২০ হাজার।

(ছয়)

উপরের পরিসংখ্যান থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ভারতের তুলনায় বাংলাদেশের সামরিক শক্তি দশ ভাগের এক ভাগ। নৌ-বাহিনীর ক্ষেত্রে কোনো তুলনা চলে না। অথচ বাংলাদেশ ১২ কোটি মানুষের এক বিশাল জনগোষ্টির দেশ। আমাদের জি ডি পি ২ লক্ষ ১০ হাজার কোটি টাকা। গত বছরের প্রতিরক্ষা বাজেট মাত্র ৩ হাজার ৮ শত কোটি টাকা। অর্থাৎ ৫০০ মিলিয়ন ডলারেরও কম। এটি অতি নগণ্য প্রতিরক্ষা ব্যয়। আন্তর্জাতিক ষ্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী জি. ডি. পির ৫% প্রতিরক্ষা ব্যয় করা যায়। সে হিসাবে ১০ হাজার কোটি টাকা প্রতিরক্ষা বাজেট হতে পারে। ইরাক ও আফগানিস্তান শিক্ষা দিয়েছে যে বিপদে কেউ কারো পাশে এসে দাঁড়ায় না। বাংলাদেশকে প্রতিরক্ষা বিষয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। জাতীয় অস্তিত্বের খাতিরে জনগণের ওপর বোঝা হলেও ইসরাইল সামরিক দিক দিয়ে শক্তিশালী হয়েছে এবং পাকিস্তান আনবিক শক্তির অধিকারী হয়েছে। তাই তাদের স্বাধীনতা সুরক্ষিত হয়েছে। ৩০ লক্ষ লোকের রক্তের বিনিময়ে যখন বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে তখন মর্যাদার সাথে টিকে থাকার জন্য আমাদের প্রয়োজন শক্তিশালী সামরিক বাহিনী।

www.pathagar.com

স্বাধীনতার স্বার্থে শক্তিশালী প্রতিরক্ষা

১৯৫৪ সাল থেকেই একটা কথা শুনে আসছিলাম। সেটা হল, পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ)-কে সবদিক দিয়ে শোষণ ও বঞ্চিত করা হচ্ছে এবং প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে শুধু বঞ্চনাই নয়, রীতিমত অরক্ষিত রাখা হয়েছে। ১৯৬৫ সালে পাকিস্তানকে ভারত আক্রমণ করে। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তান নিয়েই নাকানি-চুবানি খাওয়ায় পূর্ব পাকিস্তান (বাংলাদেশ)-এর দিকে ভারত বোধ হয় আর তাকাতে পারেনি। পাকিস্তানের ভূ-খণ্ডকে এই নগ্ন ভারতীয় হামলার তীব্র নিন্দা করেছিল সবকটি রাজনৈতিক দল। কিন্তু একটি বিশেষ রাজনৈতিক দল রহস্যজনকভাবে নীরব থাকে। প্রায় ১৫ দিনব্যাপী যুদ্ধ চলার পর যখন তাসখন্দ চুক্তির মাধ্যমে যুদ্ধের অবসান ঘটে তখন শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানকে এই বলে তীব্র আক্রমণ করে যে, প্রতিরক্ষার ব্যাপারে পূর্ব পাকিস্তান (বাংলাদেশ) সম্পূর্ণ অরক্ষিত এবং পশ্চিম পাকিস্তানের ওপর নির্ভরশীল রাখা হয়েছে। সুতরাং তিনি আওয়াজ তোলেন যে, পূর্ব বাংলার ডিফেন্স পশ্চিম পাকিস্তানের মুখাপেক্ষী হতে পারে না। পূর্ব বাংলাকে প্রতিরক্ষায় স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে হবে। এরপর লাহোরে জাতীয় নেতৃবৃন্দের এক সম্মেলনে শেখ মুজিব আচানক তাঁর আস্তিনের ভেতর থেকে বের করেন তাঁর বিখ্যাত ছয় দফা প্রস্তাব। লাহোর থেকে ফিরে শেখ মুজিব সারা বাংলায় ঝটিকা সফর শুরু করেন। প্রতিটি জনসভায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে তার অন্যতম বক্তব্য ছিল ঃ 'ডিফেন্স অব ইস্ট পাকিস্তান লাইজ ইন ওয়েষ্ট পাকিস্তান' এই তত্ব অসার ও মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং ভৌগোলিকভাবে দেড়হাজার মাইল দূরে অবস্থিত পূর্ব পাকিস্তানকে প্রতিরক্ষায় স্বয়ংসম্পুর্ণ করতে হবে।

১৯৭১ সালের স্বাধীনতার পর আওয়ামী লীগ ও তার অনুসারীদের সুর আশ্চর্য্য রকমভাবে বদলে গেল। যেহেতু আওয়ামী লীগ, সিপিবি ইত্যাদি অত্যন্ত সুসংগঠিত দল, সেই হেতু চারদিকে গুঞ্জন ও ফিসফিসানি শুরু হল ঃ মিলিটারীর খরচ তো হাতির খরচ। একটা বড় সামরিক বাহিনী পোষার সামর্থ্য কি আমাদের রয়েছে? এই সুপরিকল্পিত প্রচারাভিযানে আরেকটি নতুন পয়েন্ট যোগ করা হল ঃ খামাখা বড় মিলিটারী গড়ে লাভ কি? ইন্ডিয়া তো আমাদের বন্ধু দেশ। যদি কোন বিপদ-আপদ আসেই তাহলে ইন্ডিয়াই আমাদের রক্ষা করবে। অর্থাৎ পাকিস্তান আমলে থিওরী ছিল ঃ 'ডিফেন্স অব ইস্ট পাকিস্তান লাইজ ইন ওয়েষ্ট পাকিস্তান' ওটা এখন বদলে হল 'ডিফেন্স অব বাংলাদেশ লাইজ ইন ইন্ডিয়া'। আর তারপরই শুরু হল ইতিহাসের

www.pathagar.com

চাকাকে উল্টা দিকে ঘুরান। শেখ মুজিব এবং আওয়ামী লীগ এতদিন যা বলে এসেছেন স্বাধীনতার পর ক্ষমতায় গিয়ে সব গিলে খাওয়া শুরু করলেন। এতদিন ধরে পূর্ব পাকিস্তান বা পূর্ব বাংলার জন্য যা যা করা দরকার ছিল বলে ওয়াদা করেছিলেন সেই একই পূর্ব পাকিস্তান, যার এক ইঞ্চি জমিও কমবেশী হয়নি, সেটাই বাংলাদেশ নাম গ্রহণ করার পর উল্টা সুরে গান ধরলেন। বাংলাদেশ হওয়ার আগে পাকিস্তানের নৌশক্তি পূর্ব পাকিস্তানে আনার কথা ছিল। আনলে এখানেও সাবমেরিন, ডেস্ট্রয়ার, ফ্রিগেট, ন্যাভাল এয়ারক্রাফট প্রভৃতি থাকত। বাংলাদেশ সৃষ্টির পর আওয়ামী সরকারের আমলে আমাদের নৌবাহিনী কয়েকটি 'গাদা বোট' বাহিনীতে পদাবনতি পেল। বিমান বাহিনীতে মাত্র ১২টি রুশ মিগ-২১ জঙ্গী বিমান আনা হল। মাত্র দেড় বছর পর ঐ ১২টি বিমানের মধ্যে ৯টিই যন্ত্রাংশের অভাবে মুখ থুবড়ে পড়ল। এই অবস্থায় ভারত ও পাকিস্তান যখন যথাক্রমে ৭০০ ও ২৮০ জঙ্গী বিমান তাদের অস্ত্রভাণ্ডারে মওজুদ রেখেছে তখন বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় নেতারা মাত্র তিনটি জঙ্গী বিমান নিয়ে 'বাংলার আকাশ রাখিব মুক্ত' বলে আশা প্রকাশ শুরু করলেন। সেনাবাহিনীর ক্ষেত্রেও অবস্থা অথৈবচ। তৎকালীন সাড়ে ৭ কোটি জনসংখ্যার পাকিস্তানে যেখানে সৈন্যসংখ্যা ছিল ৪ লাখ ৬০ হাজার, সেখানে আমাদের সেনাবাহিনীতে ৩০ হাজার সৈন্যও ছিল না। বরং জলপাই রং-এর ভারতীয় সৈন্যের পোশাকে রক্ষীবাহিনী গঠন করে সেনাবাহিনীকে কার্যতঃ দ্বিতীয় শ্রেণীর শক্তিতে নামিয়ে দেয়ার চেষ্টা করা হল। স্বাধীনতার পূর্বে পূর্ব পাকিস্তানে ৭০টি (মতান্তরে ১০০টি) ট্যাঙ্ক ছিল। '৭১-এর যুদ্ধ শেষের ফায়দা হিসাবে ভারতীয় বাহিনী সেগুলো লুট করে নিয়ে যায়। শেখ মুজিবের আমলে মিশর থেকে খয়রাত হিসাবে যে ২৮টি ট্যাঙ্ক আসে সেগুলোও রক্ষীবাহিনীকে বরাদ্দ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

শেখ মুজিবের আমলে সামরিক শক্তি অর্জনে কেন এই দীনতা? কারণ একটাই। পাছে ইন্ডিয়া নাখোশ হয়। দেশের সংবিধান পাসের আগে দিল্লীর অনুমোদন নিতে হয়। ভারতীয় সংবিধানের আদলে সাংবিধানিক মূলনীতি সন্নিবেশ করতে হয়। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ভারতের পূর্বাহ্নিক অনুমোদন আনতে হয়। সামরিক বাহিনীকে ঠুটো জগন্নাথ বানাতে হয়।

স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে বিশেষ করে প্রতিরক্ষা শক্তি অর্জনে স্বাধীনতাকে যখন দিল্লীর সিন্দুকে দায়বদ্ধ রাখা হয়েছিল তখন পাকিস্তান ও ভারত বিশেষ করে ভারত অবিশ্বাস্য দ্রুততার সাথে সামরিক শক্তি বাড়াতে থাকে। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট মুজিব শাহীর পতনের পর সামরিক ক্ষেত্রে অবশ্য অবস্থার উন্নতি ঘটতে থাকে। প্রেসিডেন্ট জিয়ার আমলে অবস্থার উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে উপমহাদেশের অপর দু'টি দেশ ভারত পাকিস্তানের সমর শক্তির উপর একবার নজর বুলানো যাক। এখানে উল্লেখ যে, সংশ্লিষ্ট দু'টি দেশের জনসংখ্যা

www.pathagar.com

সামরিক সমরশক্তি ও যুদ্ধাস্ত্র সম্পর্কে যে পরিসংখ্যান দেওয়া হয়েছে তা পৃথিবীর সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য সমর সাময়িকী লন্ডনের 'ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ' (আইআইএসএস) কর্তৃক প্রকাশিত 'দি মিলিটারী ব্যালান্স' ১৯৮৮-৮৯ থেকে নেওয়া হয়েছে 'ফার ইস্টার্ণ ইকনমিক রিভিউ' কর্তৃক প্রকাশিত 'এশিয়া ইয়ার বুক ১৯৮৯' ও 'জেনস ফাইটিং মেশিন' আমেরিকা থেকে।

।।২।।

পাকিস্তান ও ভারতের জনসংখ্যা হল যথাক্রমে ১০ কোটি ২৮ লাখ ও ৭৯ কোটি ৯৭ লাখ। ১৯৮৮-৮৯ অর্থ বছরে দেশ দু'টির প্রতিরক্ষা বাজেট ছিল যথাক্রমে মার্কিন ডলার ২.৮৭ বিলিয়ন এবং ৯.৮৯ বিলিয়ন। বাংলাদেশী মুদ্রায় এর বিনিময় হার দাঁড়ায় যথাক্রমে ৯ হাজার ৪২ কোটি টাকা (পাকিস্তান) ৩২ হাজার ১ শত ৭৫ কোটি টাকা (ভারত)। সূত্র ঃ আইআইএসএস লন্ডন ঃ পৃঃ ১৭৩ ও ১৬০।

সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনী অর্থাৎ সম্মিলিত সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য সংখ্যা হল ঃ পাকিস্তান ৪ লাখ ৮০ হাজার ও ভারত ১৩ লাখ ৬৭ হাজার। সেনাবাহিনীর প্রধান যুদ্ধাস্ত্র হল ট্যাঙ্ক। এক্ষেত্রে লাইট ও মিডিয়াম ট্যাঙ্কের সংখ্যা হল, পাকিস্তান ২৩০০টি ও ভারত ৩৭৫০টি। পাকিস্তানের ট্যাঙ্ক বহরে মার্কিন এম ৪৭/৪৮ টাইপের ৪৫০টি ছাড়া অবশিষ্ট ১৮৫০টির সবগুলোই রুশ বা রুশ-ভারত যৌথ উদ্যোগে নির্মিত।

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ তিনটি প্রতিরক্ষা সাময়িকী অনুযায়ী ১৯৮৮-৮৯ সালে পাকিস্তানের জঙ্গী বিমানের সংখ্যা ৩৪১ ও ভারতের ৭২১। পাকিস্তানের জঙ্গী বিমানের মধ্যে বে-নজীর ভুট্টো প্রেসিডেন্ট বুশের নিকট থেকে যে ৬০টি এফ-১৬ জঙ্গী বিমানের অনুমোদন পেয়েছেন সেই ৬০টি এবং ১০০টি চীনা এফ-৭ বিমান অন্তর্ভুক্ত হয়নি। ভারতের বিমান বহরে রয়েছে ঝাঁকে ঝাঁকে অত্যাধুনিক জঙ্গী বিমান। এগুলোর মধ্যে রয়েছে ৪০টি সর্বাধুনিক রুশ মিগ-২৯, ৭২টি মিগ-২৭, ৪০টি অত্যাধুনিক ফরাসী মিরাজ ২০০০, ৭২টি সর্বাধুনিক ইঙ্গ-ফরাসী জাগুয়ার প্রভৃতি। পাকিস্তানের বহরে সর্বাধুনিক বলতে একমাত্র ৩৯টি মার্কিন এফ-১৬ বিমানকে বোঝায়। আরও ৬০টি এলে এর সংখ্যা হবে ৯৯। যে ৯১টি ফরাসী মিরাজ রয়েছে জঙ্গী বিমান হিসাবে তা ভাল হলেও তা পুরাতন মডেলের (মিরাজ-৩ ও মিরাজ-৫)।

নৌবাহিনীর ক্ষেত্রে পাকিস্তানের রয়েছে ৬টি সাবমেরিন, ৮টি ডেস্ট্রয়ার, জঙ্গী নৌবিমান ৪টি, আমর্ড হেলিকপ্টার ৯টি। যে ২৯টি পেট্রোল ও কোস্টাল ক্রাফট রয়েছে ঐগুলোও ক্ষেপণাস্ত্র সজ্জিত। পাকিস্তানের কোন পারমাণবিক শক্তিচালিত সাবমেরিন বা বিমানবাহী জাহাজ নেই। পক্ষান্তরে নৌশক্তির ক্ষেত্রে ভারতের ঘটেছে ভয়াবহ বিস্তার। ভারতের রয়েছে একটি পারমাণবিক শক্তিচালিত সাবমেরিন, ১৪টি সাবমেরিন, ২টি বিমানবাহী জাহাজ 'অজিত' ও 'বিক্রান্ত', ৫টি ডেস্ট্রয়ার, ২৪টি ফ্রিগেট, ১৬টি নৌজঙ্গী

www.pathagar.com

বিমান। ক্ষেপণাস্ত্র সজ্জিত ৩৭টি রণতরী, ১০টি উভচর ক্রাফট, মাইন সুইপার ১৭টি। ১৩ই জানুয়ারীর সংবাদপত্রে দেখা গেল, পাকিস্তান আরও সাবমেরিন, হেলিকপ্টারবাহী ডেস্ট্রয়ার এবং নৌ-উপকুল টহল বিমান সংগ্রহের প্ল্যান চূড়ান্ত করেছে।

ক্ষেপণাস্ত্র সংগ্রহ বা নির্মাণের ক্ষেত্রেও ভারত ও পাকিস্তান অনেক দূর এগিয়েছে। গত বছরের এপ্রিল মাসে ভারত 'অগ্নি' নামক মাঝারিপাল্লার (১৬০০ কিলোমিটার ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। কয়েকদিন আগে ভারতের অন্যতম বিজ্ঞানী ড. করিম বলেছেন, ভারতের প্রযুক্তির এমন উন্নতি ঘটেছে যে, অর্থ পেলে তারা এই মুহূর্তেই ৫০০০ কিঃমিঃ বা ৩ হাজার ১শত ২৫ মাইল পাল্লার আন্তমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র (আইসিবিএম) বানাতে সক্ষম। পাকিস্তানের সশস্ত্র বাহিনীতে কোবরা, টাউ, স্টিংগার, আটলান্টিক, সি কিং, এক্সোসেট প্রভৃতি এবং ভারতীয় বাহিনীতে টাইগারক্যাট, ডিভিনা, কেরী প্রভৃতি ক্ষেপণাস্ত্র রয়েছে। সামরিক ক্ষেত্রে ভারতের সবচেয়ে বড় সাফল্য হল পারমাণবিক বোমা বানানোর জন্য প্রয়োজনীয় পারমাণবিক ডিভাইস অর্জন। ১৯৭৪ সালে ভারত সফল পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। পাকিস্তানের হাতে বর্তমানে ৮ থেকে ১২টি মাঝারি আকারের পারমাণবিক বোমা রয়েছে বলে বিদেশের সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা সমূহ মনে করেন।

।।৩।।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব কি বিপন্ন হতে পারে? হলে কোন দিক থেকে? কার বা কাদের দ্বারা? হলে কোন পথে? ভারতের এই বিপুল সমরসজ্জা কেন? এই প্রশ্নগুলোর সঠিক উত্তরই এই নিবন্ধের শিরোনামকে অর্থবহ করে তুলবে। প্রথমেই দেখা যাক ভারতের এই বিপুল সমর সজ্জা কেন? ১৯৬২ সালে চীনের সাথে যুদ্ধে শোচনীয়ভাবে মার খাওয়ার পর ভারত সামরিক শক্তি বৃদ্ধির প্রতি মনোযোগী হয়। তখন সে প্রধানত মাউন্টেন ডিভিশন গড়ার দিকেই অধিকতর মনোনিবেশ করে। ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের ফলাফল সমান সমান হওয়ায় ভারত সামরিক বাহিনীর সর্বক্ষেত্রেই সম্প্রসারণ ঘটাতে থাকে। ১৯৭১ সালের বাংলাদেশ যুদ্ধে পাক–ভারত সামরিক শক্তি-সাম্য সুস্পষ্টভাবে ভারতের অনুকূলে চলে যায়। পাকিস্তান থেকে পূর্বাঞ্চল বিচ্ছিন্ন হওয়ায় ভারতের ইস্টার্ণ কমান্ড রাখার প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে যায়। পূর্ব পাকিস্তানের বিচ্ছিন্নতার অবধারিত পরিণতিতে শেখ আব্দুল্লাহ মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েন এবং কাশ্মীরের ভারতভুক্তি মেনে নিতে বাধ্য হন অতঃপর পণ্ডিত নেহেরুও ঐতিহাসিক গ্রন্থ 'ডিসকভারি অব ইন্ডিয়া'য় বর্ণিত আদর্শ প্রতিষ্ঠায় অখণ্ড মনযোগ দেন এবং সেইভাবে দ্রুত সামরিক শক্তি অর্জন করতে থাকে। ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যুর পর পুত্র রাজীব গান্ধী আরও উগ্রতার সাথে সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করতে থাকেন। আজ সৈন্য সংখ্যার দিক দিয়ে ভারত বিশ্বের ৪র্থ বৃহত্তম সামরিক শক্তি। প্রথম সোভিয়েত ইউনিয়ন ৫০ লাখ ৯৬ হাজার। দ্বিতীয় গণচীন ৩২ লাখ। তৃতীয় আমেরিকা ২১ লাখ

www.pathagar.com

৬৭ হাজার। আগ্রার তাজমহল থেকে মাত্র ৫ মাইল দূরে রয়েছে ভারতের ভূগর্ভস্থ শক্তিশালী বিমান ঘাঁটি। এখান থেকেই উড়ে গিয়ে ভারতীয় জঙ্গী বিমান প্রচণ্ড ক্ষিপ্রতায় দখল করেছিল মালদ্বীপ। বোম্বের বিশাল শিপইয়াডে তৈরী হচ্ছে জার্মান সাবমেরিন। মহারাজপুরে বাংলাদেশী মুদ্রায় ৩ হাজার ৩ শত কোটি টাকায় নির্মিত হয়েছে অপর একটি শক্তিশালী বিমান ঘাঁটি যেখানে মোতায়েন রয়েছে ৪০টি অত্যাধুনিক ফরাসী মিরাজ-২০০০ বিমান। বাঙ্গালোরের দক্ষিণাঞ্চলে আইবিএম কম্পিউটার প্রযুক্তিতে যে হাল্কা বিমান নির্মাণ কমপ্লেক্স গড়ে উঠছে তা বাস্তবায়িত হলে ভারত জঙ্গী বিমানের ক্ষেত্রে পৃথিবীর ৬ষ্ঠ শক্তিতে পরিনত হবে। বাঙ্গালোরে বাংলাদেশী মুদ্রায় সাড়ে তিন হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে দৈত্যকায় 'হিন্দুস্থান এ্যারোনেটিকস্ লিঃ গড়ে উঠছে। এখানে তৈরী হচ্ছে সর্বাধুনিক ইঙ্গ-ফরাসী জাগুয়ার। এখান থেকে আরও ৫ শত মাইল উত্তর-পশ্চিমে নাসিক। এখানে তৈরী হচ্ছে হাইপার সনিক স্পীডের রুশ মিগ-২৭ ও মিগ-২৯।

এই বিরাট সমরশক্তি অর্জনের পর ভারতের নজর এখন বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। ১৯৮৮ সালে অস্ট্রেলিয়ার সিডনীতে অস্ত্র বোঝাই একটি ভারতীয় জাহাজ আটক করা হয়। তদন্তে প্রকাশ পায় যে, ঐ জাহাজ বোঝাই অস্ত্র ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র' ফিজিতে পাঠাচ্ছিল একটি সামরিক অভ্যুত্থান ঘটানোর জন্য। যার মাধ্যমে ভারতীয় বংশোদ্ভূত ফিজিয়ানিদের দ্বারা ফিজিতে ভারতের একটি আজ্ঞাবহ সরকার প্রতিষ্ঠা করা যায়। এই ভয়াবহ ষড়যন্ত্র উদঘাটিত হওয়ায় রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতায় উদ্বিগ্ন ইন্দোনেশিয়া সুমাত্রায় একটি নৌ-ঘাঁটি স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এই দানবীয় মিলিটারী পাওয়ার অর্জনের মতলব কয়েকজন ভারতীয় সামরিক বিশ্লেষক ফাঁস করে দিয়েছেন। এ্যাডমিরাল কৃষ্ণ নায়ার বলেন, "বিশ্বের ছোট রাষ্ট্রগুলো রাশিয়া, আমেরিকা বা চীনের সাথে গাঁট ছড়া বাঁধছে। শীঘ্রই তারা মালুম করবে যে, ভারতও একটি পরাশক্তি। এই পরাশক্তির অভিভাবকত্বেও কয়েকটি দেশ রয়েছে।" বিখ্যাত ভারতীয় প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞ কৃষ্ণস্বামী সুব্রমনিয়াম বলেন, "সমরসজ্জা দ্বারা ভারত একদিন বিশ্বসভায় তার যোগ্য স্থান পাবে। আমরা জনসংখ্যার দিক দিয়ে ২য় বৃহত্তম রাষ্ট্র। তবুও আমরা নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য নই। এটা আমাদের জন্য বঞ্চনা। " প্রাক্তন পররাষ্ট্র সচিব সুয়ারান বলেন, "চীনকে যদি পরাশক্তি হিসাবে স্বীকার করে নেওয়া হয় তাহলে ভারতকে স্বীকার করে নিতে আপত্তি কোথায়?" মার্কিন টাইম ম্যাগাজিনের এক সাংবাদিককে ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একাধিক শীর্ষ স্থানীয় কর্মকর্তা বলেছেন, "দক্ষিণ আফ্রিকায় যেভাবে গণ-অসন্তোষ লেগে আছে তাতে ভারতকে 'ব্লু ওয়াটার নেভী' গড়ে তুলতে হবে। ভারত এখন তার প্রভাব বলয়ের মধ্যে শুধু মালদ্বীপই নয়, মৌরিতানিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল অন্তর্ভুক্ত করার চিন্তা করছে।"

www.pathagar.com

।।৪।।

ওপরে একাধিক স্তবকে বর্ণিত তথ্য পরিসংখ্যান ও বিশ্লষণের পর ভারতের সমরসজ্জার অন্তর্নিহিত মতলব সম্পর্কে কারও কোন ভ্রান্তি বিলাস থাকা উচিত নয়। যদি কেউ মনে করেন যে, ভারত চীনকে মোকাবিলা করবে তাহলে তিনি বেকুবের বেহেশতে রয়েছেন। চীনের পারমাণবিক শক্তির কথা না হয় বাদই দিলাম। প্রচলিত অস্ত্রের ক্ষেত্রে চীনের যে বিশাল সংখ্যাগত প্রাধান্য বা শ্রেষ্ঠত্ব, তার সামনে ভারতের দাঁড়াবার শক্তি নেই। আইআইএসএস লন্ডন, ১৯৮৮-৮৯,পৃঃ ১৪৭,১৪৮,১৪৯ ও ১৫০ অনুযায়ী ভারতের ট্যাঙ্কের সংখ্যা যেখানে ৩ হাজার ৭ শত সেখানে চীনের ৯ হাজার। জঙ্গী বিমানের ক্ষেত্রে ভারতের সংখ্যা ৭২১ আর চীনের ৬ হাজার। ভারতের রয়েছে ১৪টি সাবমেরিন, সেখানে চীনের ১১৫টি। ভারতের ১৬টি নৌ-জঙ্গী বিমান। পক্ষান্তরে চীনের ৯শ'টি।

।।৫।।

সুতরাং কৌটিল্য ও চাণক্যের উত্তরসুরীরা এত বোকা নয় যে, তারা চীনের এই বিপুল সমর সম্ভারে আঘাত করে ভীমরুলের চাকে ঢিল দেবে। ভারতের বিগত ৪২ বছরের কাণ্ড-কারখানা, পাকিস্তানের সাথে তিন তিনটি যুদ্ধ, গোয়া, দমন, দিউ, কাশ্মীর, জুনাগড়, মানভাদার, হায়দারাবাদ ও সিকিম দখল, শ্রীলংকা ও মালদ্বীপে সামরিক অভিযান, নেপালের কণ্ঠরোধ, ফিজিতে অভ্যুত্থানের মদদ যোগান, মৌরিতানিয়া পর্যন্ত থাবা বিস্তারের আশংকা এবং এই নিবন্ধের অন্যত্র পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞদের প্রকাশ্য উক্তি প্রমাণ করেছে, শুধু অখণ্ড ভারতের স্বপ্নদ্রষ্টা নেহেরুর স্বপ্ন বাস্তবায়নই নয়, বরং কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারিকা, বিন্দ্যাচল থেকে মালদ্বীপ এবং শ্রীলংকা থেকে ফিজি ও মৌরিতানিয়া এই বিশাল অঞ্চলে ভারত তার প্রভুত্বের থাবা বিস্তার করতে চায়। সামান্যতম প্রতিবন্ধকতা সে বরদাস্ত করতে রাজী নয়। নেপাল চীন থেকে ক্ষেপণাস্ত্র কেনার 'স্পর্ধা' দেখিয়েছিল। তাই দিল্লী নেপালের টুটি চিপে ধরেছিল। যে বীর শিখরা ছিল ভারতীয় সেনাবাহিনীর কণ্ঠহার, আজ জাঠ ও রাজপুত সেনারা তাদের রক্তে হোলি খেলছে। বিগত ৪২ বছর ধরে ৬০ লাখ আজাদী পাগল কাশ্মীরী জনগণ ভারতীয় হানাদার বাহিনীর বুটের তলায় পিষ্ট। প্রেসিডেন্ট জিয়া ভারতীয় লাইন অগ্রাহ্য করার বেয়াদবী করেছিলেন। জীবন দিয়ে তাঁকে এই বেয়াদবীর 'প্রায়শ্চিত্ত' করতে হয়েছে।

সুতরাং আমাদের স্বাধীনতার প্রধানতম দুশমন ভারত। যারা উঠতে বসতে পাকিস্তানকে স্বাধীনতার শত্রু বলে চালিয়ে দেয়, তাদের বিলক্ষণ জানা আছে যে, ইচ্ছে করলেও পাকিস্তান বাংলাদেশ আক্রমণ করতে পারবে না। হামলা করতে হলে হাজার হাজার মাইল বিস্তৃত ভারতের মাটি পার হয়ে আসতে হবে। এটা আকাশ কুসুম কল্পনা মাত্র। বাংলাদেশের তিনদিকে ভারত। দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরকে নিয়ন্ত্রণ করছে ভারতের দুইটি এয়ারক্রাফট কেরিয়ার। সুতরাং হামলা যদি আসেই তাহলে আসবে ভারত থেকে। অন্য কোথাও থেকে নয়।

www.pathagar.com

এ অবস্থায় আমাদের আজাদী ও সার্বভৌমত্ব টিকিয়ে রাখার একমাত্র রাস্তা হল ক্ষিপ্র গতিসম্পন্ন শক্তিশালী অত্যাধুনিক সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলা। একই সাথে চীন, পাকিস্তান, আমেরিকা ও মুসলিম বিশ্বের সাথে ঘনিষ্ঠতম ও তাৎপর্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলা। মাত্র ৪৪ লাখ লোকের দেশ ইসরাইল। কিন্তু চারদিক বিরাট বিরাট রাষ্ট্র পরিবেষ্টিত হওয়া সত্ত্বেও ইসরাইল তার সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব বারংবার প্রমাণ করেছে। ইসরাইল একটি অবৈধ রাষ্ট্র। ইসরাইল আমাদের দুশমন। কিন্তু প্রতিকূল শক্তি পরিবেষ্টিত অবস্থায় কি করে অস্তিত্ব রক্ষা করতে হয় সে বিষয়ে তার দৃঢ়সংকল্প থেকে আমাদের অবশ্যই শিক্ষা নিতে হবে। তাদের ট্যাঙ্ক বহরে রয়েছে ৩৮৫০টি ট্যাঙ্ক। বিমান বহরে ৫৭৭টি জঙ্গী বিমান। বিদেশী গোয়েন্দা সূত্রের অসমর্থিত খবরে প্রকাশ, তাদের ১০০টি আণবিক ওয়ারহেড রয়েছে। শত্রু-পরিবেষ্টিত অবৈধ ইসরাইলের প্রতিরক্ষা চেতনা থেকে এক সাগর রক্তের বিনিময়ে অর্জিত শত্রু-বেষ্টিত বাংলাদেশের স্বাধীনতা রক্ষার ব্যাপারে আমাদের অনেক কিছু শিখবার রয়েছে। একটি জাঁদরেল শত্রু-পরিবেষ্টিত অবস্থায় ১১ কোটি মানুষের দেশের প্রতিরক্ষার জন্য বাংলাদেশের পর্যাপ্ত সমরশক্তি চাই যে কোন মূল্যে। এতদিন যে আমরা বলেছি বাংলাদেশের সম্পদে পাকিস্তান চলেছে। সেই বাংলাদেশ বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরও পাকিস্তান সামরিকভাবে আরও দ্বিগুণ শক্তিশালী হয় কিভাবে? অর্থ কোন সমস্যা নয়। বন্যা, ঝড়, জলোচ্ছাসে পশ্চিমা ও ইসলামী দুনিয়া আমাদের কত সাহায্য দিয়েছে আর কি কেউ এত পেয়েছে? আসলে অর্থ নয়, চাই প্রবল ইচ্ছা। চাই জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষার লক্ষ্যে দূর্ধর্ষ, ক্ষিপ্রগতি সম্পন্ন সর্বাধুনিক সামরিক বাহিনী গড়ে তোলার দুর্দমনীয় সংকল্প।

সূত্র ঃ দৈনিক ইনকিলাব তাং ২৬-৩-১৯৯০

www.pathagar.com

সামরিক শক্তির স্বপক্ষে

[এই লেখাটি ছাপা হয়েছে এক যুগ আগে। তারপরও দেখা যাচ্ছে যে, সামরিক শক্তির তুলনামূলক এবং কাঠামোগত পরিবর্তন তেমন একটা হয়নি। তবে ১২ বছরের ব্যবধানে তথ্য ও পরিসংখ্যানগত পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। – লেখক]

আমার সন্তান কেউ
সামরিক পোশাক পরবেনা
দরকার হলে তারা অবশ্যই
পিতার মতন জলপাইরং
মুক্তিযুদ্ধের পোশাক তুলে নেবে
প্রথম পছন্দ বলে।

উপরের লাইন কটি একটি কবিতা সংকলন হতে উদ্বৃত। যে গ্রন্থে এসব কবিতা সংকলন করা হয়েছে উক্ত গ্রন্থের নাম 'রফিক আজাদের শ্রেষ্ঠ কবিতা'। এ গ্রন্থের ১শত/ দেড় শত কবিতায় রয়েছে উপরের ৬টি লাইন। এ কবিতা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, বাংলাদেশের কোন সামরিক বাহিনী থাকুক, এই কবি তা চান না। এ মতামত শুধু এ কবিরই নয়। বাংলাদেশের একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ ও একটি পাওয়ার ফুল লবি রয়েছে যারা মনে করেন যে, বাংলাদেশে কোন সামরিক বাহিনী থাকা উচিত নয়। আর যদি থাকেও তাহলে নেহায়েত নামকা ওয়াস্তে।

নাড়ি ধরে টানাটানি

বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য হল এই যে, এ দেশটি আজও নিজের পরিচয় ঠিক করতে পারেনি। এ দিক দিয়ে বাংলাদেশ পৃথিবীর মানচিত্রে সম্ভবত একটি বিরল দেশ ও জাতি। স্বাধীনতার পর ২৩টি বছর পার হয়ে গেল। আজও সর্বসম্মত ভাবে ঠিক হলনা যে, আমরা বাঙালী না বাংলাদেশী। এখন অনেকে বলছেন যে, আমরা আগে বাঙালী, পরে মুসলমান। আবার অন্যেরা বলছেন যে, আমরা আগে মুসলমান, পরে বাঙালী। ঠিক এমনি একটি অমীমাংসিত বিষয় হল প্রতিরক্ষা নীতি তথা সামরিক বাহিনী। আমাদের শক্তিশালী সামরিক বাহিনী থাকবে কি থাকবে না , সে প্রশ্নের চূড়ান্ত ফয়সালা হয়নি। এসব প্রশ্ন শুধুমাত্র বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর থেকেই যে অমীমাংসিত রয়ে গেছে তাই নয়। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পরেও এসব বিতর্কের অবসান হয়নি।

www.pathagar.com

ভারত বর্ষের বিতর্কিত ৩টি এলাকা

এ ধরনের মৌলিক বিষয়গুলো অমীমাংসিত রয়ে গেছে ভারতবর্ষের ৩টি এলাকায়। এই ৩টি এলাকা হল ১। ভারতীয় পাঞ্জাব ২। কাশ্মীর এবং ৩। বাংলাদেশ।

পাকিস্তানের অন্তর্ভূক্ত কাশ্মীরে জাতি সত্তার কোন বিরোধ নেই। মুসলমান পরিচয়ে পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদকে তারা তাদের জাতীয় আদর্শ হিসেবে সর্বসম্মতভাবে গ্রহণ করেছে। কিন্তু ভারতে এটা হয়নি। ভারতীয় পাঞ্জাবের অধিবাসীরা নিজেদেরকে পাঞ্জাবী হিসাবে ভাবছে না, প্রথমে নিজেদেরকে শিখ হিসেবে ভাবছে। শিখ ধর্মাবলম্বী হিসেবে তারা পাঞ্জাবকে ভারত থেকে বের করে এনে খালিস্তান রাষ্ট্র নামে স্বাধীন করতে চায়। হিন্দু ধর্মাবলম্বী পাঞ্জাবীরা ছাড়া সমস্ত শিখ পাঞ্জাবীরা স্বাধীন খালিস্তান প্রশ্নে মোটামুটি একমত। এজন্যই পাঞ্জাবে হয়েছিল ভারতীয় শাসনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম। কাশ্মীরের অবস্থাও একই। কাশ্মীরের ৭০ লাখ কাশ্মীরী ভারত থেকে আলাদা হয়ে কাশ্মীরকে স্বাধীন করতে চায়। অথবা পাকিস্তানের সাথে যোগ দিতে চায়। এ জন্য কাশ্মীরেও চলছে ভারতের বিরুদ্ধে রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা সংগ্রাম। বাংলাদেশের জাতি সত্তার প্রশ্নটির এখনো চূড়ান্ত ফয়সালা হয়নি। এ কারণে বাঙালী বা বাংলাদেশী বির্তক। এ কারণেই মুসলমান বা বাঙালী বিতর্ক। এ কারণেই প্রশ্ন উঠছে যে, বাংলাদেশে শক্তিশালী সামরিক বাহিনীর দরকার আছে কি নাই।

একটি অবাঞ্ছিত বির্তক

যখন প্রশ্ন ওঠে যে আমাদের শক্তিশালী সামরিক বাহিনীর দরকার আছে কিনা। তখন সে বির্তককে অনভিপ্রেত না বলে উপায় থাকে না। ১২ কোটি মানুষের দেশে স্ট্রং মিলিটারী থাকবে না এটা ভাবাই যায় না। যদি তারা বলতেন, আমাদের শক্তিশালী সামরিক বাহিনীর প্রয়োজন আছে অবশ্যই। কিন্তু আমরা গরীব দেশ, এমন শক্তিশালী বাহিনীর জন্যে আমরা প্রয়োজনীয় অর্থ যোগাব কিভাবে, তাহলে সে প্রশ্নটা ভেবে দেখার অবকাশ ছিল। তাই বলে মূল প্রশ্নে বিরোধ শুধু অবাঞ্ছিতই নয়, দুরভিসন্ধিমূলক বলে মনে হয়। কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি ঃ সিঙ্গাপুর একটি দেশ। আয়তন মাত্র ৪ শত বর্গমাইল, বলতে গেলে ঢাকা মহানগরীর সমান। সে দেশে যখন ৪ বিলিয়ন অর্থাৎ বাংলাদেশী মূদ্রায় ১৬ হাজার কোটি টাকা খরচ করে শতাধিক জঙ্গী বিমান ক্রয় করা হয় তখন কিন্তু সিঙ্গাপুরের একটি মানুষও জঙ্গী বিমান কেনার যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন না।

আরেকটি দেশ তাইওয়ান। আগে নাম ছিল ফরমোজা। বাংলাদেশের চেয়ে অনেক অনেক ছোট। এই দেশটি এমন একটি দেশ যা বাংলাদেশের ৭ ভাগের এক ভাগের চেয়েও কম। অথচ এই দেশটির সামরিক বাজেট হল দশ বিলিয়ন ডলারের চেয়েও বেশি। এত ছোট একটি দেশের জন্য এত বিশাল অংকের সামরিক বাজেটের যৌক্তিকতা নিয়ে তাইওয়ানে একটি প্রশ্নও কেউ তোলেননি। অথচ বাংলাদেশের সামরিক বাজেট ১৬ শত কোটি টাকা বা ৪০ কোটি ডলার। অর্থাৎ তাইওয়ানের ২৫

www.pathagar.com

ভাগের মাত্র এক ভাগ। এটা নিয়েই এখন কত কথা। যদি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিটা এমন হত যে, আমাদের শক্তিশালী সামরিক বাহিনীর প্রয়োজন ঠিকই আছে। কিন্তু আমাদের এত টাকা পয়সা নেই বলে বরাদ্দ কম করা হচ্ছে তা হলে সেটা বিবেচনা করা যেত।

শক্তিশালী মিলিটারীর বিপক্ষে যুক্তি

কিন্তু এখন বলা হচ্ছে সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা। বলা হচ্ছে যে, আমাদের চারধারে রয়েছে বিশাল ভারত। আমাদের সামরিক শক্তির প্রয়োজন কি? কার সাথে আমরা লড়ব? ভারতের সাথে যুদ্ধ করা কি কোনদিন কল্পনা করা যায়? এ ধরনের যুক্তিকে প্রথম প্রথম খুব কনভিনসিং মনে হয়। কিন্তু একটু গভীরে গেলেই মনে হয় এ সব যুক্তি ধোপে টেকে না।

পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী দেশ আমেরিকা, সেই আমেরিকার পায়ের তলায় ক্ষুদ্র একটি দেশ 'কিউবা'। সেই কিউবা আমেরিকার প্রভূত্বকে একদিনের জন্যও মেনে নেয়নি। এ কিউবাকে নিয়ে আমেরিকা ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে পারমাণবিক যুদ্ধ তথা তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধ বাধার উপক্রম হয়েছিল। এর ফলে কিউবা হয়ত এই ধরা ধাম থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারত। তারপরেও কিন্তু কিউবা আমেরিকার বশ্যতা স্বীকার করে নেয়নি।

সুবিশাল চীনের পাশে বিন্দুর মত একটি দেশ তাইওয়ান। কিন্তু বিগত ৪৩ বছর হল, তাইওয়ান চীনের আধিপত্য মেনে নেয় নাই। একই কথা হংকং এর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

আরেকটি জ্বলন্ত উদাহরণ হল ইসরাইল চারদিকে শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রচণ্ড চাপে, যে দেশটির চ্যাপটা হওয়ার কথা ছিল, সেই ইসরাইল আজ সবগুলো মুসলিম দেশের ওপর ছড়ি ঘোরাচ্ছে। আমরা অর্থাৎ বাংলাদেশ তা হলে সব সময় ভারতের ভয়ে কেন থাকব থরহরি কম্পমান?

ভারত-বাংলাদেশের কঠোর বাস্তবতা

বাংলাদেশের প্রতিরক্ষানীতি, পররাষ্ট্রনীতি এবং অর্থনৈতিক নীতি প্রণয়ন করার সময় আমাদের মনে রাখতে হবে যে, ভারত আমাদের সামনে সবচেয়ে বড় ফ্যাক্টর। এমনকি রাজনৈতিক আদর্শ নির্ধারণের সময়ও ভারতকে সামনে রেখে সেটা করতে হবে। ভারত এবং বাংলাদেশের মৌলিক নীতিগুলো যদি এক হয় তাহলে বাংলাদেশের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রক্ষা করা যাবে না। দুই জার্মানী এক হয়ে গেছে। ইয়েমেনের ক্ষেত্রেও এমনটি ঘটতে যাচ্ছে। দুই কোরিয়ার একইভূত হওয়ার মধ্যে যেটা সবচেয়ে বড় বাধার প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সেটা হল উত্তর কোরিয়ার বিশাল সামরিক শক্তি।

ভারত যদি ৬ লাখ সৈন্যকে কাশ্মীরে মোতায়েন না করত এবং নির্বিচারে গণহত্যা না চালাত, তা হলে ভারত অধিকৃত কাশ্মীর এতদিন হয় স্বাধীন হত, না হয় পাকিস্তানে যোগ দিত। অনুরূপভাবে ভারত অধিকৃত পাঞ্জাবের স্বাধীনতাও ঠেকিয়ে রেখেছে ভারতের দানবীয় সামরিক শক্তি।

www.pathagar.com

সামরিক শক্তি-ভারতীয় অখণ্ডতার প্রতীক

খুব বড় গলায় বলা হয় যে, গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থাই নাকি বিশাল ভারতকে ঐক্যবদ্ধ রেখেছে। আরো বলা হয় যে, ভারতীয় রাজ্য বা প্রদেশগুলোর স্বেচ্ছা সম্মতির মাধ্যমেই ভারত একটি ফেডারেল রাষ্ট্র হিসেবে টিকে আছে। একথা সত্যের সম্পূর্ণ অপলাপ। মিজোরাম, মেঘালয়, নাগাল্যান্ড, মনিপুর এবং অরুণাচল বছরের পর বছর ধরে দিল্লীর শাসনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার জন্য রক্তস্নাত লড়াই করেছে। কিন্তু ভারতের বিশাল পাশবিক সামরিক শক্তি তাদের স্বাধীনতার কণ্ঠকে স্তব্ধ করে দিয়েছে। যদি হিম্মত থাকে তাহলে ভারত তার উত্তর পূর্বাঞ্চলে গণভোট অনুষ্ঠান করুক। তাহলে মেঘালয়, আসাম, নাগাল্যান্ড, মিজোরাম, অরুণাচল এবং মনিপুর স্বাধীনতার স্বপক্ষে রায় দেবে। কাশ্মীর এবং পাঞ্জাব গণভোটের সুযোগ পেলে দিল্লীর শৃংখল চূর্ণ করে স্বাধীনতার স্বপক্ষে রায় ঘোষণা করবে। এমনকি কেরালা, তামিলনাড়ু প্রভৃতি রাজ্য কোন দিকে যাবে সেটাও বলা মুশকিল।

ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদ সত্যের অপলাপ

ভাষাই যদি জাতীয়তার ভিত্তি হবে, তা হলে ভারত ভেঙ্গে অনেকগুলো স্বাধীন দেশের অভ্যুদয় ঘটত। উড়িয়া ভাষার ভিত্তিতে উড়িষ্যা দেশ, উর্দু ভাষার ভিত্তিতে বিহার ছাড়াও গুজরাট, রাজস্তান, তামিলনাড়ু সহ অন্তত ১৪টি স্বাধীন রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটত। বাংলা ভাষাই যদি বাংলাদেশের ভিত্তি হয় তাহলে পশ্চিমবঙ্গও একটি স্বাধীন দেশ হত। আর তা না হলে বাংলাদেশের সাথে যুক্ত হয়ে বৃহত্তর অখণ্ড স্বাধীন বাংলাদেশ হত। কিন্তু এর কোনটাই হয়নি। পশ্চিমবঙ্গ ভারতের সাথেই রয়েছে। আর ভারতের ভিত্তি কি? ভারতের স্থপতি পণ্ডিত নেহেরু ঘোষণা করেন যে, ভারতীয় সাংস্কৃতির বিশাল ইমারত দাঁড়িয়ে আছে সংস্কৃত ভাষার ওপর। ভারতীয় সংস্কৃতি এবং ভারতীয় জাতীয়তার ভিত্তি হল ৫ হাজার বছরের ঐতিহ্য এবং সভ্যতা। এই ঐতিহ্য এবং সভ্যতার ভিত্তি হল হিন্দু ধর্ম। এই কথাটিই পণ্ডিত নেহেরু তার "ডিসকভারি অব ইন্ডিয়া" গ্রন্থের অনেক স্থানে বর্ণনা করেছেন। এই ধরনের একটি আদর্শ ভিত্তিক দেশের সাথে বাংলাদেশের মিল হবে কিভাবে?

ভারতের সীমাহীন উচ্চাভিলাষ

ভারতের উচ্চাভিলাষ যে কত সীমাহীন সে কথা বর্ণনা করেছেন পণ্ডিত নেহেরু। তার সেই, 'ডিসকভারী অব ইন্ডিয়া', পুস্তকটিতে তিনি বলেছেন যে,ভারত হবে বিশ্বের ৪র্থ শক্তিশালী রাষ্ট্র যার ক্ষমতার বলয় হবে পশ্চিমে আফ্রিকা থেকে পূর্বে ইন্দোচীন পর্যন্ত। নেহেরুর এই কথাটির প্রতিধ্বনি করেছেন ভারতের প্রতিরক্ষা বিশ্লেষক সুব্রমনিয়াম এবং বিশিষ্ট সাংবাদিক ভবানি সেন গুপ্ত। ৪০ এর দশকে নেহেরু বলেছেন, There are many advanced highly cultured countries . But if you peep into the future and if nothing goes wrong, wars and the like, obvious fourth country in the world is India,

www.pathagar.com

মিঃ সুব্রমনিয়াম বলেছেন, "This country (i,e, India) with it's population, size, resources and industrial output will be a dominant country in the region just as the U.S, Soviet Union and China happen to be in there respective areas. This is just a fact of geography, economics and techonology.

(India's Security perspectives, New Delhi 1983 p.224)

ভারতীয় সাংবাদিক ভবানি সেন গুপ্ত বলেছেন, India will not tolerate any intervention in any South Asian country, if the intervention has any implicit or explicit anti-India implication. No south Asian government must, therefore, ask for external military assistance with an anti-India bias from any country (India Today, 31 August 1993)

চীন-ভারত সম্পর্ক

এই নিরিখেই বিবেচনা করতে হবে চীন-ভারত সম্পর্ক। ভারত ও চীনের ভেতর আজ সম্পর্কের বরফ গলতে শুরু করেছে বলে অনেকে মনে করছেন। কিন্তু এটা বাস্তব নয়। চীন ইতিমধ্যেই এশিয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। চীনের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার ১৩ শতাংশ। চীন ইতিমধ্যেই পৃথিবীর তৃতীয় পরাশক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। এক আকাশে দুই সূর্য থাকতে পারে না। সুতরাং ভারত এশিয়ায় আরেকটি মহাশক্তি হিসেবে উত্থিত হউক এবং চীনের প্রতিদ্বন্দ্বী হউক, এটা চীন বরদাশত করতে পারবে না। এখানেই রয়েছে বাংলাদেশের বিশেষ সুবিধা। বাংলাদেশের পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষানীতি প্রণয়নে এই বিষয়টি একটি গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করবে।

বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্রনীতি

আমেরিকার পাশে কিউবা, চীনের পাশে হংকং বা তাইওয়ান এবং মধ্যপ্রাচ্যে ইসরাইলকে শির উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকার সময় বন্ধুদের সাহায্য নিতে হয়েছে। বাংলাদেশকেও ভারতের পাশে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকার জন্য বন্ধুদের সাহায্য নিতে হবে। বাংলাদেশের বন্ধু হতে পারে কারা? আঞ্চলিক ও ভূমণ্ডলীয় রাজনৈতিক যোগ-বিয়োগই বলে দেবে যে কারা বাংলাদেশের বন্ধু হতে পারে। একটি কথা স্মরণ রাখা দরকার যে, আজ চীন ও ভারতের মধ্যে যারা সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের প্রবণতা দেখাচ্ছেন, সেটা হল ক্ষণস্থায়ী ব্যাপার এবং এই অঞ্চলে আমেরিকাকে ঠেকানোর জন্যেই চীন ভারত সম্পর্কের সাম্প্রতিক উন্নতি। আন্তর্জাতিক রাজনীতির চূড়ান্ত পরিণতি হিসেবে চীন, জাপান, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, অষ্ট্রেলিয়া, পাকিস্তান এবং মুসলিম জাহান বাংলাদেশের মিত্র হবে।

আমাদের আরেকটি নিকট প্রতিবেশী হল মায়ানমার (বার্মা)। যে কোন মূল্যে বার্মার সাথে আমাদের গভীর বন্ধুত্ব স্থাপন করতে হবে।

www.pathagar.com

সামরিক শক্তির প্রয়োজনীয়তা

পণ্ডিত নেহেরু, ভাবানি সেন গুপ্ত এবং সুব্রমনিয়ামের লেখা থেকে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, ভারত বাংলাদেশসহ ছোট রাষ্ট্রগুলোকে তার ফুট নোট বা পরিশিষ্ট হিসাবে দেখতে চাইবে। কিন্তু আমাদেরকে মাথা তুলে দাঁড়াতে হবে। সেটা করতে হলে বাংলাদেশকে হতে হবে আরেক ইসরাইল। আমাদের বন্ধুরা যেমন আমাদের প্রয়োজনে আসবে, তেমনি আমাদেরকেও তাদের প্রয়োজনে থাকতে হবে। এজন্য বাংলাদেশের প্রয়োজন একটি শক্তিশালী সামরিক বাহিনী। সম্ভাব্য বৈদেশিক আক্রমণের মুখে অন্তত তিন সপ্তাহ আমাদেরকে টিকে থাকতে হবে। এজন্য যতটুকু সামরিক শক্তির প্রয়োজন, ততখানি আমাদের নেই। আমরা অনেক পেছনে পড়ে আছি। প্রয়োজনীয় কাঙ্খিত সামরিক শক্তি অর্জনের ক্ষেত্রে আমাদেরকে পাড়ি দিতে হবে অনেক পথ। আত্ম তৃপ্তির কোন অবকাশ নাই। আমাদের অস্তিত্বের তাগিদে প্রয়োজন একটি শক্তিশালী দুর্ধর্ষ ও ক্ষিপ্রগতির সামরিক বাহিনী। এজন্য হাটতে হবে অনেক পথ। বিখ্যাত কবি রবার্ট ফ্রস্টের

Stopping by woods on a shocking evening এর চারটি লাইন দিয়ে এই নিবন্ধ শেষ করছি।

The woods are lovely dark and deep
But I have promises to keep
And miles to walk before I sleep
And miles to walk before I sleep.

www.pathagar.com

যদি ভারত বাংলাদেশের বিরুদ্ধে হামলা চালায়, তা'হলে...?

সামরিক ক্ষেত্রে পাকিস্তান ও ভারতের আণবিক শক্তি অর্জনের পর বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা নিয়েও ইদানীং জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী শিবিরে আলোচনা হচ্ছে। যারা কিছুটা খবরাখবর রাখেন তারা জানেন যে, বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কতখানি দুর্বল। আমাদের চারিধার পরিবেষ্টন করে আছে বিশাল ভারত। বর্তমানে বা ভবিষ্যতে বাংলাদেশের ওপর যদি কোন সামরিক হামলা পরিচালিত হয় তাহলে সেই হামলা আসবে ভারতের কাছ থেকে। তাই অনেকে এখন নিজেরা বলাবলি শুরু করেছেন যে, ভারত যদি বাংলাদেশ আক্রমণ করে তাহলে আমরা অর্থাৎ বাংলাদেশীরা নিজেদেরকে রক্ষা করবো কিভাবে? আদতেই কি আমাদের স্বাধীনতা রক্ষা করা সম্ভব? আমরা কি ভারতের সাথে পেরে উঠবো? এসব প্রশ্নের জবাবে বলা হচ্ছে যে সাদা চোখে দেখলে ভারতীয় সামরিক হামলা মোকাবিলা করার কোন ক্ষমতাই বাংলাদেশের নেই। তাই বলে কি আমরা হাল ছেড়ে দিয়ে বসে থাকবো? তাহলে তো আমাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের চিন্তা করা কল্পনাবিলাস মাত্র। এই ধরনের কুযুক্তির জাল বিছিয়ে একটি মহল মাঝে মাঝে হঠাৎ হঠাৎ বলে ফেলেন যে, বাংলাদেশের সাথে যদি কোন দিন কারো যুদ্ধ হয় তাহলে সেটা হবে ভারতের সাথে। কারণ একমাত্র ভারতেরই সুযোগ আছে বাংলাদেশকে আক্রমণ করার। ভারত যদি হামলা চালায় তাহলে ভারত মুহূর্তের মধ্যেই বাংলাদেশের শিল্প ও সামরিক অবকাঠামো ধ্বংস করে দেবে, অবরোধ সৃষ্টি করে বঙ্গোপসাগরকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। ফলে বাংলাদেশকে বাইরের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। তারা আরও বলেন যে, ভারতীয় হামলা হলে বাংলাদেশের জন্য প্রেরিত খাদ্য এবং তেলের সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাবে। এভাবে প্রথম পর্যায়ে বাংলাদেশের শিল্প-বাণিজ্য তথা অর্থনীতি ধ্বংস করে চূড়ান্ত পরিণামে ছত্রী সেনা এবং স্থল সেনা নামিয়ে বাংলাদেশকে দখল করে নেবে। এসব যুক্তি দেখিয়ে ঐ ✦ বলেন যে, নিদারুণ পরাজয় যেখানে অবধারিত সেখানে আমাদের বুদ্ধিমান নীতি গ্রহণ করা উচিত। এই বুদ্ধিমান নীতি হচ্ছে, আমরা এমন কিছুই করবো না যাতে করে ভারত বাংলাদেশকে আক্রমণ করার সুযোগ পায়। বলা বাহুল্য, এই নীতিটিই হলো আসলে ভারত তোষণ। ভারতকে খুশী রাখতে হলে ভারতের স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী স্বার্থ চরিতার্থ করতে হবে বাংলাদেশকে। সেটা করতে গেলে পশ্চিমবঙ্গ এবং উত্তরপূর্ব ভারতে গ্যাস সরবরাহের জন্য পাইপ লাইন স্থাপন, বাংলাদেশের কাঁচামালের ওপর ভারতের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা এবং ভারতীয় পণ্যে বাংলাদেশের বাজারকে সয়লাব করে দেয়ার সুযোগ দিতে

www.pathagar.com

হবে। ইসলামী ও জাতীয়তাবাদী শিবির মনে করেন যে, এসব পদক্ষেপ নেয়ার অর্থ হচ্ছে বাংলাদেশের অর্থনীতিকে ভারতের চরণে বিসর্জন দেয়া এবং চূড়ান্ত পরিণামে বাংলাদেশের স্বাধীনতাও ভারতের চরণে বিসর্জন দেয়া। তাদের বক্তব্য এই যে, আমেরিকা মহাপরাক্রমশালী হওয়া সত্ত্বেও ভিয়েতনাম দখলে রাখতে পারেনি এবং কিউবাকে বাগে আনতে পারেনি। পরাশক্তি হওয়া সত্ত্বেও রাশিয়া আফগানিস্তান দখল করে রাখতে পারেনি। ফ্রান্স আলজেরিয়া দখল করে রাখতে পারেনি। সুতরাং তারা যুক্তি দেন যে, বাংলাদেশকে এমন একটি নীতি অনুসরণ করতে হবে যার ফলে ভারত বাংলাদেশকে আক্রমণ করার দুঃসাহস করলে তাকে যেন অত্যন্ত চড়া মূল্য দিতে হয়। এটা করতে হলে বাংলাদেশকে পাকিস্তান এবং চীনের সাথে ঘনিষ্ঠতম সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। এছাড়াও মুসলিম জাহান এবং পশ্চিমা দুনিয়া ও আমেরিকার সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। ভারতপন্থীরা পাল্টা যুক্তি হিসেবে বলেন যে, বাংলাদেশের মতো একটি দেশের স্বাধীনতার প্রশ্নে গণচীনের ওপর ভরসা করা যায় না। কারণ এই দেশটি নির্ভরশীল এবং বিশ্বাসযোগ্য বন্ধু নয়। কিন্তু যারা কোরীয় যুদ্ধে চীনের বিশাল সৈন্য সমাবেশের কথা জানেন, কাম্পুচিয়ায় ভিয়েতনামের দুষ্কর্মের বিরুদ্ধে চীনের শাস্তি মূলক ব্যবস্থা সম্পর্কে যারা অবহিত, '৬২ সালের যুদ্ধে ভারতের নিদারুণ পরাজয় যারা দেখেছেন, তারা জানেন যে, চীনকে সবসময় হালকা করে দেখা চলে না। তাই যদি পারস্পরিক স্বার্থের ভিত্তিতে চীন ও বাংলাদেশের মধ্যে একটি মজবুত ও টেকসই সম্পর্ক গড়ে ওঠে তাহলে চরম বিপদের দিনে চীন বাংলাদেশকে পরিত্যাগ করবে এমন প্রচারণা ধোপে টেকে না।

বাংলাদেশের মতো ক্ষুদ্র দেশ ভারতের মতো একটি বিশাল আঞ্চলিক শক্তিকে কিভাবে মোকাবিলা করবে? এখানেই প্রয়োজন বুদ্ধির খেলার। বাংলাদেশের একজন পেশাদার কূটনীতিক, যিনি অনেক দেশে রাষ্ট্রদূতের দায়িত্ব পালন করেছেন, তিনি এ ব্যাপারে একটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, ছোটকে প্রথমেই খুঁজে দেখতে হবে যে বড়োর দুর্বল এবং স্পর্শকাতর স্থান কোনগুলো। আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে বিষয়টি বিবেচনা করা হয় এইভাবে যে, একটি বড় দেশের কৌশলগত স্বার্থ বা স্ট্র্যাটেজিক ইন্টারেস্ট কোন কোন স্থানে নিহিত রয়েছে। এভাবে ইন্ডিয়ার স্বার্থও বিচার করতে হবে। দেখা যাবে যে, শুধু বাংলাদেশেই ভারতের স্বার্থ নিহিত নেই, পাকিস্তান এবং চীনের কিয়দাংশেও তার স্বার্থ নিহিত রয়েছে। এছাড়া আমেরিকা এবং পশ্চিমা দুনিয়াতেও তার স্বার্থ রয়েছে। এই স্পর্শকাতর স্থানগুলোর সমর্থন যদি আদায় করা যায় তাহলে সেটা সম্ভাব্য ভারতীয় আক্রমণ পূর্বাহ্নেই রোধ করার জন্য রিমোট কন্ট্রোল হিসেবে কাজ করবে। একথা সত্য যে, সর্বাত্মক যুদ্ধে বাংলাদেশ ভারতকে পরাস্ত করতে পারবে না। কিন্তু একথাও সত্য যে, বাংলাদেশকে অন্তত এমন একটি প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে যার ফলে বাংলাদেশের যেন সর্বাত্মক

www.pathagar.com

পরাজয়ও না ঘটে। ইতিপূর্বে অনেকে বলেছেন যে, বাংলাদেশের সামরিক শক্তিকে এমন একটি পর্যায়ে আনতে হবে যার ফলে ভারত আক্রমণ করলে আমাদেরকে দু'একদিনের মধ্যে আত্মসমর্পন করতে না হয় এবং অন্তত বেশ কয়েকদিন যেন লড়ে যেতে পারি। এই পর্যায়ের শক্তি বাংলাদেশকে অর্জন করতেই হবে। বাংলাদেশের সামরিক বাহিনীর বর্তমান যে শক্তি সেটা এই পর্যায়ের জন্যও যথেষ্ট নয়। 'মিলিটারী ব্যালান্সের' ১৯৯৭ সাল সংখ্যায় (১৯৯৭ সাল পর্যন্ত সামরিক তথ্যাবলী সন্নিবেশিত) বাংলাদেশের সামরিক বাহিনীর শক্তি দেখানো হয়েছে এক লাখ ২১ হাজার। পক্ষান্তরে ভারতের সামরিক বাহিনীর সংখ্যা সাড়ে ১২ লাখ। বাংলাদেশের ট্যাংক ৮০-১০০। পক্ষান্তরে ভারতের ৩ সহস্রাধিক। বাংলাদেশের জঙ্গী বিমান ৫০-৫৫, পক্ষান্তরে ভারতের ৮শ'। সাবমেরিন, ডেস্ট্রয়ার, বিমানবাহী জাহাজ, আণবিক শক্তি চালিত সাবমেরিন ইত্যাদির কথা না-ই বা বললাম। ভারতের জনসংখ্যা বাংলাদেশের চেয়ে ৮গুণ বেশী। সেই হিসেবে বাংলাদেশের অন্তত দেড়শ'টি জঙ্গী বিমান থাকা উচিত, থাকা উচিত ৩/৪টি ডেস্ট্রয়ার এবং সমসংখ্যক সাবমেরিন। ভারতের সশস্ত্র বাহিনীর ৩টি সার্ভিসেই রয়েছে বিভিন্ন ধরনের ক্ষেপণাস্ত্র। দুঃখের বিষয়, সাড়ে ১২ কোটি লোকের দেশ হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশের কোন ক্ষেপণাস্ত্র নেই। কয়েকটা দিন ঠেকা দেয়ার জন্য বাংলাদেশ ও ভারতের সশস্ত্র বাহিনীর অনুপাত ১ঃ৫ হওয়া দরকার।

।। দুই ।।

একটি মহল প্রায়শই বলেন যে, যেহেতু প্রচলিত বা কনভেনশনাল মিলিটারী দিয়ে ভারতকে মোকাবিলা করা যাবে না তাই বাংলাদেশকে ভারতের মোকাবিলা করতে হবে গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে। এ জন্য বাংলাদেশকে বড় আকারের নিয়মিত বাহিনী গঠন না করে একটি বিশাল গেরিলা বাহিনী গড়ে তুলতে হবে। দেশের সক্ষম লোকদেরকে সংক্ষিপ্ত সামরিক ট্রেনিং দিতে হবে। এর ফলে আপদকালে বা যুদ্ধ লাগলে মুহূর্তের নোটিশে যেন কয়েক লাখ লোককে প্রতিরক্ষার কাজে লাগানো যায়। এ ধরনের যুক্তি যারা দেন তাদের আন্তরিকতায় আমরা সন্দেহ পোষণ করছি না। কিন্তু তাঁরা সমকালীন ইতিহাস এবং কঠোর সামরিক বাস্তবতা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধসহ এ ধরনের গেরিলা যুদ্ধের কথা যখন তখন বলা হয়। বলা হয় ভিয়েতনাম যুদ্ধের কথা। কিন্তু তারা এ সহজ সরল সত্যটি ভুলে যান যে ভিয়েতনামে আমেরিকা হামলা চালিয়েছিল হাজার হাজার মাইল দূর থেকে এসে। আর ভিয়েতকং বা ভিয়েতনামী মুক্তিবাহিনীকে ট্রেনিং এবং অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে প্রকাশ্যে এবং সরাসরি সাহায্য করেছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং চীন। ভিয়েতনাম, লাওস, কম্বোডিয়া প্রভৃতি অশান্ত অঞ্চল চীনের লাগোয়া ছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নও খুব বেশী দূরে নয়। সে তুলনায় আমেরিকা ছিল হাজার হাজার মাইল দূরে। উত্তর কোরিয়া থেকে স্রোতের মতো অস্ত্র

www.pathagar.com

এসেছে। আজ ভিয়েতনামের সামরিক বাহিনী যেরূপ শক্তিশালী তার অংকুর ঐ মুক্তি সংগ্রামের সময়ই বপন করা হয়েছিল। আফগানিস্তানের স্বাধীনতা যুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের সরাসরি আগ্রাসনের মুখে পাকিস্তান এবং ইরান আফগান মুজাহিদীনগণকে প্রত্যক্ষ মদদ দিয়েছে। আমেরিকাও আফগানিস্তানের মুক্তি সংগ্রামে বিপুল পরিমাণে অস্ত্র সরবরাহ করেছে এবং অর্থনৈতিক সাহায্য দিয়েছে। আমাদের বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধেও ভারত অস্ত্র সরবরাহ করেছে। তারপরেও অর্থাৎ ৯ মাসের মাথায় অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ও দুর্বল পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধ করে পাকিস্তানকে পরাজিত করেছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, গেরিলা যুদ্ধ করলেও প্রয়োজন হয় একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রের সক্রিয় সমর্থন। ভারত মুক্তিযোদ্ধাদেরকে শুধু ট্রেনিং ও অস্ত্রশস্ত্রই দেয়নি, ভারতের মাটি ছিল তাদের জন্য নিরাপদ আশ্রয়। অস্ত্র সরবরাহের স্থায়ী উৎস, বিপদকালে নিরাপদ আশ্রয় এবং চরম বিপদের মুহূর্তে সরাসরি হস্তক্ষেপের ভরসা না থাকলে গেরিলাযুদ্ধ সফল হয় না। তার জ্বলন্ত প্রমাণ কাশ্মীর, পূর্ব পাঞ্জাব এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের ৭টি রাজ্যের স্বাধীনতা সংগ্রাম। কাশ্মীরের ১০০ ভাগ মুসলমানই ভারত ভেঙ্গে কাশ্মীরকে পাকিস্তানভুক্ত অথবা স্বাধীন করতে চায়। এ পর্যন্ত ৩০ হাজার কাশ্মীরী স্বাধীনতা সংগ্রামে শাহাদত বরণ করেছেন। ৫০ বছর হলো কাশ্মীরে মুক্তিযুদ্ধ চলছে। কিন্তু কাশ্মীরের বুক থেকে ভারতীয় হানাদার বাহিনীর জগদ্দল পাথর অপসারণ করা সম্ভব হয়নি। একসময় সমস্ত শিখ সম্প্রদায় খালিস্তানের স্বাধীনতা চেয়েছেন। কিন্তু স্বর্ণমন্দিরে শত শত বীর শিখকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করার পরেও খালিস্তানের স্বাধীনতা এখনও সুদূর পরাহতই মনে হয়। নাগা, মিজো এবং আসামের স্বাধীনতা সংগ্রামকে বর্বর সামরিক শক্তির জোরে স্তব্ধ করে দেয়া হচ্ছে। এই সমস্ত রাজ্যেই স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী গেরিলা যুদ্ধ ফলবতী হচ্ছে না একটি শক্তিশালী দেশের প্রত্যক্ষ সমর্থনের অভাবে। উত্তর-পূর্ব ভারতে গণচীন হাত গুটিয়ে বসে আছে। কাশ্মীরে পাকিস্তান নৈতিক সমর্থন জোগালেও ভারতের তুলনায় পাকিস্তান ছোট এবং দুর্বল। এমনকি বাংলাদেশেও '৭১ সালে ভারতকে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে টোটাল ওয়ার করতে হয়েছে। আজ যদি কাশ্মীরীদের পেছনে প্রত্যক্ষ ও সক্রিয় চীনা সমর্থন থাকত এবং বাংলাদেশ যুদ্ধের মত চীন প্রয়োজনে ভারতের বিরুদ্ধে টোটাল ওয়ার করত তাহলে এতদিনে ভারত ভেঙ্গে খান খান হয়ে যেত।

এই কঠোর সামরিক বাস্তবতা আমাদেরকে মনে রাখতে হবে। ভারতীয় হামলার মুখে বাংলাদেশ যদি আত্মরক্ষার জন্য গেরিলা যুদ্ধ করে তাহলে বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা হবে অস্ত্র সমস্যা। আরেকটি প্রধান সমস্যা হবে স্যাংচুয়ারী বা নিরাপদ আশ্রয়ের সমস্যা। উলফা নেতা অনুপ চেটিয়াকে বাংলাদেশের জেলখানায় বন্দী জীবন কাটাতে হচ্ছে। কারণ বাংলাদেশ সরকার আসামের স্বাধীনতা সংগ্রাম তো সমর্থন করছেই না,

www.pathagar.com

উপরন্তু আসামের মুক্তিযোদ্ধাদেরকে ধরে ধরে দখলদার ভারতীয় বাহিনীর হাতে তুলে দিচ্ছে। অথচ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারত তো অনুপ চেটিয়াদের মত আমাদেরকে গ্রেফতার করেনি।

বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ভারতীয় আক্রমণের মুখে গেরিলা যুদ্ধ সফল হবে না। কারণ বাংলাদেশী গেরিলাদের থাকবে না কোনো স্যাংচুয়ারী। ভারতীয় সৈন্যদের চিরুনী অভিযানে তাড়িত হয়ে বাংলাদেশী মুক্তিসেনার জন্য বঙ্গোপসাগরের অথৈ জলরাশিতে ঝাঁপ দেয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না। এই পটভূমিতে ভারতীয় আক্রমণের মোকাবিলা করার জন্য বাংলাদেশকে যুগপৎ নিম্নোক্ত ত্রিমুখী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১। অন্তত দুই লাখ নিয়মিত সৈন্য, ২০০ জঙ্গী বিমান, ৮০০ ট্যাঙ্ক, ৩টি সাবমেরিন ও ৪টি ডেস্ট্রয়ার সম্বলিত নিয়মিত সামরিক বাহিনী গঠন।

২। ভারতীয় হামলার মুখে Diversionary deployment - এর জন্য চীন, পাকিস্তান, মুসলিম জাহান ও আমেরিকার সাথে ঘনিষ্ঠতম সম্পর্ক স্থাপন।

৩। নিয়মিত বাহিনীর পাশাপাশি জনযুদ্ধ চালানোর জন্য অন্তত ৪ লাখ মিলিশিয়ার একটা বাহিনী গঠন করতে হবে। এই ত্রিমুখী ব্যবস্থার কোনো বিকল্প নেই।

সূত্র ঃ দৈনিক সংগ্রাম ৯-৭-৯৮

www.pathagar.com

বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা ঃ ভারতীয় জুজু ঃ কিউবা ও তাইওয়ানের শিক্ষা

নতুন সহস্রাব্দ এবং নতুন শতাব্দীর স্বাধীনতা দিবসে দাঁড়িয়ে আমরা অনেক নতুন প্রশ্নের সম্মুখীন হচ্ছি। শুনতে পাচ্ছি অনেক নতুন নতুন থিওরী। প্রতিবছর যখন জাতীয় বাজেট পেশ করা হয় তখন শোনা যায় একটি বিশেষ ধরণের কণ্ঠ। যে দেশের জনসংখ্যা ১২ কোটি ৮০ লাখ সেই দেশের প্রতিরক্ষা বাজেট ৩ হাজার কোটি টাকারও কম। মার্কিন ডলারের বিনিময় হার অনুযায়ী ১ বিলিয়ন ডলারেরও অনেক কম। প্রতিবেশী ভারতের জনসংখ্যা ১০০ কোটি। ভারত এবার তার প্রতিরক্ষা বাজেট বাড়িয়েছে বাংলাদেশী মুদ্রায় ১৫ হাজার কোটি টাকা। এই অর্থবছরে প্রতিরক্ষা খাতে ভারত বরাদ্দ করলো ৬১ হাজার কোটি টাকা। এর পাশাপাশি বাংলাদেশ যখন ৩ হাজার কোটি টাকার প্রতিরক্ষা বাজেট পেশ করে তখন প্রগতির ভেকধারী ঐ মহলটি হৈ চৈ বাধিয়ে দেন। চিৎকার করে বলেন, আমাদের ডিফেন্স বাজেট নাকি অনেক বড়। আমাদের ডিফেন্স বাজেট থেকে টাকা কেটে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অন্যান্য সামাজিক খাতে সেই অর্থ বরাদ্দ করা হোক। এদের কাছে বলা হয় যে, ভারতের জনসংখ্যা বাংলাদেশের চেয়ে সাড়ে ৭ গুণ বেশী। তাহলে তাদের প্রতিরক্ষা বাজেট বাংলাদেশের ডিফেন্স বাজেটের চেয়ে ২০ গুণ বেশী হবে কেন, এ প্রশ্নে তারা নীরব থাকেন। এবার ভারতের ডিফেন্স বাজেট বিগত ৫৩ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ হয়েছে। অথচ এ ব্যাপারে বাংলাদেশের সেই পরিচিত মহলটি রহস্যময় নীরবতা পালন করছেন। সঙ্গতভাবেই বল হয় যে, ভারত দিনের পর দিন তার সমরশক্তি এবং সামরিক ব্যয় বাড়িয়েই চলেছে। সেখানে বাংলাদেশের মিনিমাম ডিফেন্স থাকবে না কেন? সেই নিম্নতম সামরিক শক্তি বজায় রাখতে হলে বাংলাদেশের বর্তমান সামরিক বাজেট অপ্রতুল। এই যুক্তি উপস্থাপিত হলে ওরা স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করে। তারা বলে যে, আমাদের প্রতিরক্ষা ভাবনার সময় ভারতকে কোন ফ্যাক্টর হিসাবে বিবেচনা করা উচিত নয়। যখন বলা হয় যে, ভারতের আধিপত্যবাদী এবং আগ্রাসী মনোভাবের মুখে আমাদেরকে তো কিছুদিন টিকে থাকতে হবে। এই কথায় পাল্টা ওরা বলেন যে, বাংলাদেশের ডিফেন্স থাকা না থাকাতে কিছু এসে যায় না। কারণ ভারতের সাথে পাল্লা দেয়া সম্ভব নয়। এছাড়া ভারতের সাথে শত্রুতা করে বাংলাদেশ টিকে থাকতে পারবে না। এ ধরনের কথা যখন ওরা বলেন তখন অনেক সরল প্রাণ সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত হন। তারা তখন সরল মনে বলেন যে, ইন্ডিয়া বাংলাদেশের চেয়ে আয়তনে অনেক অনেক বড়। ইন্ডিয়ার জনসংখ্যাও বাংলাদেশের চেয়ে অনেক অনেক বিশাল। ইন্ডিয়ার সামরিক বাহিনীও

www.pathagar.com

বাংলাদেশের চেয়ে বহু বড়। তাদের সাথে শত্রুতা করে টিকে থাকা সত্যিই বড় কঠিন। এ ধরনের যুক্তির পর ভাবতে হয় যে, আমাদের স্বাধীনতা কি অনেক ভঙ্গুর? যে স্বাধীনতা বৃহৎ প্রতিবেশীর দয়ার ওপর নির্ভরশীল সে স্বাধীনতা তো কোনদিন মজবুত হতে পারে না। এ ধরনের যুক্তি যদি সঠিক হতো তাহলে কোন কথা ছিল না। কিন্তু এটা যুক্তি নয়, এটা কুযুক্তি। এটা একটি জটিল সমস্যার অতিমাত্রিক সরলীকরণ।

একটি দেশের স্বাধীন সার্বভৌম অস্তিত্ব তার অন্য সব ইস্যুর উর্ধ্বে। এই ইস্যুতে আপস বা শৈথিল্যের কোন সুযোগ নেই। যারা ওসব কুযুক্তি দেন তারা জনগণের কাছে প্রকৃত তথ্য এবং চিত্র তুলে ধরেন না। যদি তুলে ধরতেন তাহলে বরং অন্যরকম দাবী উঠতো। আওয়াজ উঠতো বাংলাদেশের সামরিক বাজেট বাড়াও।

তাইওয়ান ঃ গণচীনের বিশাল ছায়ার নীচে

মানুষ জেনে অবাক হবেন যে, পৃথিবীতে একটি নয়, দুটি নয়, বেশ কয়েকটি দেশ রয়েছে বাংলাদেশের চেয়ে অনেকগুন ছোট এবং জনসংখ্যা ক্ষেত্র বিশেষে বাংলাদেশের ১৩ ভাগের এক ভাগেরও কম। এমনি একটি দেশ হলো তাইওয়ান। ১৯৪৯ সালে চীনে কমিউনিস্ট বিপ্লব সংঘটিত হলে বিশাল মহাচীন কমিউনিস্ট রাজ্যের অধীনে চলে আসে। কিন্তু ফরমোজা নামে একটি ছোট্ট প্রদেশ কমিউনিস্ট শাসন মানতে অস্বীকার করে। ফরমোজার তৎকালীন শাসক ছিলেন চিয়াং কাইশেক। চিয়াং কাইশেকের নেতৃত্বে ফরমোজার জনগণ নিজেদেরকে প্রকৃত চীন হিসাবে ঘোষণা করে। সবচেয়ে অবাক ব্যাপার হলো এই যে, ফরমোজার জনগণও চিয়াং কাইশেকের নেতৃত্বের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানায়। সেই ফরমোজাই হলো আজকের তাইওয়ান। পূর্ব এশিয়ায় জাপানের পর তাইওয়ান এক প্রবল অর্থনৈতিক পরাশক্তি। এই দেশটির আয়তন মাত্র ১৪ হাজার বর্গমাইল। জনসংখ্যা ২ কোটি ২৫ হাজার। গণচীন কোন সময়ই সাবেক ফরমোজা এবং বর্তমান তাইওয়ানকে স্বাধীন দেশ বা স্বতন্ত্র সত্তা হিসাবে স্বীকার করেনি। সুতরাং বিগত ৫১ বছর ধরেই তাইওয়ান মহাচীনের হুমকির নীচে বসবাস করে আসছে। গণচীন সব সময়ই বলে আসছে যে, তাইওয়ান গণচীনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাইওয়ানের স্বতন্ত্র সত্তাকে তারা স্বীকার করেনা। বিগত ৫১ বছর ধরে তাইওয়ানের মাথার ওপরে ঝুলছে ডেমোক্রেসির তলোয়ার। সেই তলোয়ার হলো সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে তাইওয়ানকে চীনের অঙ্গীভূত করা। বিগত ৫১ বছর হলো তাইওয়ান গণচীনের উদ্যত খরগের নীচে বাস করছে। গণচীনের আয়তন ৩৮ লক্ষ বর্গমাইল। অর্থাৎ তাইওয়ানের চেয়ে চীন ২৭১ গুণ বড়। অনুরূপভাবে চীনের জনসংখ্যা তাইওয়ানের জনসংখ্যার চেয়ে ৩৫০ গুণ বেশী। আসলে এদের অবস্থান হলো হিমালয়ের পাদদেশে ইঁদুরের বাস। তারপরও কিন্তু তাইওয়ান তার স্বাধীন সত্তার দাবী ছাড়েনি। এজন্য তাইওয়ানের কোন মানুষ কিন্তু একথা বলেনি যে, চীনের কথা না শুনে আমরা বাঁচতে পারব না। বরং চীনের সাথে সমান্তরাল অবস্থান গ্রহণ করেও তাইওয়ান টিকে আছে এবং বিশ্বের বুকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। অথচ বাংলাদেশ আয়তনে তাইওয়ানের চেয়ে ৪ গুণ বড়। বাংলাদেশের জনসংখ্যা তাইওয়ানের চেয়ে ৬ গুণ

www.pathagar.com

বেশী। অন্যদিকে প্রতিবেশী ভারত আয়তনে চীনের ৩ ভাগের এক ভাগ। ভারতের সমরশক্তিও চীনের ৩ ভাগের এক ভাগ। তাইওয়ান লিলিপুট হওয়া সত্ত্বেও সোয়া ৩ লক্ষ সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী গড়ে তুলেছে। তাদের অস্ত্রভাণ্ডারে রয়েছে ১৮টি ডেস্ট্রয়ার, ৪টি সাবমেরিন এবং ৪২৫টি জঙ্গী বিমান। চলতি মার্চ মাসে তাইওয়ান তাদের নতুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করেছে। তারা ভোট দিয়েছে এমন এক ব্যক্তিকে যিনি তাইওয়ানের স্বাধীনতার আওয়াজ তুলে ক্ষমতায় এসেছেন। তাকে ভোট দেয়ার সময় তাইওয়ানের জনগণ একথা ভাবেননি যে, চীনের সাথে বিবাদ করে তারা বাঁচতে পারবেন কিনা। তাইওয়ান বেঁচে আছে এবং মাথা উঁচু করেই বেঁচে আছে।

কিউবা ঃ মার্কিন পারমাণবিক হুমকির নীচে

আরেকটি দেশ হলো কিউবা। ল্যাটিন আমেরিকার এই দেশটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একেবারে পায়ের গোড়ালির কাছে অবস্থিত। আয়তন ৪২ হাজার ৮০৪ বর্গমাইল। জনসংখ্যা ১ কোটি ২০ লাখ। কমিউনিস্ট বিপ্লবের পর থেকে এদেশটির একচ্ছত্র নেতা হলেন ফিডেল ক্যাস্ট্রো। ল্যাটিন আমেরিকার অনেক দেশ পরাশক্তি আমেরিকার পায়রবি করেছে। কিন্তু কিউবা আমেরিকার দানবীয় শক্তির মুখেও মার্কিন বশ্যতা স্বীকার করেনি। ৬০-এর দশকের প্রথম ভাগে এই কিউবাকে নিয়েই শুরু হতে যাচ্ছিল তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ। যেখানে রাশিয়া এবং আমেরিকা ভয়াবহ আণবিক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার উপক্রম হয়েছিল। সেই মহাসংকটের নাম ছিল পিক উপসাগরীয় সংকট। প্রেসিডেন্ট কেনেডীর আমলে আমেরিকা ফিডেল ক্যাস্ট্রোকে হুমকি দিয়েছিলেন যে, ৪৮ ঘন্টার মধ্যে কিউবা থেকে বিদেশী স্থাপনাসমূহ সরিয়ে ফেলতে হবে। অন্যথায় মিলিটারী এ্যাকশন। ফিডেল ক্যাস্ট্রো মার্কিন চরমপত্র অগ্রাহ্য করে ছিলেন। তারপরও তিনি বেঁচে আছেন এবং কিউবা তার স্বাধীন সত্তা নিয়ে বেঁচে আছে।

আরো নজির আছে। সেগুলো উল্লেখ করলাম না। তবে তাইওয়ান ও কিউবার নজিরই যথেষ্ট। বাংলাদেশের যে মহলটি কথায় কথায় ভারতীয় জুজুর ভয় দেখান তারা একবার কিউবা ও তাইওয়ানের দিকে তাকিয়ে দেখুন। যদি সুনির্দিষ্ট মতলব নিয়ে ওরা এ্যান্টি মিলিটারী প্রচারণা চালিয়ে না থাকেন তাহলে এসব উদাহরণ ওদের চোখের ওপর থেকে অজ্ঞানতার ছানি অপসারণে সাহায্য করবে।

সূত্র ঃ দৈনিক ইনকিলাব ২৬-৩-২০০০

www.pathagar.com

বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা ঃ গোল টেবিল বৈঠকে লেখকের বক্তব্য

[জাতীয় প্রেস ক্লাবে দৈনিক ইনকিলাবের উদ্যোগে বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা সম্পর্কে একটি গোল টেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। দেশের খ্যাতনামা সিনিয়র মিলিটারী অফিসার, (প্রাক্তন) সচিব পর্যায়ের অফিসার, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, পলিটিশিয়ান প্রমুখ ছিলেন সম্মানিত আলোচক। আমিও ছিলাম এই বৈঠকের অন্যতম আলোচক। –লেখক]

আসলে আমরা কোন্ ডিফেন্স থিওরিতে বিশ্বাস করি, তা অনেকেই জানেন, বিশেষ করে এখানে এই মুহূর্তে যারা উপস্থিত আছেন। এখানে বেশ কয়েকজন ছিলেন, যারা মনে করেন, বাংলাদেশে সামরিক বাহিনীর প্রয়োজন নেই, থাকলেও নেপালের মতো, যারা মনে করেন মিলিটারী এলোকেশন বেশী হচ্ছে, যারা মনে করেন, মিলিটারীর প্রেজেন্ট ষ্ট্রেন্থ বেশী আছে, কমানো উচিত– তাদের জন্য আমি কিছু স্ট্যাটিসটিক্স নিয়ে এসেছিলাম। তারা কেউ নেই। আমি কি বলবো, ঠিক বুঝতে পারছি না। প্রথম কথা হলো ইন্ডিয়া, পাকিস্তান, বাংলাদেশ এই তিনটা দেশের মধ্যে আমরা একটা হতভাগ্য দুর্ভাগা জাতি এই অর্থে যে, কে আমাদের শত্রু আর কে আমাদের বন্ধু, সেটা আমরা এই আটাশ বছরেও চিহ্নিত করতে পারিনি। অথচ ইন্ডিয়াতে, হোয়েদার ইট ইজ বিজেপি গভর্নমেন্ট, হোয়েদার ইট ইজ যুক্তফ্রন্ট গভর্নমেন্ট, হোয়েদার ইট ইজ কংগ্রেস গভর্নমেন্ট, এটিচুড টুওয়ার্ডস পাকিস্তান, এটিচুড টুওয়ার্ডস চায়না- এ ব্যাপারে তাদের ভেতরে বিন্দুমাত্র দ্বিমত থাকে না। লাইক ওয়াইজ, পাকিস্তানেও। সেখানে মুসলিম লীগ আসুক, পিপিপি আসুক বা জিয়াউল হক আসুক, যেই আসুক, কিংবা জুলফিকার আলী, ভুট্টো (হু ইজ দ্যা আর্কিটেক্ট অব প্রেজেন্ট নিউক্লিয়ার বোম্ব)-ইন্ডিয়ার ব্যাপারে, চায়নার ব্যাপারে তাদের দৃষ্টিভঙ্গির কোনো তফাত নেই। আমাদের এখানে আবার বলা হয় যে, অনেকটা ক্রিকেটের মতো, একটা রান নেয়ার পর দু'ব্যাটসম্যান তাদের অবস্থান বদল করে। তেমনি আমাদের গভর্নমেন্ট যখন বদল হয়, তখন শত্রু আর মিত্র এই দু'জনের উইকেট বদল হয়ে যায়। আমেরিকায়ও দেখেন, বুশ আসুক, আর ক্লিনটন আসুক, ওভারঅল গ্লোবাল স্ট্র্যাটেজি, ইট ইজ অলওয়েজ ডিটারমিনড্ বাই আমেরিকান এনলাইটেনড্ সেলফ ইন্টারেস্ট। এখন আমাদের এখানে কিভাবে একটি দল বা একটি মহল শত্রু-মিত্র চিহ্নিত করে? কিছু হলেই স্বাধীনতার শত্রু। স্বাধীনতার স্বপক্ষ-বিপক্ষ

www.pathagar.com

শক্তি। কে স্বাধীনতার স্বপক্ষ শক্তি হতে পারে বাংলাদেশে? আর কে বিপক্ষ শক্তি? একটি পত্রিকায় বছর দেড়েক আগে পড়েছিলাম, পেশোয়ারের একটি সাপ্তাহিক উর্দু পত্রিকাতে বাংলাদেশ সম্পর্কে নাকি একটি কমেন্ট করা হয়েছিল। তো এদেশে এই পত্রিকাটি তোলপাড় করলো বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রতি হুমকিস্বরূপ। অতএব প্রতিবাদ। আরে পেশোয়ারের কাগজ সাপ্তাহিক, এবং উর্দু। আমরা কেউ পড়িনি। ওরাই জানিয়ে দিলো, যারা লিখেছে। কিন্তু লালকৃষ্ণ আদবানী যখন কনফেডারেশন করার ওপেন ডিক্লারেশন দিলেন, একটি প্রতিবাদ এদেশ থেকে উত্থিত হলো না। সুতরাং আমরা শত্রু-মিত্র ঐভাবে চিহ্নিত করি। স্পষ্ট করে বলি, গোলাম আযম সাহেবকে তো রাজাকার শিরোমণি বলা হয়, কালকে যদি তাকে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী, প্রেসিডেন্ট, সরকার প্রধান বানানো হয়, তাহলে তিনি কি চাইলেও এদেশকে আর পাকিস্তান বানাতে পারবেন? পারবেন না। সুতরাং পাকিস্তান এই মুহূর্তে আমাদের শত্রু যদি হতেও চায়, তার পক্ষে তা হওয়া সম্ভব নয়। দেড় হাজার মাইল দূর থেকে আসতে হলে তাকে ইন্ডিয়াকে ওভারফ্লাই করে আসতে হবে। অতএব কারা আমাদের শত্রু হতে পারে? হতে পারে তারাই, চারধারে ১৭শ মাইল যারা ঘিরে আছে। শুধু ঐ ১৭শ' মাইলই নয়। পানিতে যে এক হাজার মাইল সেখানেও তারাই। তারাই ওটা কন্ট্রোল করে। কারণ হাতে রয়েছে দুটি এয়ারক্রাফট কেরিয়ার। এখন ইয়েলৎসিন তাদেরকে একটা নিউক্লিয়ার পাওয়ার্ড এয়ারক্র্যাফ্ট কেরিয়ার দেবেন বলে কথাবার্তা চলছে। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি, নিচে এক হাজার মাইল, চারধারে ১৭শ' মাইল। মাত্র ১৭০ মাইল বার্মা বর্ডারটা ছাড়া চারদিকে শুধু তারাই ঘিরে আছে। সুতরাং এদেশের জন্য নিরাপত্তার হুমকি যদি কেউ হতে পারে তাহলে ইট ইজ ইন্ডিয়া। ভারতবিরোধী হওয়ার প্রয়োজন নেই। দিস ইজ দ্যা স্টার্ক রিয়েলিটি অব জিওগ্রাফি। এই দেশে বসে যারা মনে করে ঐ তসলিমা নাসরিনের মতো লেজওয়ালা ঘুড়ি নাকি বাংলাদেশ। যারা সাতচল্লিশের পার্টিশন মানেন না। এদের অনুসারী যারা, তারা। যারা এদেশকে আবার অখণ্ড ভারতে ফেরত নিতে চায়। সুতরাং আজকের এই গোলটেবিল বৈঠকে আমার বিনীত নিবেদন, স্বাধীনতার স্বপক্ষ-বিপক্ষ শক্তি সম্পূর্ণ নতুনভাবে নির্ধারিত হোক। যারা প্রোইন্ডিয়ান, যারা বাংলাদেশকে ইন্ডিয়ার সাথে লীন না করে দিলেও ফেডারেশন করতে চায়, এবং তাদের যারা মিত্র, এদেশে তারাই হলো স্বাধীনতার বিপক্ষ শক্তি। আর যারা ইন্ডিয়াকে মোকাবিলা করতে চায়, তারাই এদেশে স্বাধীনতার স্বপক্ষ শক্তি। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, ইন্ডিয়া কেন আমাদের মুক্তিযুদ্ধে সাহায্য করেছিলো? আমিও খুব স্পষ্টভাবে বলতে চাই, ইন্ডিয়ার যেসব মোটিভ ছিলো তার মধ্যে একটি হলো পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলকে বিচ্ছিন্ন করে তাকে দুর্বল করা। তারপর স্বাধীন বাংলাদেশে একটি পুতুল সরকার কায়েম করা। ফিফটিনথ অগাস্টের

www.pathagar.com

পর এনায়েতউল্লাহ খান লিখেছিলেন, 'বাংলাদেশ উইনস ফ্রিডম'। তো সেই পুতুল সরকারের সহায়তায় ইন্ডিয়ার উত্তর-পূর্বাঞ্চলে স্বাধীনতা সংগ্রাম দমন করার উদ্দেশ্য ছিলো। আর পশ্চিমবঙ্গ থেকে পূর্ব ভারতে যাওয়ার জন্য বাংলাদেশের মধ্যদিয়ে করিডোর আদায় করা, চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহার করা, বাংলাদেশের গ্যাস ব্যবহার করা। এসব উদ্দেশ্যে উপাঞ্চল গঠন ও ট্রানজিট আদায় করা। তারপর কী করবে তারা? বাংলাদেশ ও উত্তর-পূর্ব ভারতকে করতলগত করে চীনকে মোকাবিলার প্রস্তুতি নেবে। এভাবে বাংলাদেশের অর্থনীতি, প্রতিরক্ষা, সংস্কৃতি এবং ভূগোলকে ভারতের পরিপূরক করা সিক্সটিনথ অব ডিসেম্বর যখন এখান থেকে খবর গেলো জেনারেল নিয়াজী সারেন্ডার করছেন তখন ইন্ডিয়ান পার্লামেন্টে মিসেস গান্ধী বললেন যে, দুটো উদ্দেশ্য ছিলো, তা সফল হলো। একটা হলো, আজ থেকে দ্বিজাতিতত্ত্ব শেষ হয়ে গেলো। আরেকটি হলো, এটা প্রমাণ হয়ে গেলো যে, বাংলাদেশ এবং ইন্ডিয়া ইকোনমিক্যালি কমপ্লিমেন্টারি। তারপর চীনকে তারা মোকাবিলা করবে, কারণ চীনকে তারা প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে। লক্ষ্য করুন, জর্জ ফার্নান্ডেজ ইন্ডিয়ান ডিফেন্স মিনিস্টার। একসময় শুনতাম সোসালিষ্ট মুভমেন্ট করেন। তিনিও কিন্তু সেদিন বললেন, 'আমরা যে নিউক্লিয়ার বোমাটা ফাটালাম এইটা পাকিস্তানের দিকে নয়, চায়নার উদ্দেশ্যে। কারণ চায়না আমাদের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী।' এই আকাংক্ষা পূরণের জন্য ভারত বাংলাদেশকে শোষণ ও লুণ্ঠন করছে। কিন্তু তারা বাংলাদেশে কোনো শিল্প স্থাপন করেনি। ট্রেডের নামে, বাণিজ্যের নামে লুণ্ঠন করছে। আমাদের কোনো মিলিটারী বিল্ডআপ করতে দেয়নি। অথচ আমরা ভারতের এজেন্ট হিসেবে কোনো মিলিটারী বিল্ডআপ করিনি। শেখ হাসিনা বারবার ক্যান্টনমেন্টে গিয়ে বলেন, মিলিটারীকে বিতর্কের উর্ধ্বে রাখো। জেনারেল মাহবুব, আপনি যে কথাগুলো বলতে পারেননি, আমি সেই কথাগুলো বলছি। আমার তো রেস্ট্রিকশন নেই। তো শেখ হাসিনা এই কথা বলার পরেই বেগম জিয়া ও জিয়াউর রহমানের চৌদ্দগোষ্ঠী নাশ করবেন, ঐ ইউনিফর্ম পরা সোলজারদের সামনে।

শেখ হাসিনা একটি কথা বলেন, তার পিতা শেখ মুজিবুর রহমান নাকি বাংলাদেশে আধুনিক সামরিক বাহিনী গড়ার স্বপ্ন দেখতেন। তিনি নাকি ষ্ট্রং মিলিটারী গড়ার চেষ্টা করেছিলেন। আসুন, শেখ মুজিবুর রহমান সাহেব বাহাত্তর থেকে পঁচাত্তরে বাংলাদেশে মিলিটারী বিল্ডআপ কেমন করেছিলেন সেটা দেখা যাক। সেটা আমার বক্তব্য নয়, সিপরি ইয়ার বুক, নাইনটিন নাইনটি পেজ ১৪৮-১৪৯ Arms transfer to the third world statistics 75-85। শেখ মুজিবুর রহমানের সময়ে সেখানে দেখা যাচ্ছে যে, তাঁর সময়ে শেখ মুজিবুর রহমান কোনো জঙ্গী বিমান বা ফ্রিগেটের অর্ডার দেননি। ইন্ডিয়া থেকে দিয়েছিলেন হালকা অস্ত্রের এবং ট্রান্সপোর্ট প্লেনের, আর মাত্র ১৫টি টি-৫৪ ট্যাংকের। পক্ষান্তরে যুদ্ধের পর পাকিস্তানের পরিত্যক্ত ৮৪টি ট্যাংক নিয়ে

www.pathagar.com

যায় ভারতীয় বাহিনী। এই তথ্য জনাব অলি আহাদ তার 'জাতীয় রাজনীতি' নামক বইয়ে দিয়েছেন। মিলিটারী ব্যালান্স ৭৫-৭৬ অনুযায়ী বাংলাদেশের সামরিক শক্তি ১৯৭৫ সালে ছিলো সৈন্য সংখ্যা ৩০ হাজার, রক্ষীবাহিনী ২৫ হাজার, ট্যাংক ৩০টি, ফ্রিগেট নাই, সাবমেরিন নাই, জঙ্গী বিমান রাশিয়া থেকে আনা হয়েছিলো ১২টি আর ২টা স্যাবর-এফ ৮৬-কে মেরামত করে তোলা হয়েছিল। সেদিনের সেনাবাহিনীর ভেতরেও বিভেদের বীজ বপণ করা হয়েছিলো। সারা জাতির ভেতরেই বপণ করা হয়েছিলো এই বীজ। পাকিস্তান থেকে ২৬ অথবা ২৮ হাজার সোলজার ফিরে আসলো। তখন মুক্তিযোদ্ধা ভার্সাস রিপাট্রিয়েট। এই একটা বিভেদের বীজ তারা সৃষ্টি করলো। অর্থাৎ সারা দেশটাকে Including the Armed Forces of the country -তেও বিভেদ সৃষ্টি করা হলো। এছাড়া মিলিটারী ভার্সাস রক্ষীবাহিনী গড়ে তোলা হলো। এতো তখনকার ব্যাপার। এখনকার অবস্থা কি? এখন বাংলাদেশে মিলিটারীর অবস্থান কী? আমি একটু আগে যেটা বললাম, সেখান থেকে এখনকার অবস্থা দেখুন। মিলিটারী ব্যালান্স ৯৮-৯৯, পেজ ৭৪-৯৯। বাংলাদেশ পোর্শনে আছে, আমাদের সামরিক বাহিনীর সদস্য সংখ্যা এগেনইন, উইথ এপোলোজি টু জেনারেল মাহবুব, আমি যা বলছি, ইন্সটিটিউট অব স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ থেকে 'মিলিটারী ব্যালান্সকে' কোট করছি। সামরিক বাহিনীর সদস্য সংখ্যা ১ লাখ ২১ হাজার, এর মধ্যে সেনাবাহিনী ১ লাখ ১ হাজার। নৌবাহিনী ১০ হাজার ৫শ'। বিমানবাহিনী ৯ হাজার ৫শ'। ট্যাংক ৮০টি টি-৫৯। ৭টি টি-৫৪/৫৫। নৌবাহিনীতে সাবমেরিন নাই। ডেস্ট্রয়ার নাই। ফ্রিগেট ৪টি। পেট্রোল এন্ড কোস্টাল কমব্যাটান্ট, ছোট ছোট জাহাজ ৪১টি। বিমানবাহিনীতে জঙ্গী বিমান ৪৯টি। এর মধ্যে ১৮টি চীনা এফ-৭। এটি রাশিয়ান মিগ– ২১ এর চায়নিজ ভার্সান। শেখ হাসিনা আসার পর ৮টি রুশ মিগ-২৯ এর অর্ডার দিয়েছেন। বিমানবাহিনীতে আর্মড হেলিকপ্টার নেই।

পাকিস্তানের অবস্থা দেখুন। সামরিক বাহিনীর সদস্য ৫ লাখ ৮৭ হাজার। রিজার্ভ ৫ লাখ ১৩ হাজার। এর মধ্যে সেনাবাহিনী ৫ লাখ ২০ হাজার। নৌবাহিনী ২২ হাজার, বিমানবাহিনী ৪৫ হাজার। ট্যাংক ২ হাজার ১২০টি। এই ট্যাংকগুলোর মধ্য রয়েছে মার্কিন এম- ৪৭, এম-৪৮, টি-৫৪-৫৫, চায়নিজ টি-৫৯, টি-৬৯, টি-৮৫ এবং ইউক্রেন থেকে অর্ডার দেয়া হয়েছে ৩২০টি টি-৮০, তার মধ্যে ১০০ অলরেডি ডেলিভার্ড লাস্ট ইয়ার। পাকিস্তানের ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচী আপনারা ইতোমধ্যেই জানেন, 'ঘোরী', 'শাহীনের' কথা। বলা হয় 'ঘোরী', যেটার পাল্লা ২ হাজার ৫শ' কিলোমিটার, এটা নর্থ কোরিয়ার 'নডং' ক্ষেপণাস্ত্র মিসাইলের প্রযুক্তি ধারণ করছে। পাকিস্তানের সমরাস্ত্র উৎপাদনাগারে আছে মিরাজ রিবিল্ড ফ্যাক্টরী, মিগ রিবিল্ড ফ্যাক্টরী। ট্যাংক ম্যানুফ্যাকচারিং ফ্যাক্টরী। এখানে 'আল খালিদ' নামে একটি ট্যাংক নির্মাণ করা হয়।

www.pathagar.com

এরপরে রয়েছে পারমাণবিক কর্মসূচি যা সকলেই আপনারা জানেন। পাকিস্তানের নৌবাহিনীতে রয়েছে সাবমেরিন ৯টি, ডেস্ট্রয়ার ২টি, ফ্রিগেট ৮টি, নৌবিমান ৭টি, নৌজঙ্গী হেলিকপ্টার ১২টি। বিমানবাহিনীতে জঙ্গী বিমান ৪১০, এর মধ্যে রয়েছে মিরাজ-৩, ফ্রেঞ্চ মিরাজ-৫, মিরাজ-১১১, কিউ/জে-৬, এফ-৭ (চায়নিজ)। আমেরিকান এফ-১৬, ডি এইচ ৪০টি। বিগত কয়েক বছরে ৮টি বিমান ইনঅপারেটিভ হয়েছে। এখন আছে ৩২টি।

কাম টু ইন্ডিয়া। অবাক ব্যাপার। ইন্ডিয়ান মিলিটারী ফোর্স সম্পর্কে আমেরিকান স্ট্যাটিসটিক্সটা এক রকম, ইংলিশ স্ট্যাটিসটিক্সটা আরেক রকম। মিলিটারী ব্যালান্সে বলা হচ্ছে ১১ লাখ ৭৫ হাজার। আর আমেরিকান আর্মস ট্রান্সফারে বলা হচ্ছে ১৫ লাখ ৮০ হাজার। হোয়াটেভার মে বি, মিনিমামটা তো ১১ লাখ ৭৫ হাজার। সেনাবাহিনী ৯ লাখ ৮০ হাজার, নৌবাহিনী ৫৫ হাজার , বিমানবাহিনী ১ লাখ ৪০ হাজার। ট্যাংক ৩ হাজার ৪১৪, এর মধ্যে রুশ টি-৫৫, ৭২, ওরা দেশে তৈরী করছে 'বৈজয়ন্তী' এবং 'অর্জুন'। ক্ষেপণাস্ত্র 'অগ্নি' এবং 'পৃথ্বি'। আর 'নাগ' হলো এন্টি ট্যাংক মিসাইল। নৌবাহিনীতে এয়ারক্রাফট কেরিয়ার ২, সাবমেরিন ১৯, ডেস্ট্রয়ার ৬, ফ্রিগেট ১৮ এবং নৌ জঙ্গী বিমান ৬৭। আর নৌবাহিনীর জন্য ক্ষেপণাস্ত্র 'সাগরিকা'। বিমানবাহিনী ১ লাখ ৪০ হাজার। জঙ্গী বিমান ৭৭২, এর মধ্যে মিগ ২১, ২৩, ২৫, ২৭, ২৯। লেটেস্ট তারা আনছে 'এসইউ-৩০'। অত্যন্ত আধুনিক। 'মিরাজ-২০০০'। আধুনিক 'জাগুয়ার'। আর 'ক্যানবেরা'। ওরা নিজেরা ওদের কাছ থেকে লাইসেন্স নিয়ে তৈরী করছে। আর তাদের ক্ষেপণাস্ত্র, বিমানবাহিনীর, হলো ত্রিশূল। প্যারামিলিটারী ১ লাখ ৯০ হাজার। বিএসএফ, আসাম রাইফেলস ইত্যাদি। এখন এই যে লাস্ট ইয়ারে নতুন মিলিটারী হার্ডওয়্যার আনার অর্ডার প্লেস করেছে সেটা হলো জানুয়ারী ১৯৯৮-এ অষ্টম রাশিয়ান কিলোশ্রেণীর সাবমেরিন। একই সাথে আরো দুটি সাবমেরিনের অর্ডার নতুন করে দিয়েছে যেগুলি অলরেডি ডেলিভারড। জার্মানীর দুটি সাবমেরিন, আণ্ডার লাইসেন্স, ইন্ডিয়া তৈরী করা শুরু করেছে। এই যে এস ইউ ৩০ বললাম, এটা অত্যন্ত আধুনিক। এর মধ্যে ১৬টি ইতোমধ্যেই ডেলিভারি হয়ে গেছে। এই বছরে বাকি ২৬টি হবে। এই বিমান এন্টিরেডিয়েশন মিসাইল সজ্জিত থাকবে। পাকিস্তান মার্চ '৯৮এ, ইউক্রেন থেকে ৩২০, তারমধ্যে ১০০ অলরেডি ডেলিভারড। ৩টি অগাস্টা শ্রেণীর সাবমেরিন পাকিস্তানে পর্যায়ক্রমে নির্মাণ শুরু হবে। গতবছর পাকিস্তান মিরাজ রিবিল্ড ফ্যাক্টরীতে মিরাজকে আপগ্রেড করছে। তারমধ্যে ৪০টি ডেলিভারি হয়ে গেছে এয়ারফোর্সে।

বাংলাদেশের অস্ত্র সংগ্রহ ঃ '৯৬ সালে বেগম জিয়া একটা অর্ডার দিয়েছিলেন ৮টি এফ-৭ এর। সেটা শেখ হাসিনার আমলে আসলো। আর তিনি বললেন, আমি এয়ারফোর্সকে কতো আধুনিক করছি। পরের ধনে পোদ্দারী কাকে বলে। আর ১০টি

www.pathagar.com

মিগ- ২১। এখন আমরা দেখছি যে. পাকিস্তান ও ইন্ডিয়ার তুলনায় আমরা যোজন যোজন দূরে। এখন বলা হচ্ছে, আমরা তো ওদের মতো করতে পারবো না, আমাদের টাকা নেই, পয়সা নেই। এতো চলবে না। মিলিটারীর ব্যয় কমাও। ফ্যাক্ট অব দ্যা ম্যাটার হলো এইখানে। এইখানেই বারবার হ্যামার করা হয়। আমি অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় বলতে চাই, মিলিটারী এলোকেশন সম্পর্কে এই দেশে যা বলা হয়, সেটা বিকৃত, ডিষ্টোর্টেড, টুইসটেড। আমি কিছু কিছু ফিগার আপনাদের দেবো। দেখুন, এই সাউথ এশিয়াতে যে টোটাল মিলিটারী এক্সপেন্ডিচার হয়, ৬৮ শতাংশ করে ভারত। এটা আমার কথা নয়। ড. মাহবুবুল হক হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিসোর্সের ওপর যে একটা বই বের করতেন প্রতিবছর, তাতে আছে। ৬৮ শতাংশ ভারত, পাকিস্তান ২৫%, শ্রীলংকা ৩.৬% আর বাংলাদেশ ২.৭ %। যারা বড় বড় কথা বলে আমাদেরকে ডিসক্রেডিট করার জন্য, 'শেষ হয়ে গেলো, মিলিটারী সব খেয়ে ফেললো' ইত্যাদি। চিন্তা করুন, তারপরেও বলা হয় কমাও। লক্ষ্য করুন, '৯৮-৯৯ এ ভারতের ডিফেন্স বাজেট হলো ৪৬ হাজার ৮শ' কোটি রুপী। এটাকে টাকার সাথে কনভার্ট করলে আরো বেশী হবে। এর সাথে ড. মাহবুবুল হকের স্ট্যাটিসটিক্স অনুযায়ী একটা জিনিস-ওরা সিক্রেট রাখে। ওদের নিউক্লিয়ার প্রোগ্রাম,মিসাইল প্রোগ্রাম এটার জন্য যে এলোকেশন সেটা হলো ৮ হাজার কোটি। ভারতের জিডিপি ৩৮৫ বিলিয়ন। এনসাইক্লোপেডিয়ার 'বুক অব দি ইয়ার' অনুযায়ী একটা দেশের হাইয়েস্ট বা ম্যাক্সিমাম মিলিটারী এলোকেশন হতে পারে ৫ পারসেন্ট অব দ্যা জিডিপি। ইন্ডিয়া সেখানে করেছে ৩%। পাকিস্তানের কারেন্ট প্রতিরক্ষা বাজেট ১৪ হাজার ৫শ' কোটি টাকা। ওদের জিডিপি ৬১ বিলিয়ন ডলার। রেশিও ৫.২। ইভেন শ্রীলংকার কারেন্ট ডিফেন্স বাজেট ৭২৫ মিলিয়ন ডলার। তাদের জিডিপি হলো ১৪.৮ বিলিয়ন ডলার। আর জিডিপি ও ডিফেন্স এলোকেশনের রেশিও ৪.৮। বাংলাদেশের অবস্থা কী? কারেন্ট মার্কেট প্রাইস রেটে আমাদের জিডিপি হলো ১,৫৪,০৯৬ কোটি টাকা। আমরা কি করেছি? দেখুন, আমার কাছে ১৯৭২ সাল থেকে ৯৮-৯৯ সাল পর্যন্ত প্রতিটি বছরের ডিফেন্স এলোকেশন আছে। মরহুম শেখ মুজিবুর রহমান স্টার্টেড উইথ দ্যা ডিফেন্স এলোকেশন অব ২০ কোটি ১৬ লাখ টাকা। এখন আমাদের ডিফেন্স এলোকেশন ২ হাজার ৮শ' ৩২ কোটি টাকা। আমাদের পপুলেশন জানুয়ারী ১৯৯৯ এ হয়েছে ১২ কোটি ৮৭ লাখ। মানে ১৩ কোটি। ইণ্ডিয়ার পপুলেশন হলো ৯৫ কোটি। তাহলে ৮৫কে ১৩ দিয়ে ভাগ করলে সাড়ে ৭ হয়। তো ইন্ডিয়ার ডিফেন্স বাজেট বড়জোর সাড়ে সাতগুণ হতে পারে। কিন্তু আমাদের তুলনায় তাদের ডিফেন্স বাজেট ২৩ গুণ। কারো সাহস থাকলে কনট্রোভার্ট করুক এই তথ্যগুলো। মিলিটারী বাজেট কমাতে বলো? আগে তোমাদের দাদাদের কাছে যাও। এটা আগে কমিয়ে আনো।

www.pathagar.com

আরেকটা কথা, বাংলাদেশ ছোট দেশ। এর চারপাশে ইন্ডিয়া। ইন্ডিয়ার সাথে আমাদের গোলমাল করা যাবে না। অস্তিত্ব বিপন্ন হবে। এই কথাটাও ঠিক নয়। কেন ঠিক নয়? কিউবা। চিন্তা করুন। আমেরিকার পাশে কিউবা। এই কিউবাকে তো নিশ্চিহ্ন করতে চেয়েছিলো আমেরিকা। পারেনি। ইভেন সিঙ্গাপুর। এটা ঢাকা শহরেরও সমান নয়। সেই সিঙ্গাপুরের মিলিটারী বাজেট ইজ ১৬ বিলিয়ন ডলার। তাইওয়ান ১৫০টি এফ ৮৬ এর অর্ডার দিয়েছে। তাদের মিলিটারী বাজেট ১২ বিলিয়ন ডলার। বলবেন, তাদের পয়সা আছে। কিন্তু মিলিটারীলি স্ট্রং হতে গেলেতো ওদের ভয় থাকবে চায়নার। ইসরাইলতো ১০ হাজার বর্গমাইল থেকে শুরু করে সমানে বাড়ছে। কেবল বাড়ছে। এখন এভাবে যদি বিবেচনা করেন তাহলে আমরা ১৩ কোটি লোকের দেশ, ৫৬ হাজার বর্গমাইল। আমরা ইন্ডিয়াকে এতো ভয় করবো কেন? ভয়ের একটা কারণ ইন্ডিয়ারও রয়েছে। তার ঐ যে এচিলির হিল। গ্রীসের দেবতার ঐ গোড়ালীতে যদি কেউ তীর মারতে পারতো, তাহলে তাকে বধ করা যেতো। আর কোনো পথ ছিলো না। ইন্ডিয়ার এচিলিস হিল হলাম আমরা। কিভাবে? ঐযে যেটাকে বলি চিকেন নেক। ১৭ মাইলের শিলিগুড়ি বর্ডার। যদি আজকে চুম্বি ভ্যালি থেকে চায়না নেমে আসে, আর ঐটুকু যদি বন্ধ করে দেয়, ইন্ডিয়া তখন দুইভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। সুতরাং আমাদের অনেক মাইনাস পয়েন্ট যেমন ইন্ডিয়ার কাছে রয়েছে, তেমনি দি বিগেস্ট প্লাস পয়েন্ট এইটা, যেটার ওপর অমরা প্রচুর পরিমাণে বারগেইন করতে পারি। আর ঐ ওয়েস্টার্ন ইষ্টার্ণ ফ্লাঙ্কের মধ্যবর্তী স্থানেও আমরা একটা এডভান্টেজ নিতে পারি। এখন এই যে সংকট বলছেন, অস্তিত্ব বলছেন, তার আগে আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে আমরা কি ইন্ডিয়ার আশ্রিত রাজ্য হয়ে থাকবো, না কি মাথা উঁচু করে দাঁড়াবো? এই সিদ্ধান্তটা দরকার এই কারণে যে, ভূটানতো গেছেই। সিকিমতো নিয়েই নিয়েছে। দেখা গেলো নেপালও মোটামুটি সাব সার্ভিয়ান্ট হওয়াতে সম্মতি দিয়েছে। আমরাও যদি তেমনটি চাই, যেটি শেখ হাসিনা করছেন, তার পিতা করেছিলেন, তাহলে কোনো কথা নেই। দরকার নেই এসব মিলিটারীর, ইন্ডিয়াইতো আছে। আর যদি মনে করি যে, না আমাদের মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হবে, পরিষ্কার কথা। আজকে চায়না যদি আমাদের পাশে থাকে, তাহলে '৬২ তে তো ছোট মার খেয়েছিলো, এখন আর তারা চায়নার সাথে লাগতেই পারবে না। ঐ স্ট্যাটিসটিকস দিয়ে আর আমি আপনাদের ভারাক্রান্ত করবো না। চায়না নিউক্লিয়ার ফোর্সেসে এতো বেশী এগিয়ে গেছে, তা কল্পনা করা যায় না। আর এখানে একটি ইম্পর্ট্যান্ট ব্যাপার হলো পাকিস্তান। পাকিস্তানের কাদির খানকে গতকাল বা গত পরশু ডেইলি স্টারে একটা ইন্টারভিউয়ে যখন প্রশ্ন করা হয়, আপনারা বোমাটোমা আরো ফাটাবেন নাকি? তখন তিনি বলছেন, আমাদের আর দরকার নেই। কেন? আপনি কি চান? বললেন, আমি চাই, ঐ যে, যেটা দক্ষিণ ভারত

www.pathagar.com

আর উপরে উত্তর ভারত, এদিকে পূর্ব ভারত ওদিকে পশ্চিম ভারত। আমি যে মিসাইল মারবো, এই চার কোণায় ওটা যেতে পারলেই হলো। অর্থাৎ আমাদের টার্গেট হলো ইন্ডিয়া।বিকজ ইন্ডিয়া ওয়ান্টস টু অবলিটারেট পাকিস্তান ফ্রম দ্যা ম্যাপ অব দ্যা ওয়ার্ল্ড। সুতরাং এখন আমরা যে বোমা বানিয়েছি, যে মিসাইল করেছি It can hit any target in any place of India. দুর্বল ভারত বাংলাদেশের স্বাধীনতার রক্ষাকবচ। গোপনে যদি হয়, ব্যক্তিলেভেলে, রাষ্ট্রলেভেলে, উত্তর-পূর্ব ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামীদেরকে সাহায্য করতে হবে। ৪ লাখ ৫০ হাজার সৈন্য। মাত্র এই ৪টা না ৫টা স্টেট ইন্ডিয়া করেছে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলো? আজকে ভোট দাও, রেফারেন্ডম দাও, কাশ্মীরে দাও। এই ক'টা প্রভিন্সে দাও। পাঞ্জাবে। দ্যাখো, ইন্ডিয়াটা থাকে কিনা। ইন্ডিয়া থাকবে না, টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। ইন্ডিয়ার সামনে সমূহ দুর্যোগ। এখন আর সেই অবস্থা নাই। সোনিয়া গান্ধীও রক্ষা করতে পারবেন কিনা সন্দেহ। ইন্ডিয়াতে কোয়ালিশন শুরু হয়ে গেছে। রিজিওনাল ফোর্স মাথা চাড়া দিয়েছে। ঐখানে জয়ললিতা, এইখানে যাদববাবু, ঐখানে মেঘবতি, লালুপ্রসাদ, আমাদের জন্য এগুলো খুব সুসংবাদ। সুতরাং আমার শেষ কথা হলো, যদি স্বাধীন হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়াতে চান তাহলে ইন্ডিয়ার এই দুর্বলতার সুযোগ নিন। অ্যাট দ্যা সেইম টাইম আপনারা যারা পরীক্ষিত বন্ধু, পাকিস্তান, চায়না, ইভেন আমেরিকা। তার সাথেও ভালো রিলেশনশীপ কালটিভেট করুন। এ্যান্ড অন টপ অব এভরিথিং মুসলিম উম্মাহর সাথে। তাহলে এই সংকট কাটবে। এ্যাট দ্যা সেইম টাইম ডিফেন্স এলোকেশন বাড়িয়ে স্ট্রং মিলিটারী গড়ে তুলুন। এইগুলোর মাধ্যমেই আমরা নিরাপত্তার সংকট কাটাবো। ধন্যবাদ সবাইকে।

www.pathagar.com

শক্তিশালী সামরিক বাহিনীর সন্ধানে

১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পাক-ভারত যুদ্ধের ৪ কি ৫ দিন পর শেখ মুজিব লাহোরে বিরোধীদলীয় সম্মেলনে তাঁর বিখ্যাত ৬ দফা প্রস্তাব উত্থাপন করেন। ঐ প্রস্তাবের অন্যান্য দফার মধ্যে অন্যতম ছিল সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের জন্য প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন।

লাহোর থেকে ফিরে শেখ মুজিব প্রাক্তন পূর্ব পাকিস্তানে ঝটিকা সফর করেন এবং বলেন, পাক-ভারত যুদ্ধ আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় পূর্ব পাকিস্তান কত অসহায়। তিনি দাবি করেন, দেশরক্ষা ব্যবস্থায় পূর্ব পাকিস্তানের স্বয়ংসম্পূর্ণতা চাই। তাঁর সাথে সুর মিলিয়ে অধিকাংশ রাজনীতিক এবং সংবাদপত্র বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা পশ্চিম পাকিস্তানের উপর নির্ভরশীল হতে পারে না। Defence of East Pakistan lies in West Pakistan এই তত্ব অসার প্রমাণিত হয়েছে।

কিন্তু কি আশ্চর্য, '৭১ এ স্বাধীনতার পর স্বয়ং শেখ মুজিব যখন প্রথমে প্রধানমন্ত্রী এবং পরে প্রেসিডেন্ট হলেন তখন দেশে উল্টা সুরে গান গাওয়া শুরু হ'ল। চারদিকে ফিসফিসানী শুরু হলঃ মিলিটারীর খরচতো হাতীর খরচ। একটি বড় মিলিটারী পোষার সামর্থ্য কি আমাদের রয়েছে? আর খামাখা বড় আর্মী গড়ে লাভ কি? ইন্ডিয়া তো আমাদের বন্ধু দেশ। বিপদ আপদে ইন্ডিয়াই আমাদের রক্ষা করবে। অর্থাৎ পাকিস্তান আমলে থিওরী ছিল, "Defence of East Pakistan lies in west Pakistan. সেটা শেখ মুজিবের আমলে দাঁড়াল," Defence of Bangladesh lies in India.

আর তারপরই শুরু হল সশস্ত্র বাহিনীর নির্মম বঞ্চনা। ৬ দফায় দাবি করা হয়েছিল, পাকিস্তানের নৌবাহিনীর সদর দফতর থাকতে হবে ঢাকায়। অর্থাৎ ঐ দাবি অনুযায়ী পাকিস্তান নৌবাহিনীর সাবমেরিন, ফ্রিগেট, ডেস্ট্রয়ার, মাইন সুইপারসহ বিশাল নৌযুদ্ধের বহর থাকবে ঢাকায়। অথচ বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর নৌবাহিনীকে যেন একটি জলদস্যুর বাহিনীর পর্যায়ে ডিমোশন দেয়া হ'ল। সাবমেরিন, ডেস্ট্রয়ার ও ফ্রিগেট সংগ্রহ করা একটা আকাশকুসুম কল্পনায় পর্যবসিত হ'ল। কয়েকটি প্রেট্রোল বোট, যাকে লোকে ঠাট্টা করে বলে 'গাদা বোট' তাই বঙ্গোপসাগরের হাজার মাইল সীমানার দায়িত্বে নিয়োজিত হ'ল।

স্বাধীনতার পর খুব ঢাক ঢোল পিটিয়ে আমাদের বিমান বাহিনীর জন্য স্লোগান উৎকীর্ণ হল ঃ 'বাংলার আকাশ রাখিব মুক্ত।' কিন্তু কি দিয়ে মুক্ত রাখব? ১০ কোটি

www.pathagar.com

লোকের বিমান বাহিনীর জন্য রাশিয়া থেকে এলো মাত্র ১ স্কোয়াড্রন অর্থাৎ ১২টি মিগ-২১ জঙ্গী বিমান। মাত্র ৩ বছর পরই দেখা গেল যন্ত্রাংশের অভাবে ঐ ১২টি মিগের মধ্যে ৮টিই মুখ থুবড়ে পড়ে আছে।

সেনাবাহিনী অর্থাৎ স্থলবাহিনীর অবস্থা আরও নাজুক। মিশর থেকে ২৮টি রুশ ট্যাংক আনা হল। কিন্তু তাও সেনাবাহিনীতে না দিয়ে রক্ষীবাহিনীকে দেয়া হল। সর্বশেষে সবচেয়ে লজ্জার বিষয়, ১০ কোটি মানুষের দেশে সমগ্র সামরিক বাহিনীর সদস্য সংখ্যা হল ২০ হাজারেরও নিচে। রক্ষী বাহিনীকে আপন মা করে সশস্ত্র বাহিনীর প্রতি শেখ মুজিবের এই যে, সৎমা সুলভ আচরণ, সেটাও '৭৫ এর পট পরিবর্তনের জন্য বিপুলভাবে দায়ী। কিন্তু আমাদের প্রতিবেশীদের অবস্থা কি? ১০ কোটি মানুষের দেশ পাকিস্তানে জঙ্গী বিমানের সংখ্যা ৩৮৩, এর মধ্যে সর্বাধুনিক এফ-১৬ বর্তমানে ৪০টি। আরও ৬০টি প্রদানের জন্য বুশ প্রশাসন অতি সম্প্রতি অনুমোদন দিয়েছেন। পাক বিমানবাহিনীতে আরও রয়েছে ৭০টি মিরেজ-২০০০ ও মিরেজ-১১১। এছাড়া রয়েছে রুশ মিগ-২৩ এর চাইনিজ ভার্সন এফ-৭, ষ্টার ফাইটার এফ-১১১ প্রভৃতি। ভারতের বিমানবাহিনীতে রয়েছে ৮০০টি জঙ্গী বিমান। এর মধ্যে রয়েছে রুশ মিগ-৩১, মিগ-২৯, মিগ-২৩ প্রভৃতি। আরও রয়েছে বৃটিশ জাগুয়ার, ফরাসী মিরেজ ইত্যাদি। সেনাবাহিনীতে পাকিস্তানের রয়েছে ২৩০০টি ট্যাংক। ভারতের ৪৫০০টি। এছাড়া নৌবাহিনীতে পাকিস্তানের রয়েছে ৮টি সাবমেরিন। ভারতের ১৬টি। ভারতের আরও রয়েছে দু'টি বিমানবাহী যুদ্ধ জাহাজ 'অজিত' ও 'বিক্রান্ত'। রয়েছে পরমাণু শক্তিচালিত রুশ সাবমেরিন।

যদি ৭০ কোটি মানুষের ভারতের সামরিক বাহিনী ও যুদ্ধাস্ত্র এবং ১০ কোটি অধিবাসীর পাকিস্তানের সশস্ত্র বাহিনীর উপরে বর্ণিত তথ্য মোতাবেক এত শক্তিশালী হয়, তাহলে ১১ কোটি মানুষের দেশ বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনী এমন ঠুটো জগন্নাথের মত হবে কেন? পাকিস্তানের সমান না হোক জনসংখ্যা মোতাবেক তার কাছাকাছি হওয়ার দাবি কি অন্যায়?

সুখের বিষয় মুজিবী আমলের সামরিক বাহিনীর চেহারার আজ বৈপ্লবিক পরিবর্তন হয়েছে। যুদ্ধাস্ত্রের দিক দিয়ে আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর সঠিক চিত্র কি তা নির্ভুলভাবে বলা সম্ভব নয়। সামরিক গোপনীয়তা কি মুক্তবিশ্বে, কি লৌহ যবনিকার দেশে একটি প্রতিষ্ঠিত সত্য। গোপনীয়তার এই দূর্ভেদ্য দেয়াল ভেদ করা সম্ভবও নয়। তবুও লন্ডনের "ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ষ্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজের" মিলিটারী ব্যালান্স, আমেরিকার Janes fighting machine বা Far Fastern Economic Review এর বাৎসরিক সার্ভে, প্রভৃতি জার্নাল ঘাটলে একটি প্রাথমিক চিত্র পাওয়া যায়। এ ছাড়াও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্নভাবে যে সব সংবাদ বেরোয় তাতেও একটা আন্দাজ করা যেতে পারে।

www.pathagar.com

অতি সম্প্রতি খবর বেরিয়েছে বাংলাদেশের ২টি ফ্রিগেট শুভেচ্ছা সফরে ভারত ও পাকিস্তান অভিমুখে পাড়ি জমিয়েছে। সুতরাং বলার অপেক্ষা রাখে না যে আমাদের নৌবাহিনীতে অন্তত দুইটি ফ্রিগেট যুক্ত হয়েছে। বাংলার আকাশে আজ হামেশা চীনা মিগ-১৯ গর্জন করছে। এ ছাড়াও আমাদের বিমান বাহিনীতে রয়েছে ফ্রেঞ্চ টেইনার বিমান। সম্প্রতি খবর বেরিয়েছে দীর্ঘমেয়াদী লীজ হিসেবে পাকিস্তান ৪০টি চীনা এফ-৬ জঙ্গী বিমান (যা নাকি রুশ মিগ-২১ এর সমতুল্য) দিচ্ছে। পাকিস্তান তাঁর জঙ্গী বিমানবহরে ১২০টি চীনা এফ-৭ যুক্ত করবে। সে কারণেই ঐ দেশ তার অস্ত্রভাণ্ডার থেকে রেডীস্টক হিসেবে মজুদ ৪০টি এফ-৬ জঙ্গী বিমান দেবে। বিভিন্ন বিদেশী জার্নাল থেকে জানা যায় বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য পরিমাণ এ্যান্টি ট্যাংক মিসাইল সংগ্রহ করেছে। অন্যান্য সূত্র থেকে জানা যায়, আমাদের আর্মড পারসোনাল ক্যারিয়ার, দূরপাল্লার কামান, ট্যাংক এবং গোলন্দাজ বাহিনীও শক্তিশালী হয়েছে। আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর বর্তমান সংখ্যা ৯০ হাজার বলে বিদেশী ডিফেন্স জার্নাল সূত্রে প্রকাশ। আবার অনেক বেসরকারী সূত্র এই অংক এর চেয়েও বেশি বলে দাবি করেন। যদি ৯০ হাজারও হয় তাহলে তা সশস্ত্র বাহিনীর জন্য বৈপ্লবিক সম্প্রসারণ।

উপরের সুদীর্ঘ বিশ্লেষণ থেকে এ কথা ধারণা করার মত সঙ্গত কারণ রয়েছে যে, আমাদের সশস্ত্র বাহিনী বর্তমান সরকারের আমলে শক্তিশালী হতে চলেছে। সামরিক বাহিনীকে বড় ও শক্তিশালী করা একদিনের ব্যাপার নয়। এটা একটা প্রসেস । আমাদের ইসলামী ভ্রাতৃপ্রতীম কয়েকটি দেশ এবং আরও কয়েকটি দেশ নাকি আমাদের সশস্ত্র বাহিনীকে গড়ে তুলতে আগ্রহশীল। শক্তিশালী সামরিক বাহিনী গড়ে তোলার অভিযাত্রা শুরু হয়েছে। এর সফলতা সুনিশ্চিত ইনশাআল্লাহ।

সূত্র ঃ দৈনিক পত্রিকা তাং ১৯৮৯

www.pathagar.com

সামরিক ব্যয় ঃ ভারত পাকিস্তান বাংলাদেশ

[এই লেখাটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় ১৯৯০ সালে। তারপর এক যুগ গত হয়েছে। সুতরাং তথ্য ও পরিসংখ্যান অনেক বদলে গেছে। আজ ২০০৩ সালের তথ্য ও উপাত্তের সাথে তুলনা করলে হয়তো অনেক গরমিল দেখা দেবে। কিন্তু মূল বিষয়টি ঠিকই আছে। ভারতের সামরিক ব্যয় অস্বাভাবিক বেড়ে গেছে। পাকিস্তানের ব্যয় বাড়লেও ভারতের তিন ভাগের এক ভাগ। বাংলাদেশের ব্যয় বাড়লেও ভারতের ২২ ভাগের এক ভাগ মাত্র। এই নিবন্ধটি পাঠ করার সময় এই বিষয়টি খেয়াল রাখার অনুরোধ করছি। – লেখক]

যখন এই উপ-মহাদেশের দু'টি প্রধান দেশ, ভারত ও পাকিস্তান তাদের প্রতিরক্ষা ব্যয় অবিশ্বাস্য দ্রুততার সাথে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাড়িয়েছে তখন বাংলাদেশের সামরিক ব্যয় হ্রাসের জন্য দেশের অভ্যন্তরে গুজব ও কানাকানি এবং দেশের বাইরে না-কি চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। জাতীয় সংসদের আসন্ন বাজেট অধিবেশনের ঠিক আগের মুহূর্তে একটি বিশেষ অক্ষশক্তির প্রতিনিধিত্বকারী তথাকথিত চিহ্নিত বুদ্ধিজীবীরা একটি সেমিনার করে বলেছেন যে, বাংলাদেশের সাহায্যদাতা দেশসমূহের কনসোটিয়াম, বিশেষ করে এর মোড়ল আমেরিকা না-কি আমাদের আসন্ন ৯০-৯১ সালের বাজেটে প্রতিরক্ষা ব্যয় কমাবার জন্য চাপ দিচ্ছেন। অন্য দিকে শোনা যাচ্ছে যে, আমাদের বৃহৎ প্রতিবেশীই না-কি মিলিটারী বাজেট কমানোর জন্য প্রচণ্ড চাপ দিচ্ছে। আর যেহেতু মামারা আর দাদারা চাপ দিচ্ছেন অতএব দেশের অভ্যন্তরে প্রতিবেশীর অনুগ্রহপুষ্ট লোকজন আহলাদে আটখানা হয়েছেন এবং সামরিক ব্যয় বিপুলভাবে হ্রাস করার জন্য সংগোপনে জনমত সৃষ্টি করার প্রয়াস পাচ্ছেন।

সামরিক বাহিনী, সামরিক যন্ত্রপাতি, অস্ত্রশস্ত্র, খরচাপাতি ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা আমাদের দেশে অনেকটা নিষিদ্ধ বিষয় বা 'টাবু'। তাই সামরিক গোপনীয়তা বজায় রেখে আমরা সমগ্র বিষয়টি বিচার করব ঐ সমস্ত তথ্য ও পরিসংখ্যানের সাহায্যে যা দেশী ও বিদেশী সংবাদপত্র ও সাময়িকীতে প্রকাশিত হয়েছে। এই নিবন্ধে আমি যে সব তথ্য, পরিসংখ্যান পেশ করবো তা প্রধানতঃ মার্কিন আর্মস কন্ট্রোল ও নিরস্ত্রীকরণ এজেন্সী কর্তৃক প্রকাশিত 'ওয়ার্ল্ড মিলিটারী এক্সপেনসভিচারস্ এ্যান্ড আর্মস ট্রান্সফার ১৯৮৮', লন্ডনের ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ কর্তৃক প্রকাশিত 'দি মিলিটারী ব্যালান্স, ১৯৮৮-৮৯', 'এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা বুক অব দি ইয়ার,

www.pathagar.com

১৯৮৯' , 'ফারইস্টার্ণ ইকনমিক রিভিউ', ৭ই মার্চ, ১৯৯০, 'মাসিক এয়ারোস্পেস' ফেব্রুয়ারী ১৯৯০ প্রভৃতি গ্রন্থ ও সাময়িকী থেকে নেয়া হয়েছে। পাঠকের সুবিধার্থে উল্লেখ করা গেল যে, ১ বিলিয়ন=১০০০ মিলিয়ন। মার্কিন ডলার ৩৩.৯৮ টাকা এবং ১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ৩৩৯৯ কোটি টাকার সমান।

প্রতিরক্ষা ব্যয় ঃ ভারত পাকিস্তান বাংলাদেশ

যারা বাংলাদেশের ডিফেন্স বাজেট কমাবার জন্য ওকালতি করেন তাদের অন্যতম মোড়ল ভারত কি করছে? ৯০-৯১ সালের অর্থ বছরে ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যয় ধার্য্য করা হয় ৮.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থাৎ বাংলাদেশী মুদ্রায় ২৯ হাজার ২২৩ কোটি টাকা। ১৯৮৭-৮৮ সালে ইন্ডিয়ায় মিলিটারী বাজেট ছিল ৯.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ১৯৯০-৯১ সালে বিশ্বে উত্তেজনার ক্রমহ্রাসমান প্রবণতা লক্ষ্য করে ডিফেন্স বাজেট কমিয়ে ৮.৬ বিলিয়ন করা হয়। কিন্তু গোঁড়া ও কট্টর হিন্দু জাতীয়তাবাদী দল বিজেপি'র সমর্থনপুষ্ট ভিপি সিং-এর সরকার ক্ষমতায় এসেই যে বর্ষ মধ্য সংশোধিত বাজেট পেশ করেন তাতে মিলিটারী খাতে ব্যয় বৃদ্ধি করে ৯.২ বিলিয়ন করা হয়। অর্থাৎ সমরমন্ত্রী ভিপি সিং এক ধাক্কাতেই তাঁর সমর বাজেট ৬০০ মিলিয়ন বাড়ান। এরপর এই সেদিন, অর্থাৎ গত ১লা মে কাশ্মীর ইস্যুর উছিলায় আবার মিলিটারী বাজেট আরও ১৩৮০ মিলিয়ন বা ১.৩৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বাড়িয়েছেন। এই দ্বিতীয় দফা বৃদ্ধি নিয়ে ভারতের ডিফেন্স বাজেট দাঁড়ালো ১০.৫৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে। বাংলাদেশী মুদ্রায় এই অংক দাঁড়ায় ৩৫ হাজার ৯৫০ কোটি টাকা। মাত্র ১টি অর্থ বছরে অর্থাৎ ১৯৮৯-৯০ অর্থ বছরে ভারত তার প্রতিরক্ষা ব্যয় বাড়িয়েছে ১.৯৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা বাংলাদেশী মুদ্রায় দাঁড়ায় ৬ হাজার ৭২৮ কোটি টাকা।

সেখানে বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা ব্যয় কত? ১৯৮৯-৯০ অর্থ বছরে প্রতিরক্ষা খাতে বরাদ্দ করা হয়েছে ১ হাজার ৭ কোটি টাকা। যা মার্কিন ডলারে রূপান্তরিত করলে দাঁড়ায় মাত্র ২৯৭ মিলিয়ন ডলার। ১৯৮৯ সালের অক্টোবর মাসে ভারতের জনসংখ্যা ৯১ কোটি। ভারতের ডিফেন্স বাজেট যদি হয় ৩৫ হাজার ৯শ' ৫০ কোটি টাকা তাহলে জনসংখ্যার অনুপাতে বাংলাদেশের ডিফেন্স বাজেট হওয়া উচিত ৪ হাজার ৮শ' ৮৪ কোটি টাকা। সেখানে আমাদের প্রতিরক্ষা বাজেট মাত্র ১ হাজার ৯ কোটি টাকা। বাংলাদেশের মিলিটারী বাজেট আর কত কমবে? কোন যুক্তিতে কমবে? ১৯৭৭ সালে ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যয় ছিল ৩.৪১৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। বাংলাদেশী মুদ্রায় ছিল ১১ হাজার ৬০৪ কোটি টাকা। পরবর্তী দশ বছরে ভারতের ডিফেন্স বাজেট বেড়ে দাঁড়ায় ৯.৬৩২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। আর এই '৯০ সালে তা দাঁড়িয়েছে ১০.৫৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে। পক্ষান্তরে ১৯৭৭ সালে আমাদের ডিফেন্স বাজেট ছিল ১৪৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। বিগত ১৩ বছরে বহুবার বাংলাদেশী মুদ্রার মান বিপুল পরিমাণে হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও আমাদের ডিফেন্স বাজেট সেই মাত্র ২৯৭ মিলিয়ন মার্কিন

www.pathagar.com

ডলার। চলতি অর্থ বছরে পাকিস্তানের ডিফেন্স বাজেট ছিল ২.৪৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। বাংলাদেশী মুদ্রায় ৮ হাজার ৩২৫ কোটি টাকা। কাশ্মীর ইস্যুতে ভারতের বিশাল সামরিক বাহিনী যখন পাকিস্তানে হামলা চালাবার জন্য পাক-সীমান্তে অশুভ পাঁয়তারা করছে তখন পাকিস্তান ডিফেন্স বাজেট ৩০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বাড়িয়েছে। অর্থাৎ বাংলাদেশী মুদ্রায় বৃদ্ধির পরিমাণ হলো ১ হাজার ১৯ কোটি টাকা। এই বর্ধিত বরাদ্দ নিয়ে পাকিস্তানের মোট প্রতিরক্ষা বাজেট দাঁড়ালো ৯ হাজার ৩৪৪ কোটি টাকা। উল্লেখ্য যে, পাকিস্তানের জনসংখ্যাও আমাদের মতো ১১ কোটি। যেখানে ১ বছরের মধ্যে ভারতের বৃদ্ধির পরিমাণ ৬ হাজার ৭২৮ কোটি টাকা এবং পাকিস্তানের বৃদ্ধির পরিমাণ ১ হাজার ৯ কোটি টাকা। পাকিস্তানের সামরিক বাজেট বাংলাদেশের ৯ গুণের বেশী। ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যয় বাংলাদেশের প্রায় ৩৬ গুণ বেশী। এরপরেও যদি আমাদের ডিফেন্স বাজেট কমাতে হয় তাহলে কি আমরা আমাদের মিলিটারীকে পুলিশ বাহিনী বানিয়ে ছাড়বো না? ১৯৭৭ সালে পাকিস্তানের মিলিটারী বাজেট ছিল ৫৩৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ভারতের ছিল ৩ হাজার ৪১৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ১৯৮৯-৯০ সালে পাকিস্তানের সামরিক বাজেট বেড়ে হলো ২ হাজার ৭৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, ভারত ১০ হাজার ৫৮০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ও বাংলাদেশ ২৯৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। অর্থাৎ ভারতের বেড়েছে ৭১৬৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। পাকিস্তানের বেড়েছে ২ হাজার ২১৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। আর বাংলাদেশের বেড়েছে মাত্র ১৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এরপরে আর খরচ কমানোর প্রবক্তারা কোথায় খরচ কমাতে বলবেন?

অন্যান্য প্রতিবেশীর অবস্থা

১ কোটি ৬০ লাখ লোকের দেশ আফগানিস্তান। ১৯৭৭ সালে তার ডিফেন্স বাজেট ছিল ৬৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ১৯৮৮ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ২৯৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে। রাশিয়ার ১ লাখ ১৫ হাজার সৈন্যের বিশাল উপস্থিতি সত্ত্বেও সে দেশের সামরিক বাহিনীর সদস্য সংখ্যা ৬০ হাজার। বর্ডার গার্ড ৭ হাজার। বিশেষ নিরাপত্তা বাহিনী 'খাদ' ৭০ হাজার ও মিলিশিয়া ১ লাখ। উপ-মহাদেশের অপর একটি দেশ হলো শ্রীলংকা। জনসংখ্যা ১ কোটি ৬৪ লাখ। ১৯৭৭ সালে এই দেশটির মিলিটারী বাজেট ছিল ২৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ১৯৮৮ সালে তাদের প্রতিরক্ষা বাজেট বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৫৮৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। অর্থাৎ বৃদ্ধির পরিমাণ প্রায় ২২ গুণ। আমাদের অপর এক ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী হলো বার্মা। তাদের জনসংখ্যা হলো প্রায় ৪ কোটি। ১৯৭৭ সালে তাদের প্রতিরক্ষা ব্যয় ছিল ১১৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ১৯৮৮ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ২৯৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। বার্মার নিয়মিত সামরিক বাহিনীর সংখ্যা হলো ১ লাখ ৭০ হাজার। আমাদের অপর কাছের প্রতিবেশী হলো থাইল্যান্ড। সাড়ে ৫ কোটি লোকের দেশ থাইল্যান্ডে ১৯৭৭ সালে সামরিক ব্যয় ছিল ৪৮৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ১০ বছর পরে এই ব্যয় বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১৭৪০

www.pathagar.com

মিলিয়ন ডলারে। মাত্র ১৪ লাখ লোকের দেশ ওমান। ১৯৭৭ সালে দেশটির প্রতিরক্ষা ব্যয় ছিল ১৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ১০ বছর পরে অর্থাৎ ১৯৮৭ সালে তা বেড়ে হয়েছে ১৫১৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এবার যারা আমাদের প্রতিরক্ষা বাজেট কমানোর জন্য মোড়লী করছেন তাদের অবস্থা তুলে ধরছি।

পরাশক্তি ও বৃহৎ শক্তিসমূহ

পৃথিবীতে সামরিক খাতে সবচেয়ে বেশী ব্যয় করে শান্তির ললিত বাণী উদগীরণকারী কমিউনিস্ট রাষ্ট্র রাশিয়া। ১৯৭৭ সালে এ দেশটির ডিফেন্স বাজেট ছিল ১৪৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। বাংলাদেশী মুদ্রায় ৪ লাখ ৯৬ হাজার কোটি টাকা। ১৯৮৭ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৩০৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে। বাংলাদেশী মুদ্রায় ১০ লাখ ৩০ হাজার কোটি টাকা। ১৯৭৭ সালে আমেরিকার ডিফেন্স বাজেট ছিল ১০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। অর্থাৎ বাংলাদেশী মুদ্রায় ৩ লাখ ৪০ হাজার কোটি টাকা। আর দশ বছর পর অর্থাৎ ১৯৮৭ সালে দাঁড়ায় ২৯৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। বাংলাদেশী মুদ্রায় ১০ লাখ ৫ হাজার ৮০৮ কোটি টাকা। ১৯৭৭ সালে ফ্রান্সের প্রতিরক্ষা বাজেট ছিল ১৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। বাংলাদেশী মুদ্রায় ৫৪ হাজার ৩৬৮ কোটি টাকা। ১০ বছর পরে ফ্রান্সের প্রতিরক্ষা বাজেট দাঁড়ায় ৩৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। বাংলাদেশী মুদ্রায় ১ লাখ ১৫ হাজার ৫৩২ কোটি টাকা। অনুরূপভাবে পশ্চিম জার্মানী ১৭ বিলিয়ন থেকে ৩৪ বিলিয়ন। পূর্ব জার্মানী ৬ বিলিয়ন থেকে ১৪ বিলিয়ন। জাপান ৮ বিলিয়ন থেকে ২৪ বিলিয়ন ও চীন ১৩ বিলিয়ন থেকে ২০ বিলিয়ন ডলার বাড়িয়েছে।

জিএনপি ও মিলিটারী বাজেট

সামরিক বিষয়, বিশেষ করে সামরিক বাহিনীর গঠন, প্রশাসন, অস্ত্র-শস্ত্র ও আয়-ব্যয় সম্পর্কে যাদের কিঞ্চিত ধরণা রয়েছে তারা জানেন যে, প্রতিরক্ষা ব্যয় বরাদ্দের অন্যতম মাপকাঠি হলো সামগ্রিক জাতীয় উৎপাদন (জিএনপি বা জিডিপি) ও প্রতিরক্ষা ব্যয়ের পারস্পরিক অনুপাত। ওয়ার্ল্ড স্ট্যাণ্ডার্ড-এর প্রতি সর্ব প্রথম বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়েছে কমিউনিস্ট রাশিয়া। তাদের প্রতিরক্ষা ব্যয় তাদের জিএনপি'র ১২.৫%। পক্ষান্তরে আমেরিকা এই আন্তর্জাতিক স্ট্যান্ডার্ডের মধ্যে রয়েছে। তার প্রতিরক্ষা বাজেট জিডিপির ৬.৬%। বিশ্বের অন্যতম দরিদ্র দেশ ইথিওপিয়া, যেখানে খরায় ফসলের যে ক্ষতি হয় তার ফলে হাজার হাজার লোকের মৃত্যু ঘটে। তদসত্ত্বেও ১৯৮৭ সালে সে দেশে এই হার হলো ৮.৫%। ১৯৮৭ সালে অন্যান্য দেশে এই হার নিম্নরূপ ঃ বার্মা ৩%, ইন্ডিয়া ৪%, জর্ডান ১৪%, লিবিয়া ১১.১%, ওমান ২৩.৩%, শ্রীলংকা ৩.১%, থাইল্যান্ড ৩.৭%, সিরিয়া ১১.১%, ইসরাইল ১৬.৬%, পাকিস্তান ৬.৫%, মালয়েশিয়া ৩.২%, ইরাক ২৫%, আফগানিস্তান ৯.৭%। এই সমস্ত দেশের তুলনায় ১৯৮৮ সালে বাংলাদেশের সামরিক বাজেট জিএনপি'র মাত্র ১.৮% বাংলাদেশের জিডিপি হলো ১৭,৪৮০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। সুতরাং আন্তর্জাতিক স্ট্যাণ্ডার্ড অনুযায়ী বাংলাদেশের

www.pathagar.com

প্রতিরক্ষা বাজেট যদি জিডিপি'র ৬.৫% হয় তাহলে তা হতে পারে ১.১৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থাৎ বাংলাদেশী টাকায় ৩ হাজার ৮৭৩ কোটি টাকা। আর যদি ডিফেন্স বাজেট জিডিপি'র ৪% হয় তাহলে তা হতে পারে ০.৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। অর্থাৎ বাংলাদেশী মুদ্রায় ২ হাজার ৩৭৯ কোটি টাকা। সুতরাং ঘরের বাইরে আর ঘরের মধ্যে যারা প্রতিরক্ষা ব্যয় কমানোর জন্য কানাঘুষা শুরু করেছেন তারা যদি দেশপ্রেমিক হন, তাহলে ডিফেন্স বাজেট কমানো নয়, বরং চলতি অর্থ বছরে বরাদ্দকৃত ১ হাজার ৯ কোটি টাকা বাড়িয়ে ১৯৯০-৯১ অর্থ বছরে তা জিডিপি'র ৪% অর্থাৎ ২ হাজার ৩৭৯ কোটি টাকায় উন্নীত করতে হবে।

বৈরী প্রতিবেশী ও প্রতিরক্ষা ব্যয়

মাত্র ৮ হাজার বর্গমাইল এলাকা ও ৪৫ লাখ লোকের দেশ ইসরাইলের ১৯৮৭-৮৮ সালের ডিফেন্স বাজেট ছিল ৫.৫৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের মত একটি বিশাল অংক। বাংলাদেশের জনসংখ্যা ১১ কোটি অর্থাৎ ইসরাইলের চেয়ে ২৪ গুণ বেশী। আয়তন ৭ গুণ বেশী। জিএনপি আমাদের (১৯৮৭ সালের হিসাবে) ১৭.৪৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। পক্ষান্তরে ইসরাইলের ৩৩.৪৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। মাত্র ডাবল অথচ আমাদের ডিফেন্স বাজেট তাদের মাত্র ১.৮%। অর্থাৎ শতকরা দুই ভাগের কম। ইসরাইলের এই প্রতিরক্ষা বাজেটের মধ্যে ১৮শ' মিলিয়ন মার্কিন ডলার, অর্থাৎ বাংলাদেশী মুদ্রায় ৬ হাজার ১শ' ১৬ কোটি টাকা আবার সরাসরি মার্কিন খয়রাতি সাহায্য (গ্রান্ট বা অনুদান)। ইরাকের প্রতিরক্ষা ব্যয় ১৪ বিলিয়ন। ওমানের ১.৫ বিলিয়ন। ১ কোটি ১০ লাখ লোকের দেশ সিরিয়ার ডিফেন্স বাজেট ৩.৩৬ বিলিয়ন (১ বিলিয়ন =১০০০ মিলিয়ন)। থাইল্যান্ডের ১.৬৫ বিলিয়ন। আলজেরিয়া ২ বিলিয়ন। মাত্র ১৩ হাজার ৯শ' বর্গ মাইলের দেশ তাইওয়ান জনসংখ্যা ২ কোটি। কিন্তু তাদের রয়েছে ৪ লাখ ২৪ হাজার সৈন্যের এক বিশাল সেনাবাহিনী। প্রতিরক্ষা বাজেট ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। মাত্র ২৪০ বর্গ মাইলের দেশ সিঙ্গাপুর লোকসংখ্যা ২৭ লাখ। তাদেরও প্রতিরক্ষা বাজেট হল ১.২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২ কোটি ১৯ লাখ লোকের দেশ উত্তর কোরিয়া। আয়তন আমাদের চেয়েও কম। মাত্র ৪৭ হাজার ৩শ' বর্গমাইল। কিন্তু তাদের রয়েছে ৮ লাখ ৩৪ হাজার লোকের বিশাল সামরিক বাহিনী। প্রতিরক্ষা ব্যয় ৪.২২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। দক্ষিণ কোরিয়ার সৈন্য সংখ্যা ৬ লাখ ২৯ হাজার। প্রতিরক্ষা ব্যয় ৫.৩৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। জনসংখ্যা ৪ কোটি ২৬ লাখ। উত্তর কোরিয়ার ট্যাঙ্কের সংখ্যা ৩ হাজার। পক্ষান্তরে দক্ষিণ কোরিয়ার ১৫শ'। সামরিক বিশাল বাহিনীতে উত্তর কোরিয়ার ৮শ' জঙ্গী বিমান।

আমাদের বৈরী প্রতিবেশী

দৈনিক ইনকিলাবের ২৬ মার্চ, ১৯৯০ স্বাধীনতা সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠায় স্বাধীনতার স্বার্থে শক্তিশালী প্রতিরক্ষা' শীর্ষক নিবন্ধে আমি যুক্তিতর্ক, তথ্য ও পরিসংখ্যানসহ প্রশ্নাতীতভাবে প্রমাণ করেছি যে, ভারতই আমাদের প্রধান ও একমাত্র বৈরীদেশ। ঐ

www.pathagar.com

নিবন্ধে আমি মিলিটারী ব্যালান্সের ১৯৮৮ সালের তথ্য পরিবেশন করেছি। ঐ পরিসংখ্যানে ছিল যে, পাকিস্তানের সৈন্য সংখ্যা হল ৪ লাখ ৮০ হাজার। ভারতের ১৩ লাখ ৬৭ হাজার। ঐ নিবন্ধ প্রকাশিত হওয়ার পর আমেরিকার আর্মস কন্ট্রোল এ্যান্ড ডিজআর্মাসেন্ট এজেন্সির একটি অফিসিয়াল রিপোর্ট আমার হাতে এসেছে। এই রিপোর্টে ১৯৮৯ সালের মার্চ পর্যন্ত পরিসংখ্যান পাওয়া যায়। ঐ পরিসংখ্যানে মার্কিন সরকারের অফিসিয়াল হিসাব অনুযায়ী ঃ পাকিস্তানের সৈন্য সংখ্যা হল ৫ লাখ ৭ হাজার। পক্ষান্তরে সৈন্য সংখ্যার দিক দিয়ে ভারত পৃথিবীর ৪র্থ বৃহত্তম সামরিক বাহিনী। প্রথম সোভিয়েত ইউনিয়ন ঃ ৫২ লাখ। দ্বিতীয় চীন ঃ ৩৫ লাখ। তৃতীয় আমেরিকা ঃ ২২ লাখ ৮০ হাজার। ৪র্থ ভারত ঃ ১৫ লাখ।

বাংলাদেশ ও ইসরাইলের সাদৃশ্য

একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, ইসরাইল একটি অবৈধ রাষ্ট্র। বাংলাদেশ এই রাষ্ট্রকে স্বীকার করেনি এবং করবেও না। কিন্তু ইসরাইলের দৃষ্টিতে সে চারধারে বৈরী প্রতিবেশী দ্বারা বেষ্টিত, যাদের সম্মিলিত আয়তন ১৭ লাখ ৮৪ হাজার ৫৯৫ বর্গ মাইল। সশস্ত্র বাহিনী ২৩ লাখ ৯৬ হাজার ৭শ'। ট্যাঙ্ক ১৬ হাজার ৫৪৭, জঙ্গী বিমান ২ হাজার ৬১৬। পক্ষান্তরে ইসরাইলের আয়তন ৭ হাজার ৯৯২ বর্গ মাইল। জনসংখ্যা ৪৫ লাখ। সৈন্যসংখ্যা ১ লাখ ৪১ হাজার। ট্যাঙ্ক ৩৮৫০টি, জঙ্গী বিমান ৬১৩টি। অনুরূপভাবে বাংলাদেশ চারদিক দিয়ে বিশাল বৈরী ভারত কর্তৃক পরিবেষ্টিত। ভারতের আয়তন বাংলাদেশের ২২গুণ। জনসংখ্যা ৭গুণেরও বেশী। সৈন্যসংখ্যা ১৫ গুণ বেশী। এ ক্ষেত্রে ইসরাইলের সুদৃঢ় মনোবল, অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র, ক্ষিপ্রগতি ও দুর্ধর্ষ সেনাবাহিনী থেকে আমাদের অনেক কিছুই শিক্ষণীয় আছে। ইসরাইলের অনুরূপ সুদৃঢ় মনোবল সম্পন্ন, অত্যাধুনিক অস্ত্র সজ্জিত ক্ষিপ্রগতি সম্পন্ন দুর্ধর্ষ সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তুলতে হবে বাংলাদেশকে। এই নিবন্ধের বিভিন্ন স্থানে আমরা দেখিয়েছি যে, যাদের পাশেই রয়েছে বৈরী প্রতিবেশী তারাই শক্তিশালী সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তুলতে বাধ্য হয়েছে। আর এজন্য করতে হয়েছে বিপুল অংকের বরাদ্দ। ইসরাইল, পাকিস্তান, উত্তর কোরিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান, জর্ডান, লিবিয়া, ইরান, ইরাক, সিরিয়া প্রভৃতি দেশ তার প্রমাণ।

আঞ্চলিক বিচ্ছিন্নতার হুমকি

বহিরাক্রমণ প্রতিরোধ ছাড়াও অভ্যন্তরীণ গোলযোগ, বিশেষ করে বিচ্ছিন্নতার হুমকি মোকাবেলার জন্যও গড়তে হয় শক্তিশালী সামরিক বাহিনী। আমাদের প্রতিবেশী দ্বীপ দেশ শ্রীলংকা। সাবেক সিংহল। ১ কোটি ৬০ লাখ লোকের অধিবাস। ভারতের সৃষ্ট ফ্র্যাকেনস্টাইন তামিল টাইগারদের একচ্ছত্র নেতা প্রভাকরণ। তামিল টাইগাররা যখন সিংহলের অখণ্ডতা ছিন্ন করার উপক্রম করলো, ভারতের উস্কে দেয়া সশস্ত্র বিদ্রোহে শ্রীলংকার সংহতি যখন ছিন্ন-ভিন্ন হওয়ার উপক্রম তখন দেশকে এক রাখার বৃহত্তর স্বার্থে শ্রীলংকাকে দ্রুত সামরিক বাজেট বাড়াতে হয়। তাই ১৯৭৭ সালে

www.pathagar.com

সিংহলের সামরিক বাজেট ছিল ২৭ মিলিয়ন, ১৯৮৭ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ২০৪ মিলিয়ন। অনুরূপভাবে, ইরিত্রিয়ার স্বাধীনতাকামী মুসলিম মুক্তিযোদ্ধাদের দমন করার জন্য ইথিওপিয়া সামরিক বাজেট ১৩৮ মিলিয়ন ডলার থেকে ৪৪২ মিলিয়ন ডলারে বৃদ্ধি করে। বার্মার জিএনপি মাত্র ৯.৩ বিলিয়ন হওয়া সত্ত্বেও শুধুমাত্র অভ্যন্তরীণ সংহতির কারণে বার্মায় পৌনে ২ লাখ লোকের একটি সামরিক গড়ে তোলা হয়েছে। ঠিক তেমনি একথা আজ মুক্তকণ্ঠে বলা যায় যে, যদি আমাদের সামরিক বাহিনী না থাকতো ভারতের উস্কানি, মদদ ও অস্ত্রশস্ত্রে অনেক আগেই পার্বত্য চট্টগ্রাম স্বাধীন হয়ে যেত।

সব কথার শেষ কথা

বাংলাদেশের স্বাধীনতার আগে প্রায় ২০ বছর ধরে স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধীকারের যে আন্দোলন হয় তার মূল চালিকাশক্তি ছিল আমাদের এই জনসংখ্যা। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জনসংখ্যাকেই প্রধান সম্পদ এবং শক্তি হিসেবে বিবেচনা ও প্রচার করা হয়। কিন্তু স্বাধীনতার পরের বিশ বছরে কোন কোন মহলের আচরণ দেখে মনে হয় যে, বিপুল জনশক্তিই যেন দেশের কাঁধে একটি বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেশের জনগোষ্ঠীকে দেখে এমন নাসিকা কুঞ্চন করলে আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের ভিত্তি এবং স্তম্ভ ধসে পড়ে। ১৯৮৯ সালের ব্রিটানিকা বিশ্বকোষ অনুযায়ী জনসংখ্যার দিক দিয়ে বাংলাদেশ পৃথিবীর দশম বৃহত্তর রাষ্ট্র। অথচ সামরিক শক্তির দিক দিয়ে আমরা ৭০টি রাষ্ট্রের পরে। বৈরী প্রতিবেশ, জিএনপি ও মিলিটারী এক্সপেনডিচারের আনুপাতিক হার, বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশের ক্রমবর্ধমান সামরিক ব্যয় প্রভৃতি বিষয় বিবেচনায় বাংলাদেশের ১৯৯০-৯১ সালের বাজেট প্রতিরক্ষা বরাদ্দ বাড়িয়ে অন্তত ৪ হাজার কোটি টাকায় উন্নীত করতে হবে।

সূত্র ঃ দৈনিক ইনকিলাব, তাং ১১-৫-১৯৯০

www.pathagar.com

সামরিক দর্শন ঃ মুজিব, জিয়া, এরশাদ, খালেদা

গত সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে সারা দেশব্যাপী যে নির্বাচনী প্রচারাভিযান চালানো হয়, বিশেষ করে বিএনপি বিভিন্ন জনসভায় যে সমস্ত বক্তব্য পেশ করে ও ওয়াদা করে সেগুলির অন্যতম প্রধান ওয়াদা ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও অখণ্ডতা রক্ষা করার জন্য একটি শক্তিশালী সামরিক বাহিনী গঠন। বিএনপির এই বক্তব্য তাকে তার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী আওয়ামী লীগ থেকে একটি আলাদা বৈশিষ্টে চিহ্নিত করেছিল। কারণ আওয়ামী লীগ তার কোন বক্তব্য বা বিবৃতিতেই শক্তিশালী সশস্ত্র বাহিনীর কথা বলেননি। শুধু আওয়ামী লীগ কেন, তার যারা সহযোগী রাজনৈতিক দল বা যারা সহায়ক শক্তি যথা, সিপিবি, কমিউনিষ্ট পার্টি, মোজাফফর ন্যাপ, জাসদ প্রভৃতি রাজনৈতিক দল কোনদিনই একটি পেশাদার শক্তিশালী সশস্ত্র বাহিনীর কথা বলেনি। স্বাধীনতার পর আওয়ামী লীগ এবং তার সহায়ক শক্তিরা এমন ধরনের সামরিক শক্তি এবং সামরিক দর্শনের প্রচার করতে লাগলেন যা ছিল কিম্ভুত কিমাকার। তাদের তত্ত্বকথা অনুযায়ী যে সশস্ত্র বাহিনী গড়ে উঠার কথা ছিল সেটা হতো নিরাবয়ব হাওয়ায় ভেসে বেড়ানো এক কল্পলোকের সামরিক বাহিনী। তাদের থিওরী অনুযায়ী দেশে কোন বড় নিয়মিত সামরিক বাহিনী থাকবে না। দেশের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষকে সামরিক ট্রেনিং দেয়া হবে। ট্রেনিং শেষে তারা কৃষিকাজ ক্ষেত খামার, ব্যবসা বাণিজ্য, চাকরি-বাকরি, ইত্যাকার নিয়মিত পেশায় ফিরে যাবেন। তবে দেশের স্বার্থে জরুরী অবস্থায় প্রয়োজন হলে তাদেরকে তলব করা যাবে এই ধরনের বাহিনীকে তারা বলছেন গণবাহিনী।

আওয়ামী লীগ বা তার সহযোগী শক্তিদের উপরোক্ত সামরিক চিন্তাভাবনা নেহায়েত হাস্যকর। এ ধরনের নিরাকার সামরিক বাহিনীর স্ব-পক্ষে তারা যে যুক্তি দেন তা আরও খোঁড়া। পৃথিবীর কোথায় খুঁজে পাওয়া যাবে এ ধরনের হাওয়াই বাহিনী? আওয়ামী লীগ বা তার সহযোগীরা যে সব দেশের ভক্ত সে সব দেশে কিন্তু এ ধরনের নিরাকার সামরিক বাহিনী নেই। তাদের বড় মুরব্বী রাশিয়ার সামরিক বাহিনী একটি নিয়মিত বাহিনী এবং আয়তনে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড়। ৫০ লক্ষ তাদের সৈন্য, ৬৩ হাজার ট্যাংক, ১৭ হাজার জঙ্গী বিমান। আওয়ামী লীগ এবং তাদের দোসরদেরকে যে দেশের হুকুম বরদার হিসেবে চিহ্নিত করা হয় সেই ভারতেরও রয়েছে ১৫ লক্ষ সৈন্যের বিশাল সশস্ত্র বাহিনী। যে সমাজতন্ত্র আওয়ামী লীগ এবং অন্যদের রাজনৈতিক দর্শন হিসেবে চিহ্নিত সে সমাজতন্ত্রী চীনের নিয়মিত সৈন্য বাহিনীর সংখ্যা ৩২ লক্ষ।

www.pathagar.com

আওয়ামী আমল ও সামরিক বাহিনী

সুতরাং সেই আওয়ামী লীগের হাতে পড়লে সামরিক বাহিনীর চেহারা যে কেমন ন্যুব্জা ও বিশীর্ণ হবে তা সহজেই অনুমেয়। এমনই বিশীর্ণ হয়েছিল আওয়ামী আমলে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী। তাই '৭২-'৭৩ সালে সামরিক বাহিনীর জন্য বরাদ্দ করা হয় মাত্র ২০ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা। পরের বছর ঐ বাজেট বাড়িয়ে করা হয় ৪১ কোটি ৯৬ লক্ষ টাকা এবং তার পরের বছর অর্থাৎ '৭৪-'৭৫ সালে ঐ অংক বৃদ্ধি পেয়ে দাড়ায় ৭০ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকায়। '৭৪-'৭৫ সালে বাংলাদেশের সামরিক বাজেট যখন মাত্র ৭০ কোটি টাকা তখন পাকিস্তানের সামরিক বাজেট তার প্রায় ১০ গুণ অর্থাৎ ৬৯০ কোটি টাকা। পাকিস্তানী রূপী যা বাংলাদেশী মুদ্রায় ১১ শত ৫ কোটি টাকা, অর্থাৎ বাংলাদেশী টাকার মূল্যমান অনুযায়ী বাজেট বাংলাদেশের ১৫ গুণ। পক্ষান্তরে ভারতের সামরিক বাজেট ভারতীয় মুদ্রায় ২৩ শত কোটি রুপী যা বাংলাদেশী মুদ্রামানের তুলনায় ৪৯ গুণ বেশী। এর ফলে যা হবার তাই হয়েছে। আওয়ামী লীগ আমলে সেনাবাহিনীর অবস্থা ছিল 'ঢাল নেই তলোয়ার, নিধিরাম সর্দারের' মতো। পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের যোগদানের পথ প্রশস্ত করার জন্য সম্মেলনের প্রাক্কালে পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দান করে। এর ফলে আনুমানিক ৩০ হাজার বাঙালী সৈন্য, যারা এতদিন পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনীর অংশ ছিল তারা স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের ফলে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীতে যোগদান করে। নেহায়েত এদের বেতন ভাতা এবং রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য শেখ মুজিবকে সামরিক বাজেট বাড়াতে হয়। বাজেট বাড়ালে কি হবে? আওয়ামী সরকার হঠাৎ করে স্ফীত সামরিক বাহিনীর জন্য কোন অস্ত্র-শস্ত্র ও গোলাবারুদের ব্যবস্থা করেনি। তৎকালীন মিশরীয় প্রেসিডেন্ট ভ্রাতৃত্ব, বন্ধুত্ব ও শুভেচ্ছার নিদর্শন হিসেবে যে ৩০টি ট্যাংক উপহার দেন সেগুলোও রক্ষীবাহিনীর নামে বরাদ্দ করা হয়। অথচ এ রক্ষীবাহিনী ছিল ভারতীয় বাহিনীর পোশাকের রং এ সজ্জিত এবং ভারতীয় ইনস্ট্রাক্টরদের দ্বারা গড়ে তোলা বাংলাদেশের নিয়মিত সশস্ত্র বাহিনীর একটি পাল্টা ও সমান্তরাল বাহিনী। এ বাহিনী কোন মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণে ছিল না। এর নিয়ন্ত্রক ছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান স্বয়ং। তাঁর তরফ থেকে এ বাহিনী কন্ট্রোল করতেন তাঁর রাজনৈতিক সচিব জনাব তোফায়েল আহমেদ। শেখ মুজিবের পতনের পেছনে অন্যতম প্রধান কারণ ছিল একদিকে সামরিক বাহিনীকে কোনঠাসা করা এবং অন্যদিকে রক্ষীবাহিনীর অপ্রতিহত ক্ষমতা লাভ।

সামরিক বাহিনী জিয়ার আমলে

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রতি প্রকৃত মনোযোগ দেয়া হয় ১৯৭৫ সালের সরকার পরিবর্তনের পর। জিয়ার শাসনামলেই মূলত একটি আধুনিক সেনাবাহিনীর অবকাঠামো গড়ে উঠেছিল। তেমনি জাতীয় গ্র্যান্ড স্ট্র্যাটেজিতেও গ্রহণ করা হয়েছিল স্বাধীন ও যুগোপযোগী নীতিমালা।

www.pathagar.com

উল্লেখ্য ১৯৭৪-৭৫ সালে যেখানে প্রতিরক্ষা খাতে বরাদ্দ ছিল মাত্র ৭০ কোটি টাকা সেখানে প্রেসিডেন্ট জিয়া ১৯৭৫-৭৬ অর্থ বছরে তা বৃদ্ধি করে ২০৬ কোটি টাকা করেন যা পরবর্তী ১৯৭৬-৭৭ অর্থ বছরে উন্নীত হয় ২১৯ কোটি টাকায়। লন্ডন থেকে প্রকাশিত মিলিটারী ব্যালান্স, থেকে দেখা যায় যে, বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর বিকাশ ঘটেছে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের আমলে। এভাবে ধাপে ধাপে বাড়িয়ে ১৯৮০-৮১ সালে বিএনপি প্রেসিডেন্ট মরহুম বিচারপতি আব্দুস সাত্তারের আমলে ৩৪৭ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়। বাংলাদেশের সামরিক ব্যয় সম্পর্কে পাঠক পাঠিকাদের কাছে একটি সঠিক চিত্র দেওয়ার জন্য বাংলাদেশের জন্মের পর থেকে এ পর্যন্ত ২০ বছরের সামরিক ব্যয়ের ক্ষতিয়ান স্মারণী-১ এ দেওয়া হল।

সাল	সামরিক ব্যয় (কোটি টাকায়)	সাল	সামরিক ব্যয় (কোটি টাকায়)
৭২-৭৩	২০.১৬	৮২-৮৩	৪১৮.৩৬
৭৩-৭৪	৪১.৯৬	৮৩-৮৪	৪২৭.০৮
৭৪-৭৫	৭০.৮৫৫	৮৪-৮৫	৪৯২.৭৪৪
৭৫-৭৬	২০৬.৯৬	৮৫-৮৬	৫৯৬.০৯
৭৬-৭৭	২১৯.৩৯	৮৬-৮৭	৭৩৮.৭০
৭৭-৭৮	২৪৪.১৭	৮৭-৮৮	৮৩২.১৩
৭৮-৭৯	২৪৮.৪৭	৮৮-৮৯	১০১৪.৮৭
৭৯-৮০	২৪২.৬৭	৮৯-৯০	১১৪৮.৯২
৮০-৮১	২৭৪.১৯	৯০-৯১	১১৭৯.৯৭
৮১-৮২	৩৪৭.৫৬	৯১-৯২	১২০৯.৮০

সূত্র ঃ বাংলাদেশের বিগত ২৫ বছরে বিশটি বাজেট বরাদ্দ থেকে স্বতন্ত্রভাবে লেখাকৃত সংগৃহীত ও সংকলিত।

এরশাদের আমলে সামরিক ব্যয়

১নং স্মারণী থেকে দেখা যায় যে মুজিব আমলে সামরিক খাতে ব্যয় হয়েছে প্রতি বৎসর গড়ে ৪৪ কোটি ৩২ লক্ষ টাকা। শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ও বিচারপতি সাত্তারের আমলে অর্থাৎ বিএনপির ৭ বছরের শাসনামলে সামরিক ব্যয় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পায় এবং গড়ে বৎসরে ২০২ কোটি টাকা ব্যয় হয়। ৮২ থেকে ৮৪ সাল পর্যন্ত পরবর্তী ৩ বছর সামরিক খাতে গড়ে বছরে ৪৪৫ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়। ১৯৮৫-৮৬ অর্থবছর থেকে সামরিক ব্যয়ের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পায়। ৮৪-৮৫ সালে যেখানে সামরিক ব্যয় ছিল ৪৯২ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকা পরবর্তী ৪ বছরে তা প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৮৩২ কোটি ১৩ লক্ষ টাকায়। ১৯৮৮-৮৯ অর্থবছর বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর জন্য এক যুগান্তকারী মোড় পরিবর্তনের বছর। এ বছর আমাদের বীর জাওয়ানদের জন্য প্রতিরক্ষা বাজেট আগের বছরের চেয়ে ১৮২ কোটি ৭৪

www.pathagar.com

লক্ষ টাকা বাড়িয়ে ১ হাজার ১৪ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা করা হয়। পরবর্তী ২ বছর প্রতিরক্ষা ব্যয় বাড়তে বাড়তে ১৯৯০-৯১ সালে সামরিক খাতে সংশোধিত চূড়ান্ত ব্যয় হয়েছে ১২ শত কোটি টাকা। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার আমলে অর্থাৎ বর্তমান ১৯৯১-৯২ সালে যে বাজেট পেশ করা হয়েছে এবং যা বিগত ৪ মাস ধরে কার্যকরী হচ্ছে সে বাজেটে সামরিক খাতে বরাদ্দ করা হয়েছে ১২ শত নয় কোটি ৮০ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ বিগত অর্থবছরের সামরিক বাজেটের চেয়ে ২৯ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা বেশী। ইতিমধ্যেই খালেদা জিয়ার অর্থবছরের প্রথম ৪ মাসে মুদ্রাস্ফীতি ১১ ভাগ বলে সরকারীভাবে স্বীকার করা হয়েছে। যাই হোক ১১% মুদ্রাস্ফীতি ধরলেও প্রকৃত ব্যয় দাঁড়াবে ১ হাজার ৭৬ কোটি ৭২ লক্ষ ২০ হাজার টাকা।

পাকিস্তানের সামরিক ব্যয়

১৯৫২ সাল থেকে সাবেক পূর্ববাংলা বা পূর্বপাকিস্তানে একুশ দফার মাধ্যমে যে স্বায়ত্বশাসন আন্দোলন শুরু হয় তার অন্যতম প্রধান ইস্যু ছিল পূর্ববঙ্গের জন্য শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গঠন। পরবর্তী পর্যায়ে ১৯৬৬ সালে শেখ মুজিবের ৬ দফার মধ্য দিয়ে প্রথমে সে স্বাধীকারের আন্দোলন এবং পরবর্তীতে ৬৯-এ স্বাধীনতার আন্দোলন এবং তার অন্যতম প্রধান ইস্যু ছিল পূর্ব পাকিস্তানকে সামরিকভাবে স্বয়ং সম্পূর্ণ করে তোলা। পাকিস্তানের ২৩ বছরে শত-সহস্র অযুতবার বলা হয়েছে যে পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা বাজেটে পূর্বপাকিস্তানকে নির্মমভাবে বঞ্চিত করা হচ্ছে। সামরিক ব্যয় সম্পর্কে একটি নিরাসক্ত ও নৈর্ব্যক্তিক ধারণা পাবার জন্য পাকিস্তানের জন্মের পর থেকে বরাদ্দকৃত সামরিক ব্যয়ের একটি খতিয়ান নীচে স্মারণী দিয়ে দেখানো হল। যে সূত্র থেকে এই পরিসংখ্যান নেয়া হয়েছে। ঐ সূত্র থেকে ১৯৮৬-৮৭ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ এই চল্লিশ বছরের চল্লিশটি ব্যয় বরাদ্দ পাওয়া গিয়েছে। অনেক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও পরবর্তী চার বছরের চিত্র সংগ্রহ করা যায়নি।

সাল	সামরিক ব্যয় কোটি রূপিয়ান	সাল	সামরিক ব্যয় কোটি রূপিয়ান
৪৭-৪৮	২৩.৬	৫৭-৫৮	৮৫.৪
৪৮-৪৯	৪৬.১	৫৮-৫৯	৯৯.৬
৪৯-৫০	৬২.৫	৫৯-৬০	১০৪.৩
৫০-৫১	৬৪.৯	৬০-৬১	১১১.২
৫১-৫২	৭৯.২	৬১-৬২	১১০.৮
৫২-৫৩	৭২.৫	৬২-৬৩	৯৫.৪
৫৩-৫৪	৬৩.৩	৬৩-৬৪	১১৫.৬
৫৪-৫৫	৬৪	৬৪-৬৫	১২৬.২
৫৫-৫৬	৯১.৭	৬৫-৬৬	২৮৫.৫
৫৬-৫৭	৮০	৬৬-৬৭	২২৯.৩

www.pathagar.com

সাল	সামরিক ব্যয় কোটি রূপিয়ান	সাল	সামরিক ব্যয় কোটি রূপিয়ান
৬৭-৬৮		৭৭-৭৮	৯৬৭.৪
৬৮-৬৯	২১৮.৬	৭৮-৭৯	১০১৬.৭
৬৯-৭০	২৪২.৬	৭৯-৮০	১২৬৫.৪
৭০-৭১	৩২০.১	৮০-৮১	১৫৩০
৭১-৭২	৩৭১.৫	৮১-৮২	১৮৬৩
৭২-৭৩	৪৪৩.৯	৮২-৮৩	
৭৩-৭৪	৪৯৪.৮	৮৩-৮৪	২৩২২
৭৪-৭৫	৬৯১.৪	৮৫-৮৬	২৬৭৯
৭৫-৭৬	৮১০.৩	৮৬-৮৭	৩১৭৯
৭৬-৭৭	৮১২		৩৫১২
			৩৮৬১

স্মারণী-২ ও ১ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে '৭২-'৭৩ সালে বাংলাদেশের সামরিক বরাদ্দ ছিল যেখানে ২০ কোটি ১৬ লক্ষ সেখানে পাকিস্তানের সামরিক ব্যয় ছিল ৪৪৩ কোটি ৯ লক্ষ। সকলেই জানেন, আন্তর্জাতিক মুদ্রা বিনিময় হার অনুযায়ী পাকিস্তানের ১ টাকা বাংলাদেশের ১ টাকা ৫৬ পয়সার সমান। সেই হিসেবে অর্থাৎ বাংলাদেশী মুদ্রায় ৭২-৭৩ সালে পাকিস্তানের সামরিক বরাদ্দ ছিল ৬৬৪ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ আমাদের চেয়ে ৩৩ গুণ বেশী। অনুরূপভাবে ১৯৮৬-৮৭ সালে বাংলাদেশের সামরিক ব্যয় ছিল ৭৩৮ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা। পক্ষান্তরে পাকিস্তানের সামরিক বরাদ্দ ছিল ৩,৮৬১ রূপিয়া। অর্থাৎ বাংলাদেশী মুদ্রায় ৬,০২৩ কোটি টাকা। ১৯৯০-৯১ সালে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশের সামরিক বাজেট ছিল (সংশোধিত) ১১৭৯ কোটি ৯৭ লক্ষ টাকা। পাকিস্তানের সামরিক বাজেট ছিল ৬৩২৭ কোটি রূপিয়া। অর্থাৎ বাংলাদেশের মুদ্রায় ৯৮৭০ কোটি টাকা। অর্থাৎ বাংলাদেশের চেয়ে প্রায় ১০ গুণ বেশি। পক্ষান্তরে ভারতের সামরিক বাজেট ছিল ১৭৫৬৫ কোটি রুপি যা বাংলাদেশী মুদ্রায় ২৬,৩৪৭ কোটি টাকা।

সামরিক শক্তি বাংলাদেশ

যদিও একটি দেশের সামরিক শক্তি সাধারণত একটি গোপন বিষয় তবুও আন্তর্জাতিক পত্রপত্রিকায় এসব বিষয় সম্পর্কে হরহামেশা লেখা হয়। ফলে এসব বিষয় আর গোপন থাকে না। তেমনি লন্ডনের ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব স্ট্যাটেজিক স্টাডিজ 'মিলিটারী ব্যালান্স' নামে প্রতিবছর একটি প্রতিরক্ষা দলিল প্রকাশ করে থাকে। ১৯৮৬-৮৭ থেকে ১৯৯০-৯১ এই পাঁচ বছরের মিলিটারী ব্যালান্স পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এই পাঁচ বছরে বাংলাদেশে সামরিক শক্তির উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটেছে। ১৯৭২-৭৩ সনে ভারতের অনুমতি ছাড়া সামরিক বাহিনীর জন্য কোন অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করা

www.pathagar.com

সম্ভব ছিল না। তাই শেখ মুজিবের আমলে সেনাবাহিনীর কপালে জোটেনি কোনো ট্যাংক, নৌবাহিনীর কপালে জোটেনি কোনো ফ্রিগেট। মাত্র ১২টি মিগ ও ২১টি জঙ্গী বিমান নিয়েই 'বাংলার আকাশ রাখিব মুক্ত' বলে শেখ মুজিব সদর্পে হুংকার ছেড়ে ছিলেন। ইনশা আল্লাহ সে পরিস্থিতির অনেক উন্নতি ঘটেছে। 'মিলিটারী ব্যালান্সে' যে তথ্য দেয়া হয়েছে বিগত এপ্রিলের প্রলয়ংকারী প্রাকৃতিক দূর্যোগে সে তথ্য সত্য প্রমাণিত হয়েছে। মহাবীন এবং পাকিস্তান তাদের সীমিত সাহায্যের মধ্যে অকৃপণ হস্তে বাংলাদেশকে যুদ্ধাস্ত্র সরবরাহ করেছে। 'মিলিটারী ব্যালান্স' ১৯৯০-৯১ অনুযায়ী আজ বাংলাদেশের রয়েছে অন্তত ৯০টি চীনা ট্যাংক, তিন থেকে চারটি ফ্রিগেট অন্তত ৯০টি জঙ্গী বিমান যার মধ্যে রয়েছে অন্তত ৩২টি চীনা জে-৭ জঙ্গী বিমান যা রুশ মিগ-২১ এর পরিবর্তিত সংস্করণ। 'মিলিটারী ব্যালান্স' অনুযায়ী বাংলাদেশে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য সংখ্যা হল ১ লক্ষ ৩ হাজার অথচ ১৯৮৮-৮৯ সালেই আমাদের বিমান বাহিনীর ছিল মাত্র ৫৫টি জঙ্গী বিমান সেখানে মিগ-২১ এর চীনা সংস্করণ জে-৭ বা এফ-৭ একটিও ছিল না।

www.pathagar.com

সামরিক শক্তিতে বার্মা বাংলাদেশের চেয়ে এগিয়ে

[ঠিক এক যুগ আগে লেখাটি প্রকাশিত হয়েছিল। সেই লেখা প্রকাশের বেশ কয়েক বছর আগে বার্মা সামরিক শক্তিতে বাংলাদেশের চেয়ে অনেক দূর্বল ছিল। কিন্তু দাবার ছক পাল্টে গেছে। এই ১২ বছরে বার্মা সামরিক শক্তিতে বাংলাদেশের চেয়ে আড়াই গুণ এগিয়ে গেছে। তবে দুই দেশের উত্তেজনা কমেছে এবং তাঁরা বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। – লেখক]

বার্মার সমরশক্তি সম্পর্কে সাম্প্রতিককালে এমন সব খবর পাওয়া যাচ্ছে, যা রীতিমত চমকে দেয়ার মত। গত দু'বছর ধরে দেশটি'র সমরশক্তি অবিশ্বাস্য দ্রুততার সাথে বৃদ্ধি করা হচ্ছে। 'জেনস ডিফেন্স উইকলি সাম্প্রতিক ইস্যুসমূহে বার্মার সমরশক্তি বিশেষ করে সৈন্য-সংখ্যা বৃদ্ধি সম্পর্কে যেসব খবর দিচ্ছে, তাতে শুধু বার্মা নয়, ভারতীয় উপমহাদেশ তথা দূরপ্রাচ্য সম্পর্কে নতুন করে ভাববার সময় এসেছে। ২ লক্ষ ৬১ হাজার ২ শত ২৮ বর্গমাইলের এক বিশাল দেশ সাবেক ব্রহ্মদেশ এবং আজকের বার্মা। বাংলাদেশের আয়তনের চেয়ে সাড়ে চারগুণ বড় এই দেশটি। বাংলাদেশের সবচেয়ে নিকট যে প্রতিবেশী দু'টি রাষ্ট্র, তার একটি হল ভারত অপরটি বার্মা। ভারতের সাথে আমাদের রয়েছে ১৭শ' ৮০ মাইলের স্থল সীমান্ত। এরপরেই বার্মার স্থান। অসংখ্য পর্বতমালা পরিবেষ্টিত এই দেশটির জনসংখ্যা বোধগম্য কারণে অনেক কম। ১৯৯০ সালের হিসাব অনুযায়ী ৪ কোটি ৬ লক্ষ। অর্থাৎ বাংলাদেশের জনসংখ্যার তুলনায় প্রায় ৩ ভাগ মাত্র।

ভৌগোলিক আয়তনের দিক দিয়ে এমন বিশাল একটি দেশ। অথচ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বার্মা অত্যন্ত পশ্চাদপদ। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতিও অত্যন্ত মন্থর। ১৯৮৮-৮৯ ও ৯০-৯১ এ বার্মার মোট জাতীয় উৎপাদন বা জিডিপি হলো-যথাক্রমে ৮.২/৯.৩ ও ১১.১১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। পক্ষান্তরে বাংলাদেশের ১৯৯০-৯১ সালের জিডিপি হলো ১৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। অর্থাৎ বার্মার জিডিপি আমাদের তুলনায় ৬.৮৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার কম যা বাংলাদেশের মুদ্রায় ২৬ হাজার ১ শত ৮২ কোটি টাকার সমান। দেশটির অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলতে কিছুই নেই। উত্তাল গণআন্দোলন, আর্মি ও জনতার সশস্ত্র সংঘর্ষ এবং সশস্ত্র গৃহযুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত এ দেশটির ৮৮-৮৯ সালের অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার নেতিবাচক। ৯০ সালের অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার অর্থনীতির পরিভাষায় কনস্ট্যান্ট। সম্ভবত প্রচণ্ড রাজনৈতিক অস্থিরতা ও সংঘাতের ফলেই বার্মার মুদ্রাস্ফীতির হার আকাশচুম্বী। ৮৯-৯০ সালে বার্মার মুদ্রাস্ফীতির হার ২৩.৪% এবং

www.pathagar.com

৯০-৯১ সালে ১৬.১%। অর্থনৈতিক উন্নয়নের গড় যতই নেতিবাচক হোক না কেন, মুদ্রাস্ফীতি দেশটাকে যতই গ্রাস করুক না কেন এবং ভৌগোলিক আয়তন অনুযায়ী জিডিপি আয় যতই কম হোক না কেন, সামরিক বাজেট তথা সামরিক ব্যয়ের ব্যাপারে বার্মা খুব একটা পিছিয়ে নেই। ১৯৮৭-৮৮ সালে বার্মার প্রতিরক্ষা বাজেট ছিল ২শ' ৯১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। পরের বছর অর্থাৎ ৮৮-৮৯ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৩ শত ৪৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

কিন্তু সমরসজ্জার ক্ষেত্রে বার্মা ধীর পদক্ষেপে তার শক্তি বাড়িয়ে চলেছে। পৃথিবীর সবচেয়ে মর্যাদাশীল এবং সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য সমর সাময়িকী 'ইনষ্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল এন্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ' (আই, আই, এস, এস) কর্তৃক জানা যায় যে, ১৯৮৮ সালে বার্মার স. ´ বাহিনীর সদস্য সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ৮৬ হাজার। পরের বছর অর্থাৎ ৮৯-৯০ সালে তা ১৪ হাজার বেড়ে ২ লাখে উন্নীত হয়। পরের বছর অর্থাৎ ৯০-৯১ সালে আরো ৩০ হাজার বেড়ে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য দাঁড়ায় ২ লক্ষ ৩০ হাজার। তবে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য সংখ্যা যেরূপ বৃদ্ধি পেয়েছে সে তুলনায় ভারী অস্ত্র মোটেই বৃদ্ধি পায়নি। ৮৮-৮৯ সালে বার্মায় ট্যাংকের সংখ্যা ছিল ২০, তার পরের বছর হয়েছে ২৬। নৌবাহিনীতে কোন সাবমেরিন, কোন ডেস্ট্রয়ার বা কোন ফ্রিগেট নাই। ৮৮-৮৯ সালে বিমান বাহিনীতে কোন আধুনিক জঙ্গী বিমান ছিল না। ছিল ২৩টি ট্রেইনার জঙ্গী বিমান, যেগুলোকে স্বল্প সময়ের নোটিশে যুদ্ধ বিমানে রূপান্তরিত করা যেত।

১৯৯০ সালের জুলাই মাস থেকে বার্মার সশস্ত্র বাহিনীতে অত্যন্ত আকস্মিকভাবে নতুন মাত্রা সংযোজিত হয়েছে। অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতার সাথে সেনাবাহিনীর সংখ্যা বাড়ানো হচ্ছে। বিশ্ববিখ্যত প্রতিরক্ষা জার্নাল 'জেনস ডিফেন্স উইকলি' এবং মিলিটারী ব্যালান্স অনুযায়ী ১৯৯১ সালের জুন মাস পর্যন্ত বার্মার সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ২ লাখ ৯০ হাজারে। চলতি ডিসেম্বর মাসের মধ্যে আরো ২০ হাজার বৃদ্ধি করে এই সংখ্যা ৩ লক্ষে উন্নীত করা হবে। ১৯৯২ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে বার্মার সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য সংখ্যা আরো ২ লাখ বাড়ানো হবে। যার ফলে বার্মার সামরিক বাহিনীতে হবে ৫ লক্ষ সৈন্য।

১৯৯০ সালের সেপ্টেম্বর সংখ্যা 'জেনস ডিফেন্স উইকলিতে' একটি চাঞ্চল্যকর খবর প্রকাশিত হয়েছে। খবরে জানা যায় যে, বার্মা গণচীনের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ সমরসম্ভার ক্রয়ের আশ্বাস পেয়েছে। এই অস্ত্র তালিকার মধ্যে রয়েছে হালকা মাঝারি ট্যাংক, নৌবাহিনীর জন্য পেট্রোল বোট, বিমান বিধ্বংসী কামান এবং রকেট লাঞ্চার। এই পত্রিকার সাম্প্রতিক এক সংখ্যায় যে খবর প্রকাশিত হয়েছে তা রীতিমত আশ্চর্য হবার মত। বার্মার বিমান বাহিনীতে কয়েকটি ট্রেনার বিমান ছাড়া কোন পূর্ণাঙ্গ জঙ্গী বিমান ছিল না। কিন্তু এ বছরের মে মাসে বার্মার দক্ষিণ পূর্ব বন্দর নগরী মোলমিনে দুইটি বিশালাকার জাহাজকে নোংগর ফেলতে দেখা যায়। এই জাহাজ থেকে

www.pathagar.com

১১টি এফ চীনা জঙ্গী বিমান খালাস করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, চীনা এফ জঙ্গী বিমান রাশিয়ার মিগ ২১ বিমানের নবতর সংস্করণ। এই চালানের সাথে এসেছে প্রথম পর্যায়ে ৫ জন চীনা ইন্সট্রাক্টর, একজন লেফটেনেন্ট, ৩ জন সার্জেন্ট এবং একজন ওয়ারেন্ট অফিসার। স্বাধীন দেশ হিসাবে অভ্যুদয়ের পর হতে এবারই সর্ব প্রথম বার্মার মাটিতে বিদেশী সামরিক ব্যক্তির পদচারণা ঘটল। বর্মী গোয়েন্দা সূত্রে জানা যায়, ঐ সব সামরিক অফিসার উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করবেন এবং বর্মী বিমান বাহিনীর পাইলটদের আধুনিক জঙ্গী বিমান উড্ডয়ন ও পরিচালনায় প্রশিক্ষণ দেবেন। অবশ্য কেউ কেউ বলতে পারেন যে, বিশ্বে যখন মার্কিন ঈগল বা এফ-১৬ অথবা রুশ মিগ-২৭ কিংবা মিগ-২৯ এর মত আধুনিক জঙ্গী বিমানের ছড়াছড়ি, সে তুলনায় চীনা এফ-৭ বা মিগ-২১ জঙ্গী বিমান অবশ্যই সেকেলে। কিন্তু যে বর্মী বিমান বাহিনী ১৯৪৯-৫০-৫১ সালের কোরীয় যুদ্ধের পিসি-৭, পিসি-৯ বা এটি-৩৩ এর মত লক্কড়-ঝক্কড় বিমানের অধিকারী ছিল সেখানে এফ-৭ জঙ্গী বিমানের সংযোজন বার্মার বিমান বাহিনীতে নিঃসন্দেহে একটি যুগান্তকারী ঘটনা। আপাতঃদৃষ্টিতে বার্মার কোন বহিঃশত্রু নেই, নেই কোন ভিন দেশী রাষ্ট্রের সাথে বৈরীতা, যে বার্মা অভ্যন্তরীণ গৃহযুদ্ধ তথা সশস্ত্র বিদ্রোহীদের মোকাবেলায় ব্যস্ত, সেই দেশে এখন এক আসনবিশিষ্ট, বহুমুখী এবং রকেট ও ক্ষেপণাস্ত্র সজ্জিত যুদ্ধ বিমানের সংযোজন করা হলো কেন সে বিষয়ে জল্পনা কল্পনা স্বাভাবিক। আসলে বার্মার কাউন্টার ইনসারজেন্সি বা গেরিলা আক্রমণ ঠেকানোর জন্য বার্মায় প্রয়োজন হলো যুগোশ্লাভিয়ার নির্মিত জি-৪ জঙ্গী বিমান। ১৯৮৯ সালে বার্মা এ ধরনের এক স্কোয়াড্রান জঙ্গী বিমান ক্রয় করেছে এবং বর্মী পাইলটরা এই বিমান পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে।

অনুমান করা হয় যে, বার্মার সশস্ত্র কমিউনিস্ট বিদ্রোহীদের সংখ্যা হলো ১০ থেকে ১৩ হাজার। ১৯৮৯ সালের মার্চ-এপ্রিল মাসে বর্মী সরকার বা কমিউনিস্টদের মধ্যে যে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে তার ফলে বার্মার সুদীর্ঘ ৪০ বছরের কমিউনিস্ট সশস্ত্র বিদ্রোহের অবসান ঘটেছে।

এই পটভূমিতে যখন কয়েক যুগের সশস্ত্র বিদ্রোহের অবসান ঘটেছে এবং বার্মার বুকে শান্তি ফিরে এসেছে তখন বার্মার এই সামরিক শক্তি বৃদ্ধি অত্যন্ত দুর্বোধ্য বিষয়। এই সেদিন অর্থাৎ ১৯৮৮ সালে যেখানে সামরিক বাহিনীর সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ৮৬ হাজার সেখানে ৯০ সালের শেষে তা বাড়িয়ে ২ লক্ষ ৩০ হাজার করা অর্থাৎ মাত্র ২ বছরে ৪৪ হাজার সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি করা এবং তারপর গত জুন পর্যন্ত তা আরো বাড়িয়ে ২ লক্ষ ৮০ হাজারে উন্নীত করায় পশ্চিমা সামরিক বিশ্লেষকরা বিস্মিত, হতচকিত ও বিভ্রান্ত হয়েছেন। তাঁরা আরো যখন জেনেছেন যে, এই সংখ্যা বাড়িয়ে এ বছরের শেষে ৩ লক্ষ করা হবে এবং চূড়ান্ত ভাবে তা বৃদ্ধি করা হবে ৫ লাখে তখন বিষয়টি নিয়ে সামরিক পর্যবেক্ষকগণকে নতুনভাবে ভাবতে হবে বৈকি।

www.pathagar.com

বার্মার সেনাবাহিনীতে ভর্তির কায়দা অভিনব। সেই সব তরুণকেই সেনাবাহিনীতে ভর্তি করা হচ্ছে যারা এতিম এবং যারা পার্বত্য উপজাতি থেকে এসেছে। সম্পদে সংকুচিত, কারিগরী জ্ঞানে অনুন্নত, আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যায় অজ্ঞ, পর্বতসংকুল বার্মায় কেন এই সুবিশাল সমর আয়োজন? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে পশ্চিমা ও দূরপ্রাচ্যের সমর বিশেষজ্ঞরা যখন অন্ধকারে পথ হাতড়ে মরছেন তখন বার্মার প্রবীণ সেনাপতির একটি গোপন সার্কুলার হঠাৎ আলোর ঝলকানীর মত অন্ধকার দিগন্তে রূপালী রেখার ঝিলিক হয়ে ফুটে উঠেছে। এই সার্কুলারটি জারী করা হয়েছে ১৯৯১ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারী। এই গোপন সার্কুলারে স্বাক্ষর করেছেন বার্মার সেনাপতি জেনারেল থ্যারসু। সার্কুলারে স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে যে, "ভারত হলো এমন একটি দেশ যে দেশটি অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহকে উস্কে দেয় এবং মদদ যোগায়। এই দেশটি অর্থাৎ ভারত বার্মার অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে। এই দেশটি বার্মার অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে এমন সব আচরণ করে যা একটি প্রতিবেশী বন্ধুদেশের নিকট থেকে প্রত্যাশিত নয়।" এতদিন পর্যন্ত ধারণা ছিল যে, বার্মার স্থিতিশীলতা নষ্ট করছে গণচীন। ধারণা ছিল, বার্মায় গণচীনের অশুভ প্রভাবকে নির্মূল করার জন্য কমিউনিস্ট বিদ্রোহকে কঠোরভাবে দমন করতে হবে। বার্মার সেনাপতির এই গোপন সার্কুলারের পর সে ধারণা আজ পাল্টে গেছে। ভারত আজ বার্মায় গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে সমর্থন করার নামে সেদেশের অভ্যন্তরীণ গোলযোগকে উস্কে দিচ্ছে। বার্মার বিদ্রোহীদেরকে ডেকে এনে ভারতের অভ্যন্তরে জামাই আদরে স্থিতিশীলতা বিনষ্ট করার জন্য তাদেরকে লেলিয়ে দিচ্ছে। ভারতের এই আচরণ নতুন কিছু নয়। তারা এমন আচরণ করেছে সিকিমে, করেছে শ্রীলংকায়। উস্কে দিয়েছে তামিল টাইগার নেতা প্রভাকরণকে। করেছে বাংলাদেশে, উস্কে দিয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তিবাহিনীকে। করেছে পাকিস্তানে, লেলিয়ে দিয়েছে জি এম সৈয়দকে। এটা হলো ভারতের বিশ্বব্যাপী আধিপত্য বিস্তারের সুদূর নীল নকশার একটি অংশ। যে অংশে রয়েছে সুদূর মরিশাস, মৌরিতানিয়া ও ফিজি। রয়েছে ভারতের বিশাল ব্লু ওয়াটার নেভি। রয়েছে বিশাল ভারত মহাসাগর নিয়ন্ত্রণের উগ্র সাম্রাজ্যবাদী বাসনা। তাইতো আজ বার্মাকে তার নিরপেক্ষতা বিসর্জন দিতে হচ্ছে। স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় তাকে ছুটতে হচ্ছে চীনের দ্বারে। গড়তে হচ্ছে বিশাল সামরিক বাহিনী। ভারতের এই দখলদার মানসিকতার জন্যই পাকিস্তানকে ছুটতে হয়েছে চীনের দ্বারে। জানিনা, এরপরে আর কাকে ছুটতে হবে এবং কোথায়?

সূত্র ঃ পালাবদল তাং ৩০-৯-৯১

www.pathagar.com

হয় এ্যাটম বোমা না হয় ডিফেন্স প্যাক্ট

–ড. তালুকদার মনিরুজ্জামান

পাকিস্তান ও ভারত আণবিক বোমা বিস্ফোরণের পর বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী উপমহাদেশের উত্তেজনা দূর করার জন্য ভারতের রাজধানী দিল্লী এবং পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে ৯ ঘন্টা করে ঝটিকা সফর করলেন। তাঁর মনের মধ্যে যে উদ্দেশ্যই থাক না কেন বাইরে ঘঁটা করে বলা হয়েছিল যে, পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে আণবিক বোমা ফাটানোর উত্তেজনা দূর করার জন্য তিনি এই দৌড় ঝাঁপ করছেন। পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ্যে না বললেও অনেক বোদ্ধা মানুষকে তখন বলতে শোনা গেছে যে, পাকিস্তান-ভারতের গরম ঠান্ডা করার ব্যর্থ চেষ্টা না করে শেখ হাসিনার উচিত, নিজের ঘরকে মজবুত করা। অর্থাৎ বাংলাদেশে একটি শক্তিশালী সামরিক বাহিনী গড়ে তোলা এবং এর মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে দুর্জয় করে তোলা। এ ব্যাপারে ইতিমধ্যেই তিন ধরনের প্রস্তাব বিভিন্ন মহল থেকে উত্থাপন করা হয়েছে। একটি মহল বলছেন যে ভারত ও পাকিস্তান আণবিক ক্ষমতা অর্জন করেছে। পাকিস্তান ও বাংলাদেশের জনসংখ্যা মোটামুটি সমান হওয়ায় দক্ষিণ এশিয়ার তৃতীয় বৃহত্তম শক্তি হিসেবে বাংলাদেশকেও এখন এ্যাটম বোমা বানানোর পথে এগুতে হবে। যারা এ্যাটম বোমা বানানোর পক্ষে তাঁরা এ ব্যাপারে পূর্ণ সচেতন যে, এই প্রস্তাবকে অনেকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিতে পারেন। প্রশ্ন তুলতে পারেন যে, বাংলাদেশ এমনিতেই একটি হতদরিদ্র দেশ। যার ভাত খাওয়ার পয়সা নেই সে এ্যাটম বোমা বানাবে কি দিয়ে? এজন্য কেউ কেউ এই ধারণাকে পাগলের প্রলাপ বলে উড়িয়ে দিচ্ছেন। কিন্তু এ্যাটম বোমার প্রবক্তারা বলছেন যে, ১৯৭৪ সালে ভারত পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘঁটালে পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো এ্যাটম বোমা বানানোর সংকল্প ঘোষণা করেন। সেদিনও সেই একই কথা উঠেছিল। বলা হয়েছিল যাদের ভাত খাওয়ার পয়সা নেই তারা বোমা বানাবে কোত্থেকে? এই প্রশ্নের জবাবে জুলফিকার আলী ভুট্টো বলেছিলেন যে, প্রয়োজনে ঘাস খেয়ে হলেও তারা বোমা বানাবেন। জনাব ভুট্টোর এই ঘাস খাওয়ার সংকল্পকেও সেদিন অনেকে পাগলের প্রলাপ বলে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই পাগলের প্রলাপই আজ এক কঠোর বাস্তবতা। পাকিস্তান আজ বিশ্বের বুকে একটি এ্যাটমিক পাওয়ার। কঠোর সত্য হল এই যে, ১৯৭৬ সাল থেকে

www.pathagar.com

পাকিস্তান এ্যাটম বোমা বানানোর প্রক্রিয়া শুরু করে। প্রক্রিয়াটা শুরু হয়েছিল বলেই আজ সেটা শেষ হয়েছে। তাই এই মতের প্রবক্তারা বলেন যে বাংলাদেশে প্রক্রিয়াটি শুরু করতে অসুবিধা কোথায়? আগে শুরুটা হোক না। শেষটা পরে দেখা যাবে শুরু হলে বোমা বানানোর টাকা হয়ত ভূতে যোগাবে।

আরেকটি মহল এবং এই মহলটি প্রবলভাবে শক্তিশালী। এই মহল বলেন যে, বাংলাদেশকে অত্যন্ত শক্তিশালী দূর্জয় একটি সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তুলতে হবে। অপর একটি মহল বলেন যে, বাংলাদেশের চারধারে শক্তিশালী ভারত। সেই ভারতের পটভূমিতে স্ট্রং মিলিটারী গড়ে লাভ কি? কারণ সেই মিলিটারী ভারতের তুলনায় কতখানি স্ট্রং হতে পারবে? এর উত্তরে স্ট্রং মিলিটারীর প্রবক্তারা ইসরাইলের উদাহরণ দেন। তারা বলেন যে ইসরাইলও চারধারে শত্রু পরিবেষ্টিত। সউদী আরব মিশরসহ অনেক বড় বড় রাষ্ট্র তার দুশমন। কিন্তু ক্ষুদ্র ইসরাইল প্রমাণ করেছে যে, ক্ষিপ্রগতি, দুর্ধর্ষ এবং স্ট্রং মিলিটারীই ইসরাইলকে দিয়েছে আত্মবিশ্বাস, স্থায়িত্ব এবং মর্যাদা। এই দুটি মতবাদের মাঝখান থেকে উথাপিত হয়েছে একটি নতুন মতবাদ। যে মতবাদ অনেক শিক্ষিত এবং সচেতন মানুষকে চমকে দিয়েছে। এই মতবাদকে জনসমক্ষে প্রকাশ্যে বাঙময় করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান তালুকদার মনিরুজ্জামান। গত মে মাসের ৩১ তারিখে দৈনিক 'সংগ্রামের' প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত একটি একান্ত সাক্ষাৎকারে তালুকদার মনিরুজ্জামান তাঁর দ্ব্যর্থহীন মতবাদ প্রকাশ করেছেন। এরপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর এমাজউদ্দিন আহমদ দৈনিক 'ইনকিলাবে' প্রকাশিত একটি নিবন্ধে ডক্টর তালুকদারের প্রস্তাবের প্রতি প্রচ্ছন্ন সমর্থন দিয়েছেন। আসল ব্যাপার হল এই যে, ডক্টর তালুকদার মনিরুজ্জামানের প্রস্তাব উথাপনের বহু পূর্বেই এ ধরনের কথাবার্তা অনেককে এখানে ওখানে বিচ্ছিন্নভাবে বলতে শোনা গেছে।

।। দুই ।।

ড. তালুকদার মনিরুজ্জামান বলেন, বাংলাদেশের উচিত হবে পাক-ভারত ছাড়া তৃতীয় কোন পরাশক্তির সঙ্গে আত্মরক্ষামূলক আণবিক নিরাপত্তা জোট গঠন করা। এমনকি বাংলাদেশের কোনো একটি দ্বীপে মার্কিন পরমাণু উপস্থিতিরও পক্ষপাতি বলে তিনি জানান। ডক্টর তালুকদার বলেন, ক্রুসেডের ইতিহাস পেছনে রেখে কোনো খ্রীস্টান শক্তিই ইসলামী কোনো দেশকে পারমাণবিক শক্তিধর রাষ্ট্রে পরিণত হতে দিতে চায় না। তাই পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানী ও চিন্তাবিদদের অনেকেই ভারতের পরমাণু বোমার চেয়ে পাকিস্তানী পরমাণু বোমাকে বেশী ভয় পায়। তিনি বলেন, বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষকে সামরিক প্রশিক্ষণ দিয়ে একটি বিশাল প্রতিরোধ বাহিনী গড়ে তোলা হলে পৃথিবীর কোনো শক্তিই এদেশের ওপর আক্রমণ করে একে হজম করতে পারবে না।

www.pathagar.com

ভারতের পরমাণু বিস্ফোরণের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকারের নীরবতাকে নতজানু, ভারতমুখী ও একপেশে পররাষ্ট্রনীতি বলে নিন্দা করেন। তিনি বলেন, ভারতীয় রাজনীতিকরা সব সময়ই অখণ্ড ভারতের স্বপ্ন দেখেছেন। অখণ্ড ভারতের স্বপ্ন সফল এবং অহংবোধ জাগ্রত করার জন্যই তারা ভারতকে পরাশক্তিতে পরিণত করতে চায়। তিনি আরো বলেন, পারমাণবিক বিস্ফোরণের পর প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ীসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ যেরূপ দম্ভোক্তি করেছিলেন তাতে ভারতের নবোত্থিত হিন্দুজাতীয়তাবাদকে কিছুটা হলেও স্তব্ধ করেছে। এক প্রশ্নের জবাবে তালুকদার মনিরুজ্জামান বলেন, দিল্লীর শাসক মহলে সবসময়ই অখণ্ড ভারতে ফিরে যাবার আকাঙ্ক্ষা বিরাজ করছে। আর বিজেপি বিগত ইলেকশনের আগে প্রকাশ্যেই ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ মিলে একটি কনফেডারেশন গঠনের ইচ্ছা ব্যক্ত করেছে। কুমিল্লার কংগ্রেস নেতা আশরাফ উদ্দিন চৌধুরীর এক পত্রের উত্তরে পণ্ডিত জওহর লাল নেহেরু লিখিতভাবে বলেছিলেন যে, পাকিস্তান টিকবে না। বিশেষভাবে পূর্ব পাকিস্তান তো নয়ই। ভারতের বিখ্যাত ইংরেজী দৈনিক 'টাইমস অব ইন্ডিয়ার' সাবেক সম্পাদক গিরিলাল জৈন তাঁর 'দি হিন্দু ফেনোমেনা' গ্রন্থে লিখেছেন, নেতৃত্বের দর্শন, মার্কসবাদ, জোট নিরপেক্ষতাবাদ ব্যর্থ হয়েছে। নতুন করে জেগে উঠেছে হিন্দুত্ব। ডক্টর তালুকদার আশংকা প্রকাশ করেছেন, "এই হিন্দু জাতীয়তাবাদ যেন নাৎসীবাদ বা ফ্যাসিবাদের মতো উগ্র জাতীয়তাবাদে পরিণত না হয়। এই হিন্দুত্ব যদি ফ্যাসিবাদের মতো উগ্র জাতীয়তাবাদে পরিণত হয় তাহলে পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ উভয়েই ভারতীয় আগ্রাসনের শিকার হবে।" ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে ভবিষ্যত আণবিক যুদ্ধের আশংকা সম্পর্কে তিনি বলেন, আফ্রিকান রাষ্ট্রবিজ্ঞানী আলী মজরুই মনে করেন যে, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যে হিংসা ও বিদ্বেষ রয়েছে তার ফলে উপমহাদেশে একটি আণবিক যুদ্ধ বাধার যথেষ্ট আশংকা রয়েছে। এই যুদ্ধ বাঁধলে তার বীভৎসতা হিরোশিমা এবং নাগাসাকির বীভৎসতাকেও ছাড়িয়ে যাবে। সেই বীভৎসতার কাছে হিরোশিমা নাগাসাকির বীভৎসতা টিপার্ট বলে মনে হবে।"

অপর এক প্রশ্নের জবাবে ডক্টর তালুকদার দৃঢ়তার সাথে বলেন, ভারতের বিস্ফোরণের পর বাংলাদেশ সরকারের বলা উচিত ছিল যে, ঘাস খেয়ে হলেও আমরা এ্যাটম বোমা বানাবো। ভারত এবং পাকিস্তান ছাড়া অপর কোনো পরাশক্তির সাথে বাংলাদেশের অবিলম্বে আত্মরক্ষামূলক সামরিক চুক্তি স্বাক্ষর করা উচিত। তিনি আমেরিকার সাথে সোফা (স্ট্যাটাস অব ফোর্সেস এগ্রিমেন্ট) স্বাক্ষরের জোরালো সমর্থন জ্ঞাপন করেন। তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় বলেন, "প্রয়োজনে সোফা চুক্তির পরিবর্তে বঙ্গোপসাগরে আমাদের কোনো দ্বীপকে যদি মার্কিন আণবিক ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করতে দেয়া হয় তাতেও আমার আপত্তি নাই।" তিনি বলেন, ১৯৫৮-৫৯ সালে যখন ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সিন্ধুনদের পানি বন্টন নিয়ে আলোচনা চলছিল তখন

www.pathagar.com

ভারতের একগুঁয়ে মনোভাবে বিরক্ত হয়ে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব প্রকাশ্যে বলেছিলেন, If there is no water there will be war. এরপরই ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে পানিবন্টন চুক্তি স্বাক্ষরিত ও বাস্তবায়িত হয়। সাময়িকভাবে আমরা দুর্বল। তাই ভারতের সাথে আমরা এ ভাষায় কথা বলতে পারি না। ড. তালুকদারের মতে, ভারতের মতো উগ্র দেশের মোকাবিলায় বাংলাদেশের সামনে দু'টি পথ খোলা আছে। একটি পথ হলো প্রতিটি বয়স্ক নর-নারীকে বাধ্যতামূলক মিলিটারী ট্রেনিং দেয়া। প্রয়োজনে প্রতিটি কৃষকের হাতে এটি রাইফেল ও একটি লাঙ্গল থাকবে। এভাবে বাংলাদেশের মানুষকে নিয়ে যদি একটি বিশাল প্রতিরোধ বাহিনী গড়ে তোলা যায় তাহলে কোনো শক্তিই বাংলাদেশকে আক্রমণ করে হজম করতে পারবে না। সামরিক পরিভাষায় এটাকে বলে স্ট্র্যাটেজি অব টোটাল ডিফেন্স। দ্বিতীয় পথ হলো, যদি ঘাস খেয়ে হলেও আণবিক বোমা বানানো না যায় , যদি টোটাল ডিফেন্স গড়ে তোলা সম্ভব না হয়, তাহলে উপমহাদেশের বাইরে কোন পারমাণবিক শক্তির সাথে প্রতিরক্ষা চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া।

বহিঃশত্রুর হামলা থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা রক্ষার আর কোন্ পথটি খোলা আছে? তারও আগে প্রশ্ন ওঠে বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিপন্ন করতে পারে কে? পাকিস্তানের প্রসঙ্গ এখানে অবান্তর। কারণ দেড় হাজার মাইল দূর থেকে এসে বাংলাদেশের ওপর আক্রমণ চালানো, দখল করা এবং সেই দখলদারিত্বকে ধরে রাখা পাকিস্তানের পক্ষে সম্ভব নয়। এছাড়াও পাকিস্তানকে আসতে হলে আসতে হবে ভারতের ওপর দিয়ে। ভারতীয় আপত্তি বা প্রতিরোধের মুখে বাংলাদেশে হামলা চালাতে হলে ভারত বিজয় করে তবেই পাকিস্তানকে বাংলাদেশে আসতে হবে। এ ধরনের চিন্তাধারা এবং যুক্তিতর্ক উদ্ভট এবং পাগলের প্রলাপ। পাকিস্তানকে বাদ দিলে তাহলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিপন্ন হতে পারে একমাত্র ভারতের হাতে। আর এটাই হলো ভূগোলের কঠোর বাস্তবতা। তিনধারে ১৮০০ মাইল স্থল সীমান্ত জুড়ে ভারত। দক্ষিণে ১০০০ মাইল সীমান্ত জুড়ে বঙ্গোপসাগর। সেখানেও ভারতের ব্লু ওয়াটার নেভীর প্রবল উপস্থিতি। সুতরাং স্থল ও জলসীমান্ত জুড়ে ২৮০০ মাইলই পরিবেষ্টন করে আছে ভারত। ২৫০ মাইল অভিন্ন সীমান্ত রয়েছে বার্মার সাথে। বাংলাদেশের নিরাপত্তা হুমকি হওয়ার মতো শক্তি এখনও অর্জন করেনি বার্মা বা মায়ানমার। ২৮০০ মাইল ঘিরে রাখা ভারতের সাথে বাংলাদেশের রয়েছে অনেক সমস্যা। গঙ্গার পানি চুক্তি এবং পার্বত্য চুক্তি করে ভারতের সাথে বিরোধ মিটিয়ে ফেলা হয়েছে বলে যারা যুক্তি দেন, তার উত্তরে এক কথাই বলা যায় যে, বাংলাদেশের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে এসব চুক্তি করা হয়েছে। ভারতের তাঁবেদার আওয়ামী সরকারের পতন হলে জনগণ এসব চুক্তি অস্বীকার করবে। তখন ভারত তাঁর সম্প্রসারণবাদের থাবা বিস্তার করবে। এছাড়া ভারত চীনের

www.pathagar.com

সমকক্ষ হয়ে এশিয়ায় প্রভুত্ব করতে চায় এবং রাশিয়া, আমেরিকা এবং চীনের মতো বিশ্ব শক্তির মর্যাদা চায়। এটা সুনিশ্চিত করতে হলে তাদের প্রয়োজন একটি বশংবদ বাংলাদেশ। কিন্তু বাংলাদেশের ১২ কোটি মানুষ ভারতের প্রভুত্ব মানে না। সুতরাং ভারতের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিক হওয়ার আশা সুদূর পরাহত। তাই বলছিলাম যে বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রতি একমাত্র হুমকি হলো ভারত।

ভারত আজ এক প্রবল প্রতাপান্বিত শক্তি। সেই বৈরী ভারতের আধিপত্যবাদী থাবা থেকে বাঁচতে হলে হয় এ্যাটম বোমা বানাতে হবে না হয় আমেরিকা বা চীনের সাথে ডিফেন্স প্যাক্ট করতে হবে। এর বাইরে কি আর কোনো পথ খোলা আছে?

ভারত বর্ষের ইতিহাস যে পথে এগুনোর কথা ছিল সে পথে এগোয়নি। ভারত কোনো দেশ নয়, একটি উপমহাদেশ। অর্থাৎ একাধিক দেশ নিয়ে গঠিত হওয়ার কথা এই উপমহাদেশটির। কিন্তু বাস্তবে সেটা হয়নি। কাশ্মীর, পাঞ্জাব, আসাম, পশ্চিমবাংলা, ত্রিপুরা, নাগাল্যান্ড, অরুণাচল, মেঘালয়, মিজোরাম প্রভৃতি রাজ্য এক একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হতে পারে। সে জন্য তারা লড়াইও করছে। সেটা হলে আমাদের সার্বভৌম সমতার ভিত্তিতে হয়তো আমাদের স্বাধীনতা সুনিশ্চিত হতে পারতো। কিন্তু যতদিন সেটা না হচ্ছে ততদিন গোয়া, দিউ, দমন, হায়দারাবাদ, জুনাগড়, মানভাদড়ি, সিকিম, কাশ্মীর দখলকারী ভারতের পররাজ্য লিপ্সা থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য চীন-পাকিস্তান-বাংলাদেশ প্রতিরক্ষা মৈত্রী গড়ে তোলা ছাড়া কোনো বিকল্প নেই।

সূত্র ঃ দৈনিক সংগ্রাম তাং ২-৭-৯৮

www.pathagar.com

দোহাই, সামরিক বাহিনীকে বিতর্কে জড়াবেন না

বাংলাদেশী এই জাতিটির সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য হলো এই যে, আমরা অন্যদেরকে যা করতে নিষেধ করি নিজেরা সেই কাজটি বেশী করে করি। ইদানীং একটি নতুন টেকনিক দেখা যাচ্ছে যে, বক্তৃতা বা বিবৃতির মাধ্যমে আমরা কাউকে কোনো কাজ করতে নিষেধ করি। সেই একই বিবৃতির মাধ্যমে কিন্তু আমরা সেই কাজটিই করে বসি। এই জাতির আর একটি দুর্ভাগ্য হলো এই যে, সেনাবাহিনীকে আমরা সব সময় রাজনৈতিক বিতর্কের উর্দ্ধে রাখার কথা বলি। কিন্তু যে বক্তৃতা বা বিবৃতির মাধ্যমে এই কথাটি বলি সেই একই বক্তৃতা বা বিবৃতির মধ্য দিয়েই আবার গোটা সামরিক বাহিনীকে বিতর্ক এবং দলীয় রাজনীতির মধ্যে জড়িয়ে ফেলি। বিএনপি'র চেয়ারপারসন এবং বিরোধী দলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া এক কর্মী সমাবেশে সামরিক বাহিনী সম্পর্কে একটি মন্তব্য করেন। এই মন্তব্যটি ছিল সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে একজন তথাকথিত বুদ্ধিজীবী কর্তৃক অবমাননাকর এবং ক্ষতিকর বিবৃতি দেয়ার জবাব। গত ৮ই জুলাই মঙ্গলবার বেগম জিয়ার মন্তব্যের পাল্টা বক্তব্য রেখেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি খালেদা জিয়াকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, সেনা ছাউনিতে বসে রাজনীতি করবেন না। তিনি অভিযোগ করেন যে, সাবেক প্রধানমন্ত্রী নাকি সেনাবাহিনীকে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করার চেষ্টা চালাচ্ছেন। বেগম জিয়া কিভাবে এই চেষ্টা চালাচ্ছেন সেটা শেখ হাসিনা খোলাসা করে বলেননি। বেগম জিয়ার বিরুদ্ধে সেনাবাহিনীকে রাজনীতিতে ব্যবহারের অভিযোগের সময় তিনি আবার সেই সেনাবাহিনীকে নিয়ে কথা বলেন। তিনি বলেছেন যে, বিগত বিএনপি সরকারের আমলে নাকি সকল নিয়মনীতি ভঙ্গ করে সেনাবাহিনীতে প্রমোশন দেয়া হয়েছে। এমন কি স্লিপ দিয়ে প্রমোশন দেয়া হতো বলেও প্রধানমন্ত্রী অভিযোগ করেন।

তিনি দাবী করেন যে, আওয়ামী লীগের আমলে নিয়মনীতি অনুসরণ করা হচ্ছে। তিনি বলেন যে, বেগম জিয়ার স্বামী জনাব জিয়াউর রহমান সেনাবাহিনীর হাজার হাজার অফিসার ও জওয়ানকে হত্যা করেছেন। শেখ হাসিনা বেগম খালেদা জিয়াকে বলেছেন যে, ক্যান্টনমেন্টের যে বাসাটিতে বেগম জিয়া বাস করেন ঐ বাসাটি তার ছেড়ে দেয়া উচিত। গুলশানেও বেগম জিয়ার একটি বাড়ী রয়েছে। বিরোধী দলীয়

www.pathagar.com

নেত্রী হিসেবে মিন্টু রোডেও তাকে সরকারী বাসভবন বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। এসব বাসায় তিনি থাকতে পারেন। এরপর তিনি বেগম জিয়াকে ক্যান্টনমেন্টের বাসা ছেড়ে দিতে বলেন।

প্রধানমন্ত্রীর এই বিবৃতি রাজনৈতিক মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। সেনাবাহিনীকে দলমতের উর্ধে রাখার কথা বলে তিনি মরহুম জিয়ার বিরুদ্ধে অনেক অফিসার ও সেনা সদস্য হত্যা করার অভিযোগ এনেছেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এসব উক্তি গত ৮ই জুলাই মঙ্গলবার ঢাকার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয়েছে। এখানে তার বরাতে যেসব কথা ছাপা হলো সেগুলো প্রকাশিত হয়েছে আওয়ামী লীগপন্থী একটি দৈনিক পত্রিকায়। যা বলা হয়েছে তাতে সঙ্গতভাবে ধারণা করা যায় যে, প্রধানমন্ত্রী চাচ্ছেন বেগম জিয়া যেন ক্যান্টনমেন্টের বাসভবনে না থাকেন। তিনি যেন ঐ বাড়ীটি ছেড়ে দেন। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, দরদ থাকলে ঐ বাসা ছেড়ে দিন। গুলশানে একটি বাসা আছে। সেনা প্রধানের বাড়ীটা ছেড়ে দিলেই পারেন। গুলশান ও মিন্টু রোডের বাড়ী দুটোই তো যথেষ্ঠ। সেনাবাহিনীর সম্পদ ফেরত দিয়ে প্রমাণ করুন তাঁর দরদ।"

সম্প্রতি অনেক বিবেকবান লোককে বলতে শোনা যাচ্ছে যে, আমাদের রাজনীতিতে অত্যন্ত দুঃখজনকভাবে ব্যক্তিগত আক্রমণ শুরু হয়েছে। জিয়াউর রহমান নিহত হওয়ার পর ১৬ বছর পার হয়ে গেল। ১৬ বছর ধরে বেগম খালেদা জিয়া ঐ বাড়ীতে বসবাস করছেন। এই ১৬ বছরের মধ্যে প্রথম ৯ বছর ক্ষমতায় ছিলেন প্রেসিডেন্ট এরশাদ। তিনিও বেগম খালেদা জিয়াকে একবারের জন্যও বাড়ী ছেড়ে দিতে বলেননি। তারপর এসেছে দু'টি কেয়ারটেকার সরকার। তারাও তাকে ডিস্টার্ব করেননি। সেখানে গত এক বছরে এমন কি ঘটল যে, আওয়ামী লীগ সরকার বেগম জিয়াকে ঐ বাড়ী থেকে উৎখাত করার চিন্তা- ভাবনা করছে?

প্রধানমন্ত্রী যেটাকে সেনা হত্যা বলছেন, সেই বিষয়টি অত্যন্ত সংবেদনশীল এবং স্পর্শকাতর। হাজার হাজার সেনা সদস্য হত্যা করা হয়েছে, এই ধরনের অভিযোগ যখন প্রধানমন্ত্রী তুলছেন তখন এই ঘটনার আদ্যপান্ত এবং চুলচেরা বিশ্লেষণ করা দরকার। এসব বিষয় নিয়ে ঢালাওভাবে কথা বলার আগে ৭৫/৭৬-এর সেই ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ দিনগুলোর কথা গভীরভাবে বিবেচনায় আনতে হবে। সবকিছুকে যদি ঢালাওভাবে হত্যাকাণ্ড বলে চালিয়ে দেয়া হয় তাহলে ইতিহাস ক্রমান্বয়ে বিকৃত হতে থাকবে। সেনা ছাউনিতে কারা বারবার শৃংখলা ভঙ্গ করছিল? ১৫/১৬ বার কারা সেনা বিদ্রোহের চক্রান্ত করছিল? এসব প্রশ্ন গভীরভাবে পর্যালোচনা করতে হবে।

সেনাবাহিনীর পদোন্নতিতে যদি গুরুতর কোনো অনিয়ম ঘটেই থাকে তাহলে প্রধানমন্ত্রী (যিনি দেশরক্ষা মন্ত্রীও বটে) সেসব অনিয়ম তদন্ত করে দেখুন এবং তদন্তের ফলাফল দেশবাসীকে জানান। সামরিক বা বেসামরিক প্রশাসনের অভ্যন্তরে প্রশাসনিক

www.pathagar.com

বা পদ্ধতিগত নিয়মনীতির লঙ্ঘন হলে বিভাগীয়ভাবেই সেগুলোর ফয়সালা হয়। এগুলোকে কোনোদিন রাজনৈতিক ইস্যু বানানো যায় না। গভীরভাবে ভাবলে তিনি দেখতে পাবেন যে, এসব বিষয় প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতা-বিবৃতি বা সাংবাদিক সম্মেলনের বিষয় নয়। এগুলো করে প্রধানমন্ত্রী নিজেই সামরিক বাহিনীর একান্ত ঘরোয়া ইস্যুগুলোকে রাজনৈতিক ইস্যুতে পরিণত করছেন। যেহেতু তিনি এগুলোকে ইস্যু বানিয়েছেন তাই প্রধানমন্ত্রীকে এ বিষয়গুলোর তদন্ত করতে হবে। না হলে অতি নীরবে হলেও এই ধারণাটি শিক্ষিত সমাজের মনে বদ্ধমূল হয়ে বসবে যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিরোধী দলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে হেনস্থা করার জন্যই এসব কথা বলে বেড়াচ্ছেন।

।। দুই ।।

জাপান থেকে ফিরতে না ফিরতেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সামরিক বাহিনীর ইস্যু নিয়ে বেগম জিয়ার বিরুদ্ধে মারমুখো হয়ে উঠলেন কেন? তাঁর এই ক্রোধের উৎস কি? উৎস হলো আগের দিন বেগম জিয়ার কতিপয় মন্তব্য। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ব্যক্তিরা বিএনপিতে যোগদান করার জন্য বেগম জিয়ার সরকারী বাসভবনে সমবেত হলে বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি কতিপয় মন্তব্য করেন। নাম উল্লেখ না করে একজন বুদ্ধিজীবীর বক্তব্যের প্রতি ইঙ্গিত দিয়ে বেগম জিয়া বলেন যে, সরকারের ইঙ্গিতে ঐ আওয়ামী বুদ্ধিজীবী সেনাবাহিনী বিরোধী বক্তব্য দিয়েছে। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ঐ ব্যক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী বিভাগের একজন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক। তিনি ঘাদানির একজন নেতা তিনি বলেছেন যে, বাংলাদেশে বর্তমানে যতবড় সেনাবাহিনী আছে। অতবড় সেনাবাহিনীর প্রয়োজন নেই। ভারতের সাথে যুদ্ধ লাগলে আমাদের সেনাবাহিনী এই ভদ্রলোকের ভাষায় ৬ ঘন্টাও টিকতে পারবে না। সুতরাং এমন একটি সেনাবাহিনী পোষার কোনো প্রয়োজন নেই। বেগম খালেদা জিয়া এই ধরনের বক্তব্যকে রাষ্ট্র বিরোধী বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি বলেন, "বর্তমান সরকার ভারতের যোগসাজশে বাংলাদেশের সেনাবাহিনীকে ধ্বংস করার লক্ষ্যে তাদের পোষ্য বুদ্ধিজীবীদের দিয়ে সেনাবাহিনীর প্রয়োজন নেই বলে বিবৃতি দিচ্ছে। বিবৃতি দিয়ে সুকৌশলে জনগণের প্রতিক্রিয়া পরীক্ষা করছে।" তিনি আরো বলেন "তারা চায়, এ দেশে শক্তিশালী সেনাবাহিনী যেন না থাকে। শক্তিশালী সেনাবাহিনী না থাকলে ভারতীয় অপশক্তি সহজেই এ দেশকে গ্রাস করতে পারবে। ইতিমধ্যেই সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করে গোটা চট্টগ্রাম ভারতের হাতে তুলে দেয়ার কাজ সম্পন্ন করেছে।"

বেগম জিয়ার এই বক্তব্যের পাল্টা জবাব হিসেবেই প্রধানমন্ত্রী এসব কঠোর ভাষা প্রয়োগ করেছেন। কিন্তু আবেগ এবং উত্তেজনা বিবর্জিত হয়ে যদি নিরাসক্ত মনে সমগ্র

www.pathagar.com

বিষয়টি ভাবা যায় তাহলে দেখা যাবে যে, বেগম জিয়ার সমালোচনা না করে প্রধানমন্ত্রীর উচিত ছিল ঐসব তথাকথিত বুদ্ধিজীবীর সমালোচনা করা। বুদ্ধিজীবীর ছদ্মবেশ পরে জাতিকে ভুল পথে পরিচালনা করার কোনো অধিকার ঐসব ভাড়াটে বুদ্ধিজীবীর নেই।

৯৭/৯৮ সালের দক্ষিণ এশিয়ার কয়েকটি দেশের প্রতিরক্ষা বাজেট পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা ব্যয় অতি নগণ্য। ৯৭/৯৮ অর্থ বছরে বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা বাজেট হলো ২৪৫৭ কোটি টাকা। অর্থাৎ মার্কিন ডলারে আমাদের সামরিক বাজেটের পরিমাণ ৫৭১ কোটি ডলার। বার্মার জনসংখ্যা বাংলাদেশের তুলনায় মাত্র তিনভাগের এক ভাগ। অথচ তাদের ৯৬/৯৭ সালের সামরিক বাজেট ছিল ১৬০০ মিলিয়ন ডলার। অর্থাৎ আমাদের চেয়ে ১০২৯ মিলিয়ন ডলার বা ৪৪২৪ কোটি টাকা বেশী। বার্মার সৈন্য সংখ্যা ৩ লাখ ২১ হাজার। অথচ আমাদের সৈন্য সংখ্যা মাত্র ১ লাখ ১৭ হাজার। শ্রীলংকার আয়তন ২৫,৩৩২ বর্গমাইল। অর্থাৎ বাংলাদেশের অর্ধেকেরও কম। শ্রীলংকার লোকসংখ্যা ১ কোটি ৯০ লাখ। অর্থাৎ তাদের জনসংখ্যা আমাদের ৬ ভাগের ১ ভাগেরও কম। কিন্তু শ্রীলংকার সামরিক বাজেট হলো ৭০১ মিলিয়ন ডলার। অর্থাৎ বাংলাদেশী টাকায় ৩০০০ কোটি টাকা। অর্থাৎ শ্রীলংকার প্রতিরক্ষা বাজেট বাংলাদেশের চেয়েও ৫৪৩ কোটি টাকা বেশি। শ্রীলংকা বাংলাদেশের চেয়ে আয়তনে অর্ধেক এবং জনসংখ্যা অনেক অনেক কম হওয়া সত্ত্বেও তাদের সামরিক বাজেট আমাদের চেয়ে বেশি। বার্মার অবস্থাও তাই। তাদের জনসংখ্যা আমাদের চেয়ে তিন ভাগের এক ভাগ হলেও তাদের সৈন্য এবং সামরিক বাজেট উভয়ই আমাদের চেয়ে ৩ গুণ বেশী। এর পরেও ঐসব ব্যক্তি যখন বাংলাদেশের সামরিক বাহিনীর প্রয়োজনীয়তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তখন আমরা কি বুঝবো? বুঝবো যে তারা হয় জ্ঞান পাপী না হয় বিদেশী শিখণ্ডী।

পাকিস্তান এবং ভারতের উদাহরণ দিলে বিষয়টি আরো বেশী পরিষ্কার হয়ে যায়। পাকিস্তানের জনসংখ্যা বাংলাদেশের সমান। পাকিস্তানের ৯৭/৯৮ সালের প্রতিরক্ষা বাজেট হলো ১৩ হাজার ৪০০ কোটি পাকিস্তানী রূপী। বাংলাদেশী মুদ্রায় ১৪ হাজার ২শ' কোটি টাকা। অর্থাৎ বাংলাদেশের চেয়ে ৬ গুণ বেশি। পাকিস্তানের ট্যাঙ্কের সংখ্যা ২১৫০টি। 'মিলিটারী ব্যালান্স' অনুযায়ী বাংলাদেশের ট্যাঙ্কের সংখ্যা ৮০টি। অর্থাৎ পাকিস্তানের ট্যাঙ্কের সংখ্যা বাংলাদেশের চেয়ে ২৫ গুণ বেশি। চলতি সালে ভারতের সামরিক বাজেট ১০২০০ মিলিয়ন ডলার। অর্থাৎ বাংলাদেশী মুদ্রায় ৪৩ হাজার ৮শ' ৬০ কোটি টাকা। ভারতের জনসংখ্যা বাংলাদেশের চেয়ে সাড়ে ৭ গুণ বেশী হলেও ভারতের সামরিক বাজেট বাংলাদেশের চেয়ে ১৮ গুণ বেশি। ভারতের সৈন্য সংখ্যা ১৫ লাখ। ট্যাঙ্কের সংখ্যা ৩৬০০টি। বাংলাদেশের কোনো সাবমেরিন নেই। কোনো ডেষ্ট্রয়ার নেই। নেই কোনো আধুনিক জঙ্গী বিমান।

www.pathagar.com

বাংলাদেশের সামরিক বাহিনীতে ক্ষেপণাস্ত্রের কথা আজও কল্পনাও করা যায় না। অথচ ভারতে সেখানে 'অগ্নি' নামক আন্তঃমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র এবং 'পৃথ্বি' নামক ভূমি থেকে ভূমিতে নিক্ষেপ করার (এসএসএম) মধ্যম পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র রয়েছে। ক্ষেপনাস্ত্র উৎপাদন ক্ষেত্রে পাকিস্তানের সর্বশেষ সংযোজন হলো 'হাতাফ-৩' এর পাল্লা হলো ৮০০ কিলোমিটার বা ৫০০ মাইল।

আমরা শুধুমাত্র এই উপমহাদেশের দেশগুলোর মধ্যেই আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ রেখেছি। উন্নত দেশগুলোর তুলনা আমরা করিনি। সেটা হবে একটি অসম উদাহরণ। শুধুমাত্র দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর সামরিক বাজেট এবং সামরিক শক্তি বিবেচনা করলে বোঝা যাবে যে, এ ক্ষেত্রেও আমরা কত পিছিয়ে আছি। আর সেখানে যদি ঐসব ভাড়াটে আঁতেল সামরিক বাহিনী রাখার যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তাহলে তাদের দেশপ্রেম নিয়ে সংশয় প্রকাশ করলে আপত্তির কি আছে? সুতরাং বেগম খালেদা জিয়ার এ সম্পর্কিত সাম্প্রতিক মন্তব্যে ক্ষেপে যাওয়ার কোনো কারণ দেখি না। গতকাল বুধবার ৯ই জুলাইয়ের একাধিক জাতীয় দৈনিকে দেখা গেলো যে, এহেন 'গুণধর' (?) কবির চৌধুরী প্রধানমন্ত্রীর পাশে শোভা পাচ্ছেন। এটা কিভাবে সম্ভব? প্রধানমন্ত্রী তো দেশ রক্ষামন্ত্রীও বটে। যে ব্যক্তি দেশ রক্ষাবাহিনী বিলোপ করতে চান তার ছবি দেশ রক্ষামন্ত্রীর পাশে জ্বলজ্বল করে কিভাবে?

সূত্র ঃ দৈনিক সংগ্রাম তাং ১০-৭-৯৭

www.pathagar.com

এয়ার ভাইস মার্শাল জামাল উদ্দিনের ইন্টারভিউ ঃ কতিপয় জলন্ত প্রশ্ন

মিগ-২৯ ক্রয় নিয়ে যে বিতর্ক শুরু হয়েছে সে বিতর্ক ইলাস্টিকের মতো বেড়েই চলেছে। এ বিতর্কে মহাসমারোহে যোগ দিয়েছেন বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর চীফ অব স্টাফ এয়ার ভাইস মার্শাল জামাল উদ্দিন। জাতীয় দৈনিক পত্রিকাসমূহে তিনি সমানে ইন্টারভিউ দিয়ে যাচ্ছেন। এ পর্যন্ত আমার চোখে পড়েছে ৩টি পত্রিকাকে দেয়া তাঁর ইন্টারভিউ। একটি ইংরেজী এবং দুটি বাংলা পত্রিকা। সবগুলোই ঢাউস সাইজের। মিগ-২৯ জঙ্গী বিমান ক্রয় করার স্বপক্ষে তিনি অনেক কথা বলেছেন। প্রথমে একটি পয়েন্টে হোঁচট খেতে হয়। সামরিক বাহিনীর একটি শাখার সেনাপতি হয়ে তিনি কেন এমন প্রেস প্রোপাগাণ্ডায় নেমে পড়লেন? এটাতো রাজনৈতিক প্রশাসন বা রাজনৈতিক নেতৃত্বের কাজ। এসব ব্যাপারে কথা যদি বলতেই হয় তাহলে বলবেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী অথবা প্রধানমন্ত্রী। ঘটনাচক্রে শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী তো রয়েছেনই, তিনি আবার প্রতিরক্ষামন্ত্রীও বটে। ভারতে প্রতিরক্ষামন্ত্রী হলেন জর্জ ফার্নান্দেজ, প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী নন। আমাদের দেশে যেহেতু প্রধানমন্ত্রী প্রতিরক্ষামন্ত্রীও বটে তাই জনগণ জঙ্গী বিমান ক্রয় সম্পর্কে ব্যাখ্যা বা বক্তব্য প্রত্যাশা করেছিল শেখ হাসিনার নিকট থেকে। যদি তিনি বেশী ব্যস্ত থাকেন তাহলে অন্য কোনো মন্ত্রীকে এ সম্পর্কে বক্তব্য দেয়ার জন্য দায়িত্ব দেয়া যেতো। কিন্তু সেসব কিছুই হয়নি। বিমানবাহিনী প্রধান নিজের কাঁধেই রাজনৈতিক নেতাদের দায়িত্ব তুলে নিয়েছেন। এর ফলে আমাদের জন্য হয়েছে যত অসুবিধা। একজন রাজনৈতিক নেতা মন্ত্রী হিসেবেও কোন বক্তব্য দিলে তাকে আমরা কঠোর ভাষায় সমালোচনা করতে পারি। বিমান বাহিনীর প্রধানকে তাই বলে কি পলিটিক্যাল মিনিষ্টারের মতো কঠোর ভাষায় সমালোচনা করা যাবে? একটি উদাহরণ দিচ্ছি। একটি বাংলা দৈনিককে ইন্টারভিউ দিতে গিয়ে জনাব জামাল উদ্দিন বলেছেন যে মিগ-২৯ কেনা নিয়ে শুধু ভারত আর ভারত। কিন্তু কই, গত ২৮ বছরে তো ভারতকে নিয়ে এ সমালোচনা শুনলাম না? আমার মনে হয়েছে যে বিমানবাহিনী প্রধানের এ ধরনের কথা বলা ঠিক হয়নি। কারণ ভারত রাশিয়া তথা রুশ-ভারত অক্ষশক্তি, আমেরিকা, পাকিস্তান, তখন এসব দেশের নাম রাজনৈতিক কারণে এসে যায়। একটি দেশের অস্ত্রপাতি দেখে বোঝা যায় যে, সেই দেশটি পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে কোন শিবিরে আছে। পাকিস্তানের অস্ত্র ভাণ্ডার দেখে বোঝা যায় যে এ দেশটি কোন শিবিরের সাথে জড়িত। দেখা যায় যে তাদের সমস্ত অস্ত্রের উৎস

www.pathagar.com

হলো চীন ও আমেরিকা। কোনো গুরুত্বপূর্ণ রুশ অস্ত্র পাকিস্তানের সমর ভাণ্ডারে নেই। ভারতীয় সামরিক বাহিনীর মেরুদন্ডের ৮০ শতাংশই গঠিত হয়েছে রুশ অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে। সুতরাং জামাল উদ্দিন চান আর নাই চান, সমরস্ত্র সংগ্রহের বেলায় আমেরিকা, রাশিয়া, চীন, ভারত, পাকিস্তান এসব প্রশ্ন উঠবেই।

।। দুই ।।

তবুও বিমান বাহিনী প্রধানকে একটি কারণে ধন্যবাদ দিতে হয়। সেটা হলো এই যে তাঁর এসব বিশাল বিশাল ইন্টারভিউয়ে অনেক তথ্য প্রকাশ করেছেন যেগুলো আগে এত পরিষ্কারভাবে জনগণের জানা ছিলো না। কিন্তু তাঁর কতগুলো তথ্য আপাতঃদৃষ্টে স্ববিরোধী মনে হয়। আবার অন্য সময় মনে হয় যে তিনি কর্তার ইচ্ছায় কর্ম করেছেন। কোনটি সঠিক আসলে সেটা জানি না। তবে উন্নত ধরনের জঙ্গী বিমানের মূল্য বলতে গিয়ে তিনি যেভাবে দাম বলেছেন তার মধ্যে একটি বিরাট ফাঁক থেকে যায়। মনে হয় যে, এই বিষয়ে তিনি প্রয়োজনীয় হোমওয়ার্ক করেননি। ইংরেজী পত্রিকার সাথে সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন যে, একটি মার্কিন এফ-১৬ জঙ্গী বিমানের দাম ৩০ থেকে ৪০ মিলিয়ন ডলার। আবার বাংলা কাগজে বলেছেন ঐ জঙ্গী বিমানটির দাম ৪০ মিলিয়ন ডলার। অনুরূপভাবে ইংরেজী কাগজে বলেছেন যে, একটি ফরাসী মিরাজ ২০০০-এর দাম ৪০ মিলিয়ন ডলারের বেশি কিন্তু বাংলা কাগজটিতে বলেছেন যে, মিরাজের দাম ৬০ মিলিয়ন ডলার। ৪০ থেকে ৬০ মিলিয়ন ডলার অর্থাৎ ২০ মিলিয়ন ডলার বা ১০০ কোটি টাকার ফারাক থাকবে কেন? অনুরূপভাবে এফ-১৬ এর ব্যাপারেও ফারাকের পরিমাণ ১০ মিলিয়ন ডলার বা ৫০ কোটি টাকা। এসব কথা কি তিনি রেকর্ড চেক করে বলেছেন? নাকি তিনি শোনা কথা বলছেন?

বাংলাদেশে মিগ-২৯ এর দাম নিয়েও কথা ওঠে। তিনি বলেছেন যে, আমরা খুব সস্তায় মিগ-২৯ জঙ্গী বিমান কিনেছি। এক একটা বেসিক বিমান কিনতে বাংলাদেশের খরচ পড়লো ১১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। অথচ একই বিমান রাশিয়ার নিকট থেকে মালয়েশিয়া কিনেছে ২২ মিলিয়ন ডলার দিয়ে এবং ভারত কিনেছে ২৩ মিলিয়ন ডলার দিয়ে। অর্থাৎ প্রতিটি বিমান বাংলাদেশ ১১ মিলিয়ন কমদামে পেয়েছে। ৮টি প্লেন মালয়েশিয়ার তুলনায় বাংলাদেশ ৮৮ মিলিয়ন ডলার অর্থাৎ ৪৪০ কোটি টাকা কমদামে কিনেছে। বিমান বাহিনী প্রধানের এসব তথ্য আষাঢ়ে গল্পের মত মনে হয়। যদি তার তথ্যসমূহ সত্য হয় তাহলে বলতে হবে যে মিগ-২৯ জঙ্গী বিমানের কোনো ফিক্সড প্রাইস নেই। এই বিমানটি নিয়ে রাশিয়া মাছের বাজার বসিয়েছে । যার কাছে যে দাম পাওয়া যায় তাই সই। মাছের ভাগ মেছুয়া প্রথমে ১০০ টাকা হাঁকে। তারপর দরাদরি করলে ৪০ টাকাতেও পাওয়া যায়। তবে যার চক্ষুলজ্জা আছে তিনি ভাবেন যে দাম যখন ১০০ টাকা হেঁকেছে তখন ৭০ টাকার কমে বলি কিভাবে এবং তার কাছে মাছের ভাগটি ৭০ টাকাই বিক্রি হয়ে যায়। অর্থাৎ ঐ মাছের ভাগের দাম যেমন ৭০ টাকা, তেমনি ৪০ টাকাও বটে। মিগের দামও তাই। ২২ মিলিয়ন ডলারেও সই, আবার ১১ মিলিয়ন ডলারেও সই।

www.pathagar.com

জনাব জামাল উদ্দিনের ইন্টারভিউ থেকেই জানা গেল যে, রাশিয়া প্রথমে দাম হেঁকেছিল ২৮৯ মিলিয়ন ডলার। এরপর দরাদরি করতে করতে ঐ দাম এসে ঠেকলো ১২৪ মিলিয়ন ডলারে। অর্থাৎ দরদামের পর রুশরা দাম কমালো ১৬৪ মিলিয়ন ডলার। মাছের বাজারের চেয়েও জঘন্য অবস্থা রাশিয়ার বিমান বাজার। টাকার হিসাবে দরাদরিটা দেখুন। ওরা প্রথমে দাম চাইল ২৮৯ মিলিয়ন ডলার। অর্থাৎ ১৪৪৫ কোটি টাকা। দামাদামী করতে করতে অবশেষে 'ভাও' হলো ৬২০ কোটি টাকা। অর্থাৎ প্রথমে যে দাম ওরা হেঁকেছিল তার চেয়ে ৮২০ কোটি টাকা দাম কমিয়ে চূড়ান্ত দাম নির্ধারিত হলো ৬২০ কোটি টাকা। দরাদরি করলে যারা দাম কমায় অর্ধেকেরও বেশী, তাদের বাজারকে মাছের বাজারের চেয়েও খারাপ বলবেন না কেন? যাদের সাথে দরাদরি করলে ১৪৪০ কোটি টাকা থেকে ৬২০ কোটি টাকায় কমাতে পারে। তাদের সাথে আরো বেশী দরাদরি করলে হয়তো আরো বেশি দাম কমতো। সুতরাং এক একটি বেসিক প্লেনের দাম ১১ মিলিয়ন ডলারই সঠিক সেটাই বা এখন কিভাবে বলি? মালয়েশিয়া এক একটি প্লেন ২২ মিলিয়ন ডলার দিয়ে কিনেছে বলে জনাব জামাল উদ্দিন জানিয়েছেন। এ খবর যদি সত্যি হয় তাহলে বলতে হবে যে ওরা রুশদের চিনতে পারেনি। কিন্তু বাঙালীরা বড় কঠিন চিজ। মালয়েশিয়ানরা যেমন রুশদের চিনতে পারেনি তেমনি রুশরাও বাঙালীদের চিনতে পারেনি।

।। তিন ।।

জনাব জামাল উদ্দিন বলেছেন যে, বাংলাদেশের নাকি দুই স্কোয়াড্রন অর্থাৎ ৩২টি জঙ্গী বিমান ঘাটতি আছে। আপাততঃ ৩২টির মধ্যে ৮টি বিমান ক্রয় করা হলো। অবশিষ্ট ২৪টি বিমান পরে কেনা হবে। তার নিকট থেকে আরো জানা গেল যে, সরকার নাকি ৩২টি বিমান কেনার অনুমোদন দিয়েছে। অর্থ সংকটের কথা চিন্তা করে প্রথম পর্যায়ে ১৬টি বিমান কেনার সিদ্ধান্ত হয়েছে। তার মধ্যে এ মুহূর্তে অর্থ সংকটের কথা বিবেচনা করে ৮টি রুশ মিগ-২৯ জঙ্গী বিমান কেনা হল। অবশিষ্ট ৮টি চীনা বিমান এফ-৭ এগুলো কেনা হবে দু'বছর পর। জনাব জামালউদ্দিনের কথা থেকেই জানা গেল যে চীনা এফ-৭ বিমানও সুপারসনিক বিমান। বিমানটিও মিগ-২৯ এর মত গ্রাউন্ড এ্যাটাক করতে পারে আবার ইন্টারসেপশন বা আকাশ যুদ্ধ চালাতে পারে। চীনা-এফ জঙ্গী বিমানের বড় ধরনের কোন গলদ বা বিরাট কোন দূর্বলতা এ পর্যন্ত কেউই উল্লেখ করেননি।

এসব তথ্যের পটভূমিতে কয়েকটি প্রশ্ন এসে যায়। আমাদের যখন এতই অর্থ সংকট তখন আমাদের নীতি হওয়া উচিত সীমিত অর্থ দিয়ে যতদূর সম্ভব বেশী সংখ্যায় ভালমানের জঙ্গী বিমান ক্রয় করা। জনাব জামাল উদ্দিনের তথ্য থেকেই দেখা যাচ্ছে যে বাংলাদেশ যদি এফ-৭ জঙ্গী বিমান কিনতো তাহলে ঐ ১২৪ মিলিয়ন ডলার দিয়েই ১৬টি জঙ্গী বিমান কিনতে পারতো। এখন কেনা হয়েছে মাত্র ৮টি বিমান। অবশিষ্ট ৮টি বিমান কবে কেনা হবে? জনাব জামাল উদ্দিন বলেছেন যে, দুই বছর পরে। অর্থাৎ ২০০১ সালের জুলাই মাসে। বিমান বাহিনী প্রধান কিভাবে এত নিশ্চিত হলেন যে,

www.pathagar.com

২০০১ সালের জুলাই মাসেও আওয়ামী লীগই ক্ষমতায় থাকবে? কোনো বড় ধরনের গণআন্দোলন বা গণঅভ্যুত্থানের কথা বাদ দিলেও স্বাভাবিক সাংবিধানিক প্রক্রিয়াতেই ২০০১ সালের মার্চ মাসে শেখ হাসিনার সরকারকে পদত্যাগ করতে হবে এবং নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য কেয়ারটেকার সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। নির্বাচনে কোন দল ক্ষমতায় আসবে সেটা জামালউদ্দিন সাহেব যেমন জানেন না, তেমনি আমরাও জানি না। যদি আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় না আসে তাহলে তাঁদের বর্তমান সিদ্ধান্তই যে বহাল থাকবে তারই বা গ্যারান্টি কি? এ বছর যখন ৮টি বিমান কেনা হচ্ছে তখন পরের বছর অবশিষ্ট ৮টি বিমান কেনার সিদ্ধান্ত নেয়া হলো না কেন? বিমান বাহিনী প্রধানইতো বলেছেন যে, পুরো দামটা একবারে দিতে হচ্ছে না। প্রথম তিন মাসের মধ্যে ৩০ শতাংশ ডাউন পেমেন্ট। অবশিষ্ট ৭০ শতাংশ ৯ বছরে দিতে হবে। একই ধরনের শর্তে আগামী বছর ৮টি এফ-৭ বিমান কেনার সিদ্ধান্ত হল না কেন? কথাটা তো আরো অন্য ভাবে বলা যায়। যে বিমানটির দাম বেশী সেই রুশ বিমান আগে কেনার সিদ্ধান্ত হলো কেন? তাও আবার মাত্র ৮টি। পক্ষান্তরে সেই একই দামে যেখানে ১৬টি বিমান কেনা যেত সেই বিমান কেনার সিদ্ধান্ত দুই বছর পিছিয়ে দেয়া হলো কেন? পিছিয়ে এমন একটি সময়ে নেয়া হলো যখন আওয়ামী লীগের পক্ষে ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তন সুনিশ্চিত নয়। তাহলে একথা বলা কি অযৌক্তিক হবে যে, আওয়ামী লীগ ভেবেছে, ক্ষমতায় থাকতে থাকতেই সামরিক বাহিনীতে রুশ জঙ্গী বিমান কিনতে হবে। পরে যদি সময় পাওয়া না যায়? সে জন্যই অনেক বেশী দামে এত নগণ্য সংখ্যক বিমান কেনা হয়েছে। এই দৃষ্টিকোন থেকে বিচার করলে মিগ-২৯ বিমান ক্রয় করার সিদ্ধান্ত যতটা সামরিক তার চেয়েও বেশী রাজনৈতিক। রাজনৈতিক বিবেচনাতেই রুশ-২৯ জঙ্গী বিমান কেনার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। সামরিক সুবিধা বিচেনায় নয়। বিমান বাহিনী প্রধান রাজনীতির এই প্যাচটি বুঝতে পেরেছেন কিনা জানিনা। তাই বলছি যে, একজন পলিটিশিয়ানের স্টাইলে এভাবে কথা বলা তাঁর ঠিক হচ্ছে কিনা। আমি তো পাকিস্তান, ভারত বা ইংল্যান্ড, আমেরিকার কোন কর্মরত সামরিক অফিসারকে এভাবে একের পর এক প্রেস ইন্টারভিউ দিতে দেখিনি।

বিমান বাহিনী প্রধানের আরেকটি তথ্যের সাথে একমত হওয়া যাচ্ছে না। তিনি বলেছেন যে, বিগত ২৮ বছর ধরে রুশ বিমান ব্যবহার করা হচ্ছে। এতদিন এটা নিয়ে কোনো হৈ চৈ হলো না, আজ কেন হচ্ছে? জামালউদ্দিন সাহেবের এই কথাটি অত্যন্ত আপত্তিকর। শব্দটি হৈ চৈ নয়, সমালোচনা। সমালোচনা করছেন বিরোধী দলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া, জামায়াতে ইসলামী, জাতীয় পার্টি প্রভৃতি রাজনৈতিক দল। বিএনপি এবং জামায়াত বা জাতীয় পার্টি মিগ বিমান কেনার সমালোচনা করলে তার জওয়াব দেবে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ। রাজনৈতিক ঝগড়াঝাটি হবে তাদের মধ্যে। জামাল উদ্দিন সাহেব এই রাজনৈতিক ঝগড়ায় নিজেকে জড়াচ্ছেন কেন? বলতে চাইলে এক্সটেনশন না নিয়ে তো তিনি পল্টন ময়দানে নেমে পড়তে পারতেন এবং এখনকার চেয়েও বেশী গলা চড়িয়ে কথা বলতে পারতেন।

সূত্র ঃ দৈনিক সংগ্রাম তাং ২৬-৭-৯৯

www.pathagar.com

গণচীন থেকে এফ-৭ জঙ্গী বিমান ক্রয় নিয়ে একটি মিথ্যাচার

বাংলাদেশে প্রতিরক্ষা বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সমস্ত জারিজুরি ফাঁস হয়ে গেছে, বাংলাদেশে নিযুক্ত গণচীনের রাষ্ট্রদূত মিঃ চুংগুয়ি এর একটি বক্তব্যে। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রতিরক্ষা মন্ত্রীও বটে। চীনা রাষ্ট্রদূত বলেছেন যে, বর্তমান বাংলাদেশ সরকার গণচীন থেকে জঙ্গী বিমান কেনার কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেনি। এ ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত গণচীন সরকারকে জানানোও হয়নি। চীনের সাথে কোনরূপ আলাপ আলোচনাও অনুষ্ঠিত হয়নি। গত বুধবার ২১শে জুন এক শ্রেণীর পত্র-পত্রিকায় চীনা রাষ্ট্রদূতের মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছে। বাংলাদেশে ঐ রাষ্ট্রদূতের মেয়াদ শেষ হয়েছে। তিনি বেগম খালেদা জিয়ার সাথে মঙ্গলবার ২০ শে জুন এক বিদায়ী সাক্ষাতে মিলিত হন। ঐ সাক্ষাতকালে বেগম জিয়ার কাছে মিঃ চুংগুয়ি উপরোক্ত মন্তব্য করেছেন বলে বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত রিপোর্টে বলা হয়েছে। চীনা রাষ্ট্রদূতের এই মন্তব্য প্রকাশিত হওয়ার পর ঢাকার রাজনৈতিক মহল চরম বিস্মিত হয়েছেন। কারণ গত বছর রাশিয়ার নিকট থেকে মিগ-২৯ জঙ্গী বিমান ক্রয় নিয়ে সারাদেশ জুড়ে যখন প্রবল আলোচনা ও সমালোচনার ঝড় বইছিল। তখন প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে বিমানবাহিনীর প্রধান পর্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় একটি সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। তারা বলেন যে সরকার বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর জন্য মোট ১৬টি জঙ্গী বিমান ক্রয় করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এর ৮টি হলো রুশ মিগ-২৯। অপর ৮টি হবে চীনা এফ-৭। মিগ বিমান ইতিমধ্যেই কেনা হয়ে গেছে। ৪টি মিগ-২৯ ইতিমধ্যে বাংলাদেশে এসে পৌছেছে। আগামীমাস অর্থাৎ জুলাই মাসের মধ্যে অবশিষ্ট ৪টি মিগ-২৯ জঙ্গী বিমান ঢাকায় এসে পৌছবে। সমরাস্ত্র ক্রয় ও সংগ্রহ সম্পর্কে যাদের বিন্দুমাত্র জ্ঞানও আছে তারা ভাল করেই জানেন যে সমরাস্ত্র ক্রয় বিশেষ করে জঙ্গী বিমান সংগ্রহ একটি সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। এ সম্পর্কে যারা কিছুটা খোঁজ-খবর রাখেন তারা জানেন যে জঙ্গী বিমান ক্রয় করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সরবরাহকারী দেশের সাথে আলাপ-আলোচনা অনুষ্ঠান এবং সেই বিমান স্বদেশে এসে পৌছা এই সমগ্র প্রক্রিয়ায় ৩ থেকে ৪ বছর সময় লাগে। অথচ রাশিয়া থেকে মিগ-২৯ ক্রয় এবং সেই বিমান ঢাকায় এসে পৌছতে এক বছরও লাগলো না। যেন সমগ্র বিষয়টি ভোজবাজির মত ঘটে গেল।

www.pathagar.com

অথচ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং বিমানবাহিনী প্রধান এয়ার ভাইস মার্শাল জামালউদ্দিনের বক্তব্য অনুযায়ী একই সাথে এবং একই সময়ে রাশিয়া থেকে মিগ-২৯ এবং গণচীন থেকে এফ-৭ কেনার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

তাহলে মিগ-২৯ বাংলাদেশে এসে ঢাকার আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে, আর চীনের এফ-৭ বিমান কেনার জন্য কোন আলাপ আলোচনাই শুরু হয়নি। এটা কেমন করে সম্ভব? এক যাত্রায় দুই রকম ফল হয় কিভাবে? আসল ব্যাপার হলো আওয়ামী সরকারের ডবল স্ট্যান্ডার্ড। ওপরে এক ভেতরে আরেক। চীনা রাষ্ট্রদূতের এই উক্তির পর ব্যাপারটি এখন পরিষ্কার হয়ে গেছে। আওয়ামী সরকার চীন থেকে জঙ্গী বিমান ক্রয় করার চিন্তা-ভাবনা কোন সময়ই করেনি। ওটা ছিলো স্রেফ একটি ব্লাফ। রাশিয়া থেকে কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে মিগ-২৯ জঙ্গী বিমান কেনার বিরুদ্ধে দেশ যখন প্রতিবাদমুখর তখন বিষয়টিকে ব্যালান্স করার জন্যই চীন থেকে বিমান কেনার সংবাদটি বাজারে ছাড়া হয়েছিল। কিন্তু চীনা রাষ্ট্রদূতের এই চাঞ্চল্যকর তথ্যের পর প্রমাণ হয়ে গেল যে, চীন থেকে যুদ্ধ বিমান কেনার ঘোষণাটি ছিল কতবড় ধাপ্পা। তবে অবাক হতে হয় এই ভেবে যে, রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায়ে এতবড় ধাপ্পাবাজি কিভাবে সম্ভব। তবে প্রতিরক্ষা ব্যাপারে বর্তমান সরকার বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে বিগত ৪ বছর ধরে যেসব কথা বলে আসছেন সেসব কথা বিশ্লেষণ করলে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, দেশের প্রতিরক্ষা বিষয়েও এই সরকার রাজনীতি করে এবং দেশবাসীকে মিথ্যা তথ্য দেয়।

।। দুই ।।

আওয়ামী সরকার ক্ষমতায় যাওয়ার পরপরই একটি নতুন আবিষ্কার দেশবাসীকে উপহার দেন। সেই আবিষ্কারটি হলো এই যে, বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর পিতা মরহুম মুজিবুর রহমান নাকি বাংলাদেশের জন্য একটি শক্তিশালী ও আধুনিক সশস্ত্রবাহিনী গঠন করার জন্য একাধিক পদক্ষেপ গ্রহন করেন। সামরিক বাহিনীর জন্য তার আকুতি এত তীব্র ছিল বলেই তার ছোট ছেলে শেখ জামাল ১৯৭৫ সালে সেনাবাহিনীতে কমিশনড অফিসার হিসাবে যোগ দেয়। সেনাবাহিনীর জন্য শেখ মুজিবের কতখানি দরদ ছিল তার প্রমান পাওয়া যায় প্রখ্যাত সাংবাদিক এ্যান্থনী মাসকার্নহাস রচিত গ্রন্থ 'এলিগেসি অব ব্লাড' গ্রন্থের একস্থানে তিনি লিখেছেন, "মিলিটারীর সব কিছুতেই শেখ মুজিবের দারুণ ঘৃণা জন্মে গিয়েছিল মুজিব আর তার মন্ত্রীবর্গ সেনাবাহিনীর ভূমিকা সম্পর্কে উদাসীন হয়ে পড়েন। দেশ পরিচালনার দায়িত্বভার নেয়ার পর একমাস যেতে না যেতেই তিনি ভারতের সাথে পঁচিশ বছর মেয়াদী এক মৈত্রী ও পারস্পারিক সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষর করেন। ১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে শেখ মুজিব নিজেই আমাকে (মাসকার্নহাস) বলেছিলেন যে, তিনি একটি শক্তিশালী সেনাবাহিনী গঠনের বিরুদ্ধে। শেখ মুজিব চেয়েছিলেন সেনাবাহিনীকে নিঃশেষ করে দিতে।"

www.pathagar.com

কঠোর সত্য হলো এই যে, শেখ মুজিব বাংলাদেশে সামরিক বাহিনী গঠনের জন্য কিছুই করেননি। মুক্তিযুদ্ধ শেষ হলে মুক্তিবাহিনী দেশে ফিরে আসে। মুক্তিবাহিনীতে ৮ হাজার নিয়মিত বাহিনীর সদস্য ছিলেন। এরা স্বাভাবিকভাবেই সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে সামরিক বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত হন। হয়তো সশস্ত্র বাহিনী এই অবস্থাতেই থাকতো এবং এই আকার আকৃতি নিয়েই সেনাবাহিনীকে সন্তুষ্ট থাকতে হতো। কিন্তু পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশীদের প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা চূড়ান্ত হলে ২৮ হাজার বাঙ্গালী সৈন্য পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশে ফিরে আসে। পাকিস্তান থেকে ফেরত আসা বাঙ্গালী সৈন্য এবং মুক্তিযুদ্ধের পর সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত বাঙালী সৈন্য এই দুই ক্যাটাগরি মিলেই বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ভিত রচিত হয়। এর বাইরে শেখ মুজিব সেনাবাহিনীর জন্য কিছুই করেননি। তার বড় প্রমাণ মিশর থেকে উপহার হিসেবে প্রাপ্ত ট্যাংক নিয়ে সেনাবাহিনীর সাথে নিদারুণ বৈষম্যমূলক আচরণ। স্বাধীনতার পর আওয়ামী সরকার সেনাবাহিনীর প্রতি যে কত বড় বিমাতাসুলভ আচরণ করেছেন তার বড় প্রমাণ হল রক্ষী বাহিনী গঠন। একটি নিয়মিত সেনাবাহিনী থাকা সত্ত্বেও তখনকার আওয়ামী সরকার রক্ষীবাহিনী গঠন করে।

১৯৭৩ সালে আরব-ইসরাইল যুদ্ধের পর মিশরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত বাংলাদেশকে ৩০টি ট্যাংক উপহার দেন। কিন্তু সবচেয়ে অবাক ব্যাপার হলো এই যে, তৎকালীন আওয়ামী সরকার এইসব ট্যাংক সেনাবাহিনীকে না দিয়ে রক্ষী বাহিনীকে দেয়। যে অস্ত্রটি প্রধানত সেনাবাহিনীর সেই অস্ত্র অর্থাৎ ট্যাংক (মিশর থেকে প্রাপ্ত) যখন সেনাবাহিনীকে না দিয়ে রক্ষী বাহিনীকে দেয়া হয় তখনই বোঝা যায় যে, শেখ মুজিবের নেতৃত্বাধীন সরকার সেনাবাহিনীকে বিশ্বাস করত না। তাই তারা সেনাবাহিনীর পাল্টা রক্ষী বাহিনী গড়ে তুলেছিল।

শেখ মুজিবের আমলে '৭২-'৭৫ সালে যে অস্ত্র সংগ্রহ করা হয়েছিল তার একটি তালিকা আমাদের হাতে এসেছে। ঐ তালিকা থেকে দেখা যায় যে, শেখ মুজিবের শাসনামলে ইংল্যান্ড থেকে মাত্র দু'টি হেলিকপ্টার সংগ্রহ করা হয়েছিল। হেলিকপ্টার দুটির নাম ছিল 'ওয়েসেক্স'। এছাড়া অবশিষ্ট সমস্ত অস্ত্র সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভারত থেকে আনা হয়েছিল। এগুলোর মধ্যে ভারত থেকে আনা হয়েছিল ৮টি পরিবহন বিমান, ৪টি হেলিকপ্টার, ৩০টি কামান এবং দুইটি গানবোট। সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে আনা হয়েছিল ১টি পরিবহন বিমান, ৬টি হেলিকপ্টার গানশীপ, ১০টি মিগ-২১ প্রশিক্ষণ জঙ্গী বিমান, ২টি মিগ-২১ পরিবহন বিমান। ১৬টি ট্যাংক এবং ৭২টি এয়ার টু এয়ার ক্ষেপণাস্ত্র (তথ্য সূত্রঃ Arms Transfer to the third world, 1971-1985 এবং SIPRI Year Book,1990)। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে. শেখ মুজিব তাঁর সাড়ে ৩ বছরে

www.pathagar.com

বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীকে সম্পূর্ণভাবে ভারত নির্ভর করেছিলেন। তাঁর আমলে নৌবাহিনীতে কোন সাবমেরিন, ডেস্ট্রয়ার, ফ্রিগেট ছিল না। জিয়ার শাসনামলেই মূলত একটি আধুনিক সেনাবাহিনীর অবকাঠামো গড়ে উঠেছিল। তেমনি জাতীয় গ্র্যান্ড স্ট্র্যাটেজিতেও গ্রহণ করা হয়েছিল স্বাধীন ও যুগোপযোগী নীতিমালা। উল্লেখ্য ১৯৭৪-৭৫ সালে যেখানে প্রতিরক্ষা খাতে বরাদ্দ ছিল মাত্র ৭৫ কোটি টাকা সেখানে প্রেসিডেন্ট জিয়া ১৯৭৫-৭৬ অর্থবছরে তা বৃদ্ধি করে ২০৬ কোটি টাকা করেন যা পরবর্তী ১৯৭৬-৭৭ অর্থবছরে উন্নীত হয় ২১৯ কোটি টাকায়। (তথ্যসূত্র ঃ মওদুদ আহম্মেদ, ডেমোক্রেসি এ্যান্ড দি চ্যালেঞ্জ অব ডেভলপমেন্ট পৃষ্ঠা ৩৬)। লন্ডন থেকে প্রকাশিত 'মিলিটারী ব্যালান্স' থেকে দেখা যায় যে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর বিকাশ ঘটেছে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের আমলে। আলোচ্য মিলিটারী ব্যালান্স থেকে দেখা যায় যে ১৯৭৫-৯৬ সময়ে বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীর শক্তি ৩৬ হাজার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১ লাখ ১৭ হাজারে উন্নীত হয়েছে। অনুরূপভাবে নৌসেনা ৫০০ জন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১০ হাজার ৫০০ তে দাঁড়িয়েছে। ট্যাংকের সংখ্যা ৩৩টি থেকে ১৮০টি। জঙ্গী বিমান ১২টি থেকে ৮টি। নৌবাহিনীতে ফ্রিগেট একটিও ছিল না। ৯৬ সালে ফ্রিগেটের সংখ্যা দাঁড়ায় ৪টি। ৭টি হেলিকপ্টার বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৩১টি। মোটকথা ৭৬ এর তুলনায় পরবর্তী ২০ হাজার সামরিক বাহিনীর অস্ত্র ও জনশক্তি দুটোই বেশ কয়েকগুণ বেড়েছে। তবে এখানে একটি কথা স্পষ্টভাবে বলা দরকার। বিগত ২০ বছরে বৃদ্ধি যা ঘটেছে তা যথেষ্ঠ নয়। ১৩ কোটি লোকের একটি দেশে সামরিক বাহিনীর এই জনবল এবং অস্ত্রবল আরো অনেক বেশী হওয়া দরকার ছিল। কিন্তু সেটা হয়নি। যতটুকু হয়েছে সেটা মুজিব আমলের তুলনায় রীতিমত প্রশংসনীয়। সবচেয়ে উল্লেখ করার বিষয় হলো এই যে, ৭৬ থেকে ৯৫ এই ২০ বছরে সেনাবাহিনীকে সজ্জিত করা হয়েছে সম্পূর্ণ চীনা অস্ত্রে। সেনাবাহিনীর ট্যাংক, বিমান বাহিনীর জঙ্গী বিমান, নৌবাহিনীর ফ্রিগেট, উপকূলীয় রণতরী প্রভৃতি সব কিছুই গণচীনের।

।। তিন।।

শেখ হাসিনার আমলে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ইউটার্ন বা এবাউট টার্ন করে। জেনারেল এরশাদের সময় ৪০টি জঙ্গী বিমান পাকিস্তান প্রদান করে। শোনা যায় যে, এগুলো নাকি ছিল পাকিস্তান থেকে অনুদান। পরে গণচীন পাকিস্তানের অস্ত্রভাণ্ডারে ঐ সব অস্ত্র নাকি পূরণ করে দেয়। '৯৬ সালের জুন মাসের পর প্রতিরক্ষার চিত্র সম্পূর্ণ উল্টে গেছে। এখনতো আর গণচীন থেকে কোন অস্ত্র আসছে না। পাকিস্তান থেকে অস্ত্র আসাতো পরের কথা, সম্পর্ক এখন রীতিমত তিক্ত। বিগত ৪ বছরে সামরিক বাহিনীর জন্য বলতে গেলে কোন অস্ত্রই আনা হয়নি। এর আগে পুরাতন বা অচল হওয়ার ফলে

www.pathagar.com

যেসব বিমান আউট অব সার্ভিস হচ্ছে সেগুলো পূরণ করার জন্যই রুশ মিগ-২৯ জঙ্গী বিমান কেনা হয়েছে। সেনাবাহিনীর জন্য ভারত থেকে 'অশোক লিল্যান্ড' ট্রাক আনা হচ্ছে। অর্থাৎ ঘড়ির কাঁটা সম্পূর্ণ উল্টোদিকে ঘুরতে শুরু করেছে। সোজা কথায় রুশ-ভারত অক্ষশক্তির পুনরুত্থান ঘটেছে। আমেরিকার নিকট থেকে আর্থিক সাহায্য লাভের জন্য তাদেরকে তোয়াজ করা হচ্ছে। কিন্তু সামরিক বাহিনী বা সামরিক বিষয়াদিতে আমেরিকা কোন ভূমিকা রাখতে পারছে না। এখানে মূল চালিকাশক্তি হলো ভারত। বাংলাদেশ ভারতের আস্তিনের তলে আশ্রিত। তাই 'হানা' বা 'সোফা' নামক মার্কিন প্রতিরক্ষা সহযোগিতা চুক্তিতে বাংলাদেশ স্বাক্ষর দিতে পারেনি। তার কারণও হলো সেই ভারত। ভারত সমরাস্ত্র উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। তাই বাংলাদেশ ভারতের সম্মতি ক্রমেই মিগ-২৯ জঙ্গী বিমান কিনেছে।

এই রাজনৈতিক পররাষ্ট্রীয় ও সামরিক পটভূমিতে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, রুশ-ভারত অক্ষশক্তির অসম্মতিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষে চীন থেকে সমরাস্ত্র ক্রয় করা প্রায় অসম্ভব। নিজের সীমাবদ্ধতা ঢাকার জন্য চীন থেকে বিমান কেনার ছেলে ভুলানো কৌশল তিনি অবলম্বন করেছেন। পৃথিবী অনেক দূর এগিয়ে গেছে। এসব কৌশল এখন অচল।

সূত্র ঃ দৈনিক সংগ্রাম তাং ২৩-৬-২০০০

www.pathagar.com

৪টি মিগ-২৯ অচল ঃ স্যাবর এফ-৮৬ এ-৫ এফ-৬ এফ-৭ এবং মিগ-২১এর প্রসঙ্গ কথা

মিগ-২৯ নিয়ে খবরের কাগজে যত লেখালেখি হচ্ছে ডিফেন্স পারচেজ নিয়ে তত লেখালেখি অতীতে আর কখনও হয়নি। তারপরেও তো শত শত কোটি টাকা ব্যয় করে আটটি রুশ মিগ-২৯ জঙ্গী বিমান কেনা হল। তবে এ ব্যাপারে একটি ঘটনা ঘটে যেটাকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় একটি ওয়েলকাম ফিচার হিসেবে গণ্য করা যায়। অতীতে প্রতিরক্ষা ব্যয় বা ডিফেন্স পারচেজের বিষয়টি ছিল মোটামুটি একটি টাবু। পাকিস্তান আমলেতো এ সম্পর্কে কিছুই জানা যেত না। সশস্ত্র বাহিনীতে কি কি ধরনের জঙ্গী বিমান, ট্যাঙ্ক, যুদ্ধজাহাজ, বিমান, রকেট ইত্যাদি রয়েছে। সে সম্পর্কে সাধারণ মানুষের কোন ধারণাই ছিল না। আমাদের মতো দুই-চারজন ব্যক্তি, যারা এগুলো নিয়ে জানার চেষ্টা করেছি, তারা এক সময় জানতে পারি যে, পাকিস্তানের বিমান বাহিনীতে এক ধরনের বিমান রয়েছে যার নাম স্যাবর এফ-৮৬। পাকিস্তান বিমান বাহিনীতে তখন কিছু কিছু বাঙালী পাইলট ছিলেন। ওরা এই স্যাবর বিমানটি উড়িয়েছেন। ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধে আমেরিকায় তৈরী এই স্যাবর বিমান অংশগ্রহণ করে। বাংলাদেশকে কেন্দ্র করে সংঘটিত ১৯৭১ সালের পাক-ভারত যুদ্ধে ঢাকার আকাশে আমরা এই স্যাবর জঙ্গী বিমানকে উড়তে দেখেছি। বাংলাদেশ যুদ্ধে পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী পরাজিত হলে অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে ওরা স্যাবর জঙ্গী বিমানও ফেলে রেখে যুদ্ধবন্দী হয়ে ভারতে চলে যায়। আক্ষরিকভাবে বলতে গেলে এসব পরিত্যক্ত স্যাবর এফ-৮৬ বিমানগুলো নবজাতক বাংলাদেশের বিমান বাহিনীর বিমান হিসেবে পরিগণিত হয়।

এরপর তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে রুশ-ভারত অক্ষশক্তির সদস্য হিসেবে বাংলাদেশকে এক কোয়াড্রন অর্থাৎ ১২টি মিগ-২১ বিমান সরবরাহ করা হয়। এই প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, বাংলাদেশের জন্মলগ্নে রুশ মিগ-২১ সুপারসনিক জঙ্গী বিমানই স্বাধীন বাংলাদেশের বিমান বাহিনীর ভিত রচনা করে। এর সমর্থক হিসেবে ছিল সাবসনিক জঙ্গী বিমান মার্কিন স্যাবর এফ-৮৬। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, টেকনিক্যাল পরিভাষায় সুপারসনিক অর্থ হল শব্দের চেয়ে দ্রুতগতিসম্পন্ন। আর সাবসনিক হল শব্দের গতির চেয়ে কম গতি। বিমান বাহিনীর গতিবেগ একটি টেকনিক্যাল পরিভাষার মাধ্যমে বর্ণনা করা হয়। পরিভাষাটি হল 'ম্যাক'। ম্যাক-১, ম্যাক-২ ইত্যাদি শব্দের মাধ্যমে সুপারসনিক বিমানের গতিবেগ বর্ণনা করা যায়।

www.pathagar.com

সর্বশ্রেণীর পাঠক ভাইয়ের অবগতির জন্য মার্কিন স্যাবর এফ-৮৬ এবং রুশ মিগ-২১ জঙ্গী বিমানের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হল।

এফ-৮৬ স্যাবর জেট ঃ স্যাবর জেট জঙ্গী বিমান যুক্তরাষ্ট্রের তৈরী। ১৯৫০ সালে কোরীয় যুদ্ধে এই বিমান ব্যবহৃত হয়। দঃ কোরিয়া এফ-৮৬ দিয়ে উঃ কোরিয়ার মিগ-১৫, মিগ-১৭ বিমানগুলোকে একের পর এক ঘায়েল করে প্রমাণ করল যে, মিগ-১৫ ও মিগ-১৭ এর চাইতে এফ-৮৬ স্যাবর জেট সবদিক দিয়েই শ্রেষ্ঠ। আর পাকিস্তান বিমান বাহিনীতে ব্যাপকভাবে এই বিমানগুলো ব্যবহৃত হয়েছে। ১৯৬৫ ও ১৯৭১ সালের পাক-ভারত যুদ্ধে এই জঙ্গী বিমান খুব সাফল্য দেখিয়েছিল। ১৯৭১ সালের পাক-ভারত যুদ্ধে ঢাকার আকাশে পাকিস্তানের স্যাবর জেট ও ভারতের সুপারসনিক গতিসম্পন্ন মিগ-২১ এর মধ্যে লড়াই সংঘটিত হয়। এর গতি শব্দের গতির চেয়ে কম। ৫৫০ এমপিএইচ (মাইল পার আওয়ার) ছিল এর গতি। আর মিগ-২১ ছিল সুপারসনিক গতিসম্পন্ন অর্থাৎ ঘন্টায় ১৪০০ মাইল। আমাদের অনেকেরই সুযোগ হয়েছিল ঢাকার আকাশে সেই বিমানযুদ্ধ দেখার। এফ-৮৬ বিমানে ৪টি মেশিনগান থাকে। তাছাড়া ২৫০ পাউন্ড ওজনের ২টি বোমা ও রকেটও বহন করতে পারে এই বিমান। আত্মসমর্পণকারী পাকিস্তান বিমান বাহিনী কর্তৃক মেরামতের পর আমাদের জঙ্গী বিমান বহরে প্রথম এটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

মিগ-২১ ঃ তদানীন্তন সোভিয়েত রাশিয়ার দু'ব্যক্তি মিগ বিমানের নক্শা তৈরী করেন। একজন হচ্ছেন মিখাইল, অন্যজন হলেন গুরেভিচ। তাদের নামের প্রথম অক্ষর নিয়ে এর নাম করা হয় মিগ। ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী সোভিয়েত রাশিয়া থেকে সংগ্রহ করে মিগ-২১। এই বিমানই হল বিএএফ-এর প্রথম সুপারসনিক জঙ্গী বোমারু বিমান। সুপারসনিক কথার অর্থ শব্দের গতির দ্বিগুণ গতি। এর গতি ১৪০০ এমপিএইচ। অর্থাৎ ঘন্টায় এই বিমান ১৪০০ মাইল পথ অতিক্রম করতে সক্ষম। মিগ-২১ আকাশ থেকে আকাশে এবং আকাশ থেকে ভূমিতে মিসাইল রকেট ও বোমা বর্ষণে সক্ষম। মাত্র ১২টির এক স্কোয়াড্রন বিমান নিয়ে যে বিমান বাহিনী যাত্রা শুরু করেছিল আজ সেখানে সংযোজিত হয়েছে বিভিন্ন দেশের তৈরী ৮০টির মত জঙ্গী বিমান। ১৯৭৩ থেকে ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত আমাদের বিমান বাহিনীর শক্তি বলতে ছিল সেই এক স্কোয়াড্রন মিগ-২১।

বর্তমান মিগ-২১ বিমানগুলো আমাদের বিমান বাহিনীতে আর কার্যক্ষম নেই। উড্ডয়ন ক্ষমতা হারিয়ে ৩/৪টি মিগ-২১ এখন ভূমিতে অবস্থান করছে। এভাবে বিমান বাহিনীতে জঙ্গী বিমান সংযোজনের সর্বশেষ ধাপ হল মিগ-২৯ জঙ্গী বিমান। এফ-৮৬ এবং মিগ-২১ জঙ্গী বিমান ছাড়াও আমাদের বিমান বাহিনীতে পর্যায়ক্রমে যেসব জঙ্গী বিমান যুক্ত হয় সেগুলো হল এ-৫, এফ-৬ এবং এফ-৭। বলা বাহুল্য, এই তিন ধরনের বিমানই গণচীনে নির্মিত। পাঠক ভাইদের অবগতির জন্য এসব বিমানের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করছি।

www.pathagar.com

এ-৫ ঃ গণচীনের তৈরী জঙ্গী বোমারু বিমান। শত্রুর অগ্রবর্তী ঘাঁটি ও সাগরে শত্রুর জাহাজে বোমা অথবা মিসাইল হামলা চালানোর মাধ্যমে স্থল ও নৌবাহিনীকে সহায়তা প্রদানে এই বিমান ব্যবহৃত হয়। এ-৫ বিমানেও রয়েছে দু'টি ইঞ্জিন। এর গতি ৯৫০ এমপিএইচ। এই বিমান ভূমি থেকে আকাশে ও আকাশ থেকে ভূমিতে মিসাইল হামলা চালাতে পারে। এ-৫ বিমান রকেটও বহন করে থাকে। একটি জঙ্গী বিমান কি ধরনের মিশনে অংশ নেবে তার উপর ভিত্তি করেই মিসাইল, বোমা, রকেট ইত্যাদি বহন করে থাকে। এই জঙ্গী বোমারু বিমানটি জ্বালানি নিয়ে একটানা তিন ঘন্টা আকাশে উড়তে সক্ষম। এ-৫ বিমানগুলো বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর ২৫নং স্কোয়াড্রনের অন্তর্ভুক্ত। এ-৫ জঙ্গী বিমান পাকিস্তান ও ইরানের বিমান বাহিনীতে ব্যবহৃত হচ্ছে। আশির দশকের প্রথম দিকে এই বিমান চীন থেকে সংগ্রহ করা হয়।

এফ-৬ ঃ গণচীনে তৈরী সুপারসনিক জঙ্গী বিমান। আকাশযুদ্ধ ও শত্রুর ঘাঁটিতে হামলা উভয় কার্যে ব্যবহারোপযোগী। বিএএফ ১৯৭৭ সালে চীন থেকে এ বিমানগুলো প্রথম সংগ্রহ করে। সত্যি কথা বলতে হলে বলতে হয়, ১৯৭৭ সাল থেকেই আমাদের বিমান বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে। এফ-৬ জঙ্গী বিমান বাংলাদেশ ছাড়া আরও বহুদেশের বিমান বাহিনীতে ব্যবহৃত হচ্ছে। পাকিস্তান, মিশর, উত্তর কোরিয়ার বিমান বাহিনীতে আজও সার্ভিস দিয়ে যাচ্ছে এফ-৬ জঙ্গী বিমান। বিমানটিতে তিনটি মেশিনগান আছে যা ২৫৫ রাউন্ড বুলেট বহন করতে পারে।এর দু'টি ইঞ্জিন। গতি ১১১০ এমপিএইচ। ১৯৭৩ সালে আরব-ইসরাইল যুদ্ধে মিশর এই বিমান ব্যবহার করে ৯৫ ভাগ সফলতা অর্জন করতে পেরেছিল।

এফ-৭ ঃ গণচীনে তৈরী জঙ্গী বিমান। মিগ-২১ উড্ডয়ন ক্ষমতা হারানোর সাথে সাথেই চীন থেকে এফ-৭ বিমান সংগ্রহ করা হয়। বিমানটি দেখতে একেবারে মিগ-২১ এর মতো। অথচ এর যুদ্ধ ক্ষমতা মিগ-২১ এর চাইতে অনেক বেশী। বাংলাদেশের আকাশে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় এই বিমানগুলো মুখ্য ভূমিকা পালন করছে। এই বিমানটিও সুপারসনিক গতিসম্পন্ন। ১৪০০ এমপিএইচ এর গতিবেগ। আকাশ থেকে আকাশ ও আকাশ থেকে ভূমিতে মিসাইল ও রকেট হামলা করতে পারে। এর রয়েছে ৩০ মিঃ মিঃ এর দু'টি মেশিনগান যা ২০০ রাউন্ড গুলী করতে পারে। এফ-৭ আক্রমণাত্মক ও ডিফেনসিভ উভয় ভূমিকাই পালন করে থাকে। প্রসঙ্গত কৃতজ্ঞতার সাথে উল্লেখ করতে চাই যে, বিভিন্ন বিমান সম্পর্কিত এসব তথ্য ২০০০ সালের ২০ মে দৈনিক ইনকিলাবে প্রকাশিত একটি নিবন্ধ হতে নেয়া। নিবন্ধটির শিরোনাম 'এসো আকাশে উড়ি'। লিখেছেন মোহাম্মদ মাসুদ।

www.pathagar.com

ফিরে আসছি আগের কথায়। পাকিস্তান আমলে তো সমরাস্ত্রের ধরন ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সাধারণ মানুষ কিছু জানতেন না অথবা তাদেরকে জানানো হতো না। বাংলাদেশ আমলেও এগুলো নিয়ে তেমন একটা লেখালেখি হতো না। এর একটি কারণ হলো, সমরাস্ত্র ও প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম ক্রয়-বিক্রয়ে স্বচ্ছতার অভাব। মিগ জঙ্গী বিমান এবং কোরিয়া থেকে একটি ফ্রিগেট (রণতরী) ক্রয় নিয়ে পত্র-পত্রিকার পাতায় এবং রাজনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবীদের মাঝে আলোচনা এবং সমালোচনার যে ঝড় উঠেছে সেখান থেকে অন্তত একটি জিনিস ফুটে উঠছে যে, প্রতিরক্ষা বাহিনীর ঘটনাবলীর (যেগুলো বিশেষভাবে গোপনীয় থাকা উচিত সেগুলো ছাড়া) কৈফিয়ত ও জবাবদিহিতার আওতায় আসছে। কাদের মাধ্যমে কেনাবেচার আলোচনা হয়েছে। কোনো তৃতীয় পক্ষ বা এজেন্ট ছিল কিনা, একেকটি বিমানের দাম কত পড়েছে, কতদিন বা কত বছরের যন্ত্রাংশ এক সাথে দেয়া হয়েছে, ভবিষ্যতে কেমন যন্ত্রাংশ লাগবে ইত্যাদি বিষয়সহ অনেক আনুষঙ্গিক বিষয় আলোচনায় এসেছে। এগুলো অবশ্য ওয়েলকাম সাইন। অতীতে যেসব বিমান, ট্যাংক, রণতরী, কামান ইত্যাদি কেনা হয়েছে তার হিসাব-নিকাশ বা ক্রয়-বিক্রয় প্রক্রিয়া সম্পর্কে জনসাধারণকে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রাখা হয়েছে।

।। তিন ।।

এখন মিগ-২৯ জঙ্গী বিমান নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে। প্রশ্নগুলো এত গুরুতর যে, প্রায় হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে ক্রয় করা এসব বিমান নাকি ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে গেছে। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া সেদিন জানিয়েছেন যে, এসব বিমান সচল রাখতে হলে বছরে ১০০ কোটি টাকা রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ ব্যয় করতে হবে। একটি দৈনিক পত্রিকা জানিয়েছে যে, ইতোমধ্যেই দু'টি মিগ-২৯ জঙ্গী বিমান গ্রাউন্ডেড হয়ে গেছে। কারিগরি ভাষায় এটাকে বলা হয় অকেজো হয়ে যাওয়া। আরেকটি ইংরেজী পত্রিকা বলেছে, ৮টির মধ্যে ৪টি বিমানই অকেজো হয়ে গেছে। এগুলোকে সচল রাখতে হলে বছরে ১০০ কোটি টাকা খরচ করার অর্থ হল শ্বেতহস্তী পোষা। বাংলাদেশের মতো একটি গরীব দেশের পক্ষে এই হাতি পোষার বিলাস শোভা পায় না। সে কারণে সরকার এগুলো বিক্রি করার চিন্তা-ভাবনা করছে। ইতোমধ্যেই বিক্রির উদ্যোগও নেয়া হয়েছে কিন্তু আগ্রহী পার্টি অর্থাৎ দেশ পাওয়া যাচ্ছে না। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া কয়েকজন সাংবাদিককে বলেছেন যে, বছরে শুধু ১০০ কোটি টাকাই রক্ষণাবেক্ষণ খরচ হবে না, প্রতি বছরই এই রক্ষণাবেক্ষণ খরচ বাড়বে। তিনি বলেন, কেনা দামে তো বেচা যাবে না। তাই কম দামে হলেও বেচতে হবে। তার মতে এই বিমানগুলো যদি এখন বিক্রি করা না যায় তাহলে এক সময় এগুলোর দশাও হবে আদমজী জুটমিলের মতো। তিনি বলেন যে, যদি এগুলো রক্ষণাবেক্ষণ করতে হয় তাহলে বিমান বাহিনীর বাজেটই শেষ হয়ে যাবে। তখন বিমান বাহিনীর অন্যান্য বিমানও আর রক্ষণাবেক্ষণ করা যাবে না।

www.pathagar.com

প্রধানমন্ত্রীর এসব মন্তব্যকে হালকাভাবে নেয়ার কোনো অবকাশ নেই। প্রথম কথা হল, তিনি প্রধানমন্ত্রী। পার্লামেন্টারী ব্যবস্থায় তিনি দেশের সর্বোচ্চ ক্ষমতাধর ব্যক্তি এছাড়া প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ও সরাসরি তাঁরই অধীনে। কাজেই তাঁর এসব মন্তব্যকে অথরিটেটিভ বা কর্তৃপক্ষীয় বলে বিবেচনা করা যায়। প্রধানমন্ত্রীর উপরোক্ত মন্তব্যের পর এক সপ্তাহ পার হয়ে গেল। কিন্তু অপরপক্ষ থেকে কোনো প্রতিবাদ করা হয়নি। এসব বিমান কেনার সময় যে ব্যক্তি সবচেয়ে বেশী বেশী কথা বলেছেন তিনি হলেন, তদানীন্তন বিমান বাহিনীর প্রধান (অবঃ) এয়ার ভাইস মার্শাল জামালউদ্দীন। অকালীন প্রতিরক্ষামন্ত্রী এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং সাবেক বিমানবাহিনীর প্রধান জামালউদ্দীন এখন পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী বেগম জিয়ার এসব দারুণ রকমের গুরুতর অভিযোগের কোনো প্রতিবাদ করেননি অথবা বেগম জিয়ার অভিযোগ খণ্ডন করে বিমানক্রয় সম্পর্কে তারা কোনো বক্তব্যও দেননি। তাহলে কি বলতে হবে যে, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধানমন্ত্রী যেসব অভিযোগ করেছেন সেসব অভিযোগ সত্য? এ প্রশ্নটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটিকে অত্যন্ত সিরিয়াসলি গ্রহণ করতে হবে।

কারণ প্রধানমন্ত্রীর অভিযোগ যদি সত্য হয় তাহলে এই ক্রয়ে দুর্নীতি অথবা অদূরদর্শিতার ঘটনা হবে সমকালীন ইতিহাসে নজিরবিহীন। ভারতসহ ইরাক, লিবিয়া এবং আরও বেশ কয়েকটি দেশে মিগ-২৯ জঙ্গী বিমান রয়েছে। অন্তত ২০ বছর ধরে তাদের আকাশে মিগ-২৯ বিমান চক্কর দিচ্ছে। তাদের মিগ-২৯ যদি ২০/২২ বছর টিকে থাকতে পারে তাহলে আমাদেরগুলো ২ বছরেও টিকলো না কেন? ইতোমধ্যে ৪টি মুখ থুবড়ে পড়েছে। শুধুমাত্র বিমান ক্রয়ের সমালোচনা করলে এবং বিক্রি করে দিলেই বিষয়টি শেষ হতে পারে না। জাতির এত বড় সর্বনাশ যারা করেছে তাদের চিহ্নিত করতে হবে এবং বিচারের কাঠগড়ায় খাড়া করতে হবে। আইনের চোখে সকলেই সমান। তাই তাদের বিচার করতে হবে। যদি বিচার করা না হয় তাহলে বুঝতে হবে যে, এগুলো নেহায়েত পলিটিক্যাল প্রপাগান্ডা এবং হোম কনজাম্পসণের জন্য করা হচ্ছে। তবে যে দলই করুক সত্য ঘটনা যথাযথ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বেরিয়ে আসা উচিত।

সূত্র ঃ দৈনিক ইনকিলাব তাং ২৩-৭-২০০২

www.pathagar.com

মাত্র ৮টি মিগ-২৯ জঙ্গী বিমান ক্রয় নিয়ে অসংখ্য অভিযোগ

বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর জন্য ৮টি মিগ-২৯ বিমান কেনা হবে। এই খবরটি দেড়-দুই বছর আগে শোনা গিয়েছিল। বছর খানিক আগে বিমান বাহিনীর একটি অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছিলেন যে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর জন্য মিগ-২৯ জঙ্গী বিমান কেনা হবে। এরপর অনেক সময় গত হয়েছে। ভেবেছিলাম যে, ঐসব বিমান ইতিমধ্যেই কেনাকাটা সম্পন্ন হয়েছে এবং হয়তো তাদের ট্রেনিং ফ্লাইটও শুরু করার প্রস্তুতি নেয়া হয়েছে। আমাদের এরূপ ভাবার কারণ হলো এই যে কোন দেশের সশস্ত্র বাহিনীর জন্য যখন যুদ্ধাস্ত্র সংগ্রহ করা হয় তখন সেটা ঢাকঢোল পিটিয়ে দশদিগন্তে জানান দিয়ে করা হয় না। দু'বছর আগে পাকিস্তান ইউক্রেন থেকে ৩২০টি টি-৮০ ট্যাংকের চুক্তি করেছিল। এরমধ্যে গত বছর ১০০টি ট্যাংক ইতিমধ্যেই পাকিস্তানকে সরবরাহ করা হয়েছে। অবশিষ্ট ২২০টি ট্যাংক চলতি সালের মধ্যেই পাকিস্তানে এসে পৌঁছবে। একইভাবে ভারতও বছর ২/১ আগে ৪০টি এসইউ-৩০ জঙ্গী বিমান সংগ্রহের জন্য রুশ ফেডারেশনের সঙ্গে একটি চুক্তি করে। এর মধ্যে ১৬টি বিমান ইতিমধ্যেই ভারতে এসে গেছে। অবশিষ্ট ২৪টি বিমান চলতি সালের মধ্যেই আসবে বলে জানা গেছে। এসব খবর বাংলাদেশের কোনো পত্র-পত্রিকায় এক্সক্লুসিভ স্টোরি হিসাবে প্রকাশিত হয়নি। লন্ডনের মর্যাদাশীল 'মিলিটারী ব্যালান্স' নামক বাৎসরিক সামরিক তথ্য বিবরণী থেকে এসব খবর জানা গেছে। পাকিস্তান , ভারত এসব সর্বাধুনিক সমরাস্ত্র সংগ্রহের জন্য শুধুমাত্র চুক্তিই করেনি, চুক্তির ভিত্তিতে ট্যাংক ও সাবমেরিনের প্রথম চালানের ডেলিভারীও গ্রহণ করেছে। ভারতও তাই করেছে। কিন্তু সেসব নিয়ে ঐ দুইটি দেশে কোন হৈচৈ হয়নি অথবা পত্রিকার পাতাও সরগরম করা হয়নি। আসলে এটাই নিয়ম। এসব বিষয় নীরবে ও নিভৃতেই করা হয়। যত বড় গণতান্ত্রিক দেশই হোক না কেন, সামরিক গোপনীয়তা সব সময়ই বজায় রাখা হয়। কিন্তু বাংলাদেশের ব্যাপার স্যাপারই আলাদা। মিগ বিমান ক্রয় করা নিয়ে আমাদের একশ্রেণীর পত্র-পত্রিকায় রীতিমত হৈচৈ তোলা হয়েছে। আমরা তো এত দিন জানতাম যে, বাংলাদেশে মিগ-২৯ জঙ্গী বিমান ক্রয় করার ব্যাপারে কথাবার্তা শুরু হয়েছিল ২ বছর আগে। কিন্তু গত ২০ মে সশস্ত্র বাহিনী আন্তঃসার্ভিসেস জনসংযোগ দফতরের এক তথ্য বিবরণী থেকে জানা যায় যে, মিগ-২৯ জঙ্গী বিমান ক্রয় করার জন্য রুশ ফেডারেশনের সাথে নাকি বিগত ৫ বছর ধরে আলাপ-আলোচনা চলছে। সামরিক বাহিনীর জন্য একটি সুনির্দিষ্ট অস্ত্র সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ৫ বছর ধরে আলাপ-আলোচনা চলছে, সেই খবর শুনে তাজ্জব বনে যেতে হয়।

www.pathagar.com

গত ৮/৯ দিন ধরে দেশের অন্তত দুইটি দৈনিক এবং একটি সাপ্তাহিক পত্রিকায় মিগ-২৯ ক্রয়ের ব্যাপারে একাধিক খবর প্রকাশিত হয়েছে। এসব খবর থেকে এবারই সর্বপ্রথম জানা গেল যে, এত হৈ হৈ কাণ্ড রৈ রৈ ব্যাপারের পর রাশিয়া থেকে মাত্র ৮টি মিগ-২৯ জঙ্গী বিমান কেনা হচ্ছে। কিন্তু এই ৮টি বিমান কিনতে যেয়েও উত্থাপিত হয়েছে খুব বড় মাপের দুর্নীতি, অনিয়ম ও অর্থ কেলেংকারির অভিযোগ। এ সমস্ত অভিযোগের সারমর্ম এই যে, প্রধানমন্ত্রীর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ একাধিক ব্যক্তির সাথে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট বাহিনীর কতিপয় কর্মকর্তার একটি অশুভ আঁতাত গড়ে ওঠে। সেই আঁতাত মোতাবেক রাশিয়া ও বাংলাদেশের সরকারী পর্যায়ে মিগ ক্রয় না করে বেসরকারী খাত অর্থাৎ ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে ক্রয় করার কাজ জোরেসোরে এগিয়ে চলেছে। অভিযোগে প্রকাশ, দুই দেশের সরকার যদি সরাসরি এই ক্রয়-বিক্রয়ে জড়িত থাকতো তাহলে ৮টি বিমানের দাম হতো ১২ কোটি ডলার বা ৬০০ কোটি টাকা। কিন্তু বেসরকারী খাতের মাধ্যমে ক্রয় করার যে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে তার ফলে দাম পড়ছে সাড়ে ১৪ কোটি ডলার। অর্থাৎ বাংলাদেশী মুদ্রায় ৭২০ কোটি টাকা। সরকারী পর্যায়ে না কিনে বেসরকারী খাতের মাধ্যমে কিনলে মাত্র ৮টি বিমানের জন্য ১২০ কোটি টাকা বেশী পড়বে। প্রকাশিত সংবাদসমূহ থেকে জানা যায় যে, মিগ-২৯ জঙ্গী বিমান নির্মাতার নাম হলো 'মাপোমিগ'। মাপোমিগের বাংলাদেশস্থ লোকাল এজেন্ট হলো 'ইউনিক এভিয়েশন' নামক একটি সংস্থা। এ সংস্থাটির মালিক হলো জনাব নূর আলী। তিনি একজন ম্যানপাওয়ার ব্যবসায়ী। মিগের এজেন্ট তাঁর দরপত্রে প্রতিটি মিগ-২৯ বিমানের দাম চেয়েছে ১৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। পক্ষান্তরে মাপোমিগের অফিসিয়াল দাম হলো ১৫ মিলিয়ন ডলার। জানা গেছে যে, গত বছরে জনাব নূর আলী ও ক্ষমতার করিডোরে সতত বিচরণকারী এক ব্যক্তি রাশিয়া সফর করেন। তারা বেসরকারী খাতে ডিলারের মাধ্যমে এই ৮টি বিমান সংগ্রহের পক্ষে মত দেন।

একটি ইংরেজী সাপ্তাহিকের গত শুক্রবারের সংখ্যায় অভিযোগ করা হয়েছে যে, ইউনিক এভিয়েশনের মালিক জনাব নূর আলী বাংলাদেশের কয়েকজন উচ্চ পদস্থ অফিসারের মধ্যে বিপুল পরিমাণ অর্থ বিতরণ করেছেন। উদ্দেশ্য হলো,মাপোমিগের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকার যেন ঐ বিমানগুলো ক্রয় করে। বর্তমান সরকারের জনৈক মন্ত্রীর মালিকানাধীন পত্রিকাটিতে (যার অফিস বাংলা মোটরের নিকটে অবস্থিত) ১৬ মে বিরাট হেডিং দিয়ে ফলাও করে এ সম্পর্কে একটি সংবাদ ছাপা হয়েছে। সংবাদটির শিরোনাম হলো 'ভুল তথ্য দিয়ে চড়া দামে ৮টি মিগ-২৯ কেনার চেষ্টা/নেপথ্যে বিমান বাহিনীর দুই কর্মকর্তা, সরকারের ক্ষতি হবে ১০০ কোটি টাকা।' রিপোর্টের একস্থানে বলা হয়, 'জানা গেছে, বিমান বাহিনীর দু'জন উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা সরকারকে ভুল তথ্য পরিবেশন করে মিগ-২৯ এর নির্মাতা সংস্থা মাপোমিগের বদলে একই বিমানের যন্ত্রাংশ নির্মাতা ও মিগ-২৯ এর ডিলার মিগমাপোর কাছ থেকে এজেন্টের মাধ্যমে উচ্চ মূল্যে বিমান ক্রয়ের চেষ্টা চালাচ্ছে। এই দুই কর্মকর্তার সঙ্গে মাপোমিগের বাংলাদেশের

www.pathagar.com

এজেন্ট ইউনিক এভিয়েশনের যোগসাজশ থাকার ব্যাপারে সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেছে।' ইউনিক এভিয়েশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক নূর আলী রুশ সরকারের উর্ধ্বতন কর্মকর্তার কাছে লেখা চিঠিতে দাবী করেছেন, 'মিগমাপোকে ব্যবসা পাইয়ে দেয়ার জন্য তিনি বাংলাদেশের সামরিক ও বেসামরিক সরকারী কর্মকর্তাদের পিছনে বিপুল খরচাপাতি করেছেন।' আবার ঐ একই পত্রিকাতে পরক্ষণে একই নিঃশ্বাসে বলা হচ্ছে যে, প্রধানমন্ত্রী সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্মকর্তাদের সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, মিগ ক্রয়ের ব্যাপারে কোনো এজেন্ট থাকতে পারবে না। অন্তঃরাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ক্রয় চুক্তির মাধ্যমে সরাসরি নির্মাণ সংস্থার কাছ থেকে মিগ কিনতে হবে। প্রকাশিত সংবাদ থেকে জানা যায় যে, প্রতিরক্ষা ক্রয় মহাপরিচালকের অফিস (ডিজিডিটি) মিগ ক্রয়ের জন্য ইতিপূর্বে নাকি আন্তর্জাতিক দরপত্র আহবান করেছিলেন। ঐ রিপোর্ট মোতাবেক বাংলাদেশে রুশ রাষ্ট্রদূত ডিজিডিপির আহবানকৃত বাণিজ্যিক দরপত্রের সময়ে রুশ সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে বাংলাদেশের কর্মকর্তাকে দরপত্রে বর্ণিত মিগ-২৯ এর মূল্যের চেয়ে প্রকৃত সরবরাহ মূল্য ১৫-২০ শতাংশ কম হবে বলে অবহিত করেছিলেন। এরপর মিগমাপোর স্থানীয় এজেন্ট ইউনিক এভিয়েশনের বিরুদ্ধে উক্ত পত্রিকায় অত্যন্ত গুরুতর অভিযোগ করা হয়েছে। অভিযোগে বলা হয়েছে. "বাংলাদেশ আন্তঃরাষ্ট্রীয় সামরিক ও কারিগরি চুক্তির আওতায় মিগ-২৯ বিমান ক্রয়ের নীতি গ্রহণ করার পর থেকে মিগমাপোর স্থানীয় এজেন্ট ইউনিক এভিয়েশন তৎপর হয়ে ওঠে। মাপোমিগ স্থানীয় এজেন্ট ছাড়াই বাংলাদেশের সঙ্গে চুক্তি করলে তারা কমিশন বঞ্চিত হবে এই আশংকায় ইউনিক এভিয়েশনের নূর আলী রাশিয়ান সরকারের প্রথম ডেপুটি চেয়ারম্যান ভিডি মার্সলউকভের কাছে লেখা চিঠিতে বলেন, বাংলাদেশস্থ রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত নিজ দেশের স্বার্থ দেখছেন না। রাষ্ট্রদূত দরপত্রের মূল্যের চেয়ে আরো ১৫-২০ শতাংশ কম দামে মিগ-২৯ সরবরাহের ব্যাপারে বাংলাদেশকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

।। দুই ।।

বাংলা মোটরের সন্নিকটে অবস্থিত পত্রিকাটির অভিযোগসমূহ অত্যন্ত গুরুতর। প্রকাশিত রিপোর্টে বাংলাদেশে অবস্থিত রুশ দূতাবাসের কর্মকর্তাবৃন্দ মস্কোতে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসের একজন সিনিয়র অফিসার, বাংলাদেশের কয়েকজন সচিব, বিমান বাহিনীর কয়েকজন অফিসার, এবং বেসরকারী খাতের একজন ব্যবসায়ীকে জড়িত করা হয়েছে। এই ব্যবসায়ীটি নাকি রুশ সরকারের নিকট একটি চিঠি লিখেছেন। ঐ চিঠির বরাতে বলা হয়েছে যে, ব্যবসায়ী নূর আলী না-কি স্বদেশের স্বার্থ না দেখার জন্য ঢাকাস্থ রুশ দূতাবাসের কতিপয় অফিসারের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছেন। ঐ পত্রের বরাত দিয়ে আরো বলা হয়েছে যে, জনাব নূর আলী না-কি বলেছেন যে, মিগমাপোকে ব্যবসা পাইয়ে দেয়ার জন্য তিনি বিপুল অর্থ বিতরণ করেছেন। একথা বার বার বলার আবশ্যক রাখে না যে, এসব অভিযোগ অত্যন্ত গুরুতর। অভিযোগগুলো সত্য হলে লোকাল এজেন্টের বিরুদ্ধে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন। আর যদি অভিযোগ সত্য না হয় তাহলে দায়িত্বহীন রিপোর্টিংয়ের জন্য কি করা দরকার সেটা সরকারই ভাল বোঝেন।

www.pathagar.com

ঐসব রিপোর্ট থেকে দেখা যাচ্ছে যে, এই আটটি বিমান কিনতে নির্মাণ সংস্থার এজেন্ট কর্তৃক প্রদত্ত টেণ্ডার মোতাবেক বাংলাদেশ সরকারের খরচ পড়বে ৭২০ কোটি টাকা। প্রকাশ, এককালীন নগদ পরিশোধের ম্যধ্যমে না-কি এই বিমানগুলো কেনার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ খবর শুনে অভিজ্ঞ মহলের প্রশ্ন ঃ ৭২০ কোটি টাকার মত একটি বিশাল অংক নগদ পরিশোধ করে বিমানগুলো কিনতে হবে কেন? বাংলাদেশের মত একটি অতি গরীব দেশ, যার প্রধান সমস্যাই হলো নগদ অর্থের অভাব, সেই দেশটি এত বিপুল অংক নগদ পরিশোধ করে বিমানগুলো কিনতে যাবে কেন ডিজিডিপির প্রতিষ্ঠানটি আছে তাহলে কি জন্য? প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের হাতে তো পূর্ববর্তী নজিরগুলো রয়েছে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর শেখ মুজিবের আমলে রাশিয়া থেকে ১২টি মিগ-২১ জঙ্গী বিমান সংগ্রহ করা হয়েছিল। সেগুলো কি নগদ অর্থে কেনা হয়েছিল? প্রতিরক্ষামন্ত্রী শেখ হাসিনা থেকে শুরু করে, সংশ্লিষ্ট অফিসারদের বলবো, আপনারা রেকর্ড চেক করুন এবং সেই মোতাবেক সিদ্ধান্ত নিন। তাদের সামনে আরো অনেক কেস আছে। চীন থেকে অনেকগুলো এ-৫, এফ-৬, এফ-৭ জঙ্গী বিমান সংগ্রহ করা হয়েছে। পাকিস্তান থেকেও অন্তত ৪৫টি এফ-৬ জঙ্গী বিমান সংগ্রহ করা হয়েছে। সব মিলিয়ে সংখ্যা ৬০-এর কম হবে না। প্রধানমন্ত্রী ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী দেখুন, এতগুলো জঙ্গী বিমান কোন পদ্ধতিতে সংগ্রহ করা হয়েছে। এগুলো আনা হয়েছে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান, জেনারেল (অবঃ) এরশাদ এবং বেগম খালেদা জিয়ার আমলে। আমাদের বিশ্বাস করার যুক্তিসংগত কারণ রয়েছে যে, ঐ সব বিমানের দাম একসাথে নগদ মূল্যে পরিশোধ করা হয়নি। আমাদের খবর মোতাবেক এগুলো কেনা হয়েছে কিস্তিবন্দীতে অথবা সাপ্লায়ার্স ক্রেডিটে। সরকারের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের জ্ঞাতসারে প্রতিরক্ষা ক্রয় ডাইরেক্টরেট এসব সমরাস্ত্র ক্রয় করার একমাত্র সরকারী সংস্থা। এই সংস্থাটিকে এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে কেন?

উত্থাপিত অভিযোগগুলো অত্যন্ত গুরুতর। শুধুমাত্র দুর্নীতির প্রশ্নই জড়িত নয়, জড়িত রয়েছে দেশের নিরাপত্তা, প্রতিরক্ষা এবং পররাষ্ট্র বিষয় সম্পর্কে কতিপয় মৌলিক প্রশ্ন। কার কতটা ব্যক্তি বা গোষ্ঠী স্বার্থ কতখানি উদ্ধার হবে সেই বিবেচনায় না গিয়ে দেশের স্বার্থ কত খানি উদ্ধার হবে, মিগ বিমান কেনার সময় সেটাই প্রধান বিবেচ্য বিষয় হওয়া উচিত।

সূত্র ঃ দৈনিক ইনকিলাব ২৪-৫-৯৯

www.pathagar.com

সীমান্তে রক্তপাতঃ ছায়ার সাথে যুদ্ধ

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে আসলে কি ঘটছে? যা ঘটছে তা কেন ঘটছে? এই দুটি প্রশ্ন খুব ছোট, কিন্তু বড় গভীর এবং অত্যন্ত ব্যাপক। দেশপ্রেমিক মহল এবং রাজনৈতিক ও প্রতিরক্ষা বিশ্লেষকরা এসব বিষয় নিয়ে গভীরভাবে ভাবছেন। প্রথম প্রথম তারা ঘটনার আকস্মিকতায় বিভ্রান্তির অতলান্তে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন। ভাবতে ভাবতে তারা ২/৩ টা ইনফারেন্স ড্র করেছিলেন। কিন্তু রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ সম্পূর্ণ থেমে যাওয়ার পরেও আবার নতুন করে উত্তেজনা সৃষ্টি হচ্ছে কেন? আসলে সংঘর্ষ উত্তর ডেভলপমেন্টস বা ঘটনাবলীই রাজনৈতিক ও প্রতিরক্ষা বিশ্লেষকগণকে ভাবিয়ে তুলেছে। তাহলে কি বাংলাদেশের সাথে ভারতের যুদ্ধ বাধবে, তা না হলে কি দুই দেশের মধ্যে সীমান্ত যুদ্ধ হবে, আর তাও যদি না হয় তাহলে কি দুই দেশের মধ্যে সীমান্ত সংঘর্ষ হবে? এসব প্রশ্ন নিয়ে পর্যবেক্ষক মহলে এখন দারুণ জল্পনা-কল্পনা চলছে। আমার কাছে কিন্তু উপরোক্ত তিনটি সম্ভাবনার একটিরও বাস্তব ভিত্তি আছে বলে মনে হয় না। ক্ষমতায় আছে আওয়ামী লীগ। আরো বড় কথা প্রধানমন্ত্রী আছেন শেখ হাসিনা। সেই শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে কি ভারত যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারে? পুরো বিষয়টিকে আমার কাঁঠালের আমসত্ত্ব বলে মনে হয়। কেউ যদি বলেন যে, কাকের বাসায় কোকিল ডিম পেড়েছে আর সেই ডিম থেকে কোকিলের বাচ্চা হয়েছে তাহলে তার একটি তাত্ত্বিক ও সাহিত্যিক ভিত্তি থাকতে পারে। কিন্তু কাকের তায়ে এবং কাকের লালনে পালনে সেই কোকিল ছানা বেড়ে ওঠে তা একেবারেই অবাস্তব ব্যাপার। আর যখন মা কাক কোকিলকে চিনতে পারে তখন তাকে মেরে ফেলে দেয়। এখন কেউ যদি বলেন যে, ইন্ডিয়াকে বধ করার জন্য আওয়ামী লীগ সেই গোকুলে বাড়ন্ত হচ্ছে তাহলে তিনি রাজনীতির পাশা খেলায় পুরো ছকটাই উল্টো করে সাজিয়েছেন বলে মনে হয়। কিন্তু তারপরেও তো সীমান্তে একাধিক অশুভ সংকেত দেখা যাচ্ছে। তাহলে এগুলো কি ঘটছে? কেন ঘটছে?

ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ-এর সহকারী মহাপরিদর্শক এস বসুমাতারী গত ২৩ শে এপ্রিল ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী আগরতলায় এক অবিশ্বাস্য কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন যে, ত্রিপুরা বাংলাদেশ সীমান্তের অপর পারে বাংলাদেশ বিপুল সৈন্য মোতায়েন করেছে। এর ফলে ভারতীয় বাহিনীকে সর্বোচ্চ সতর্কাবস্থায় রাখা হয়েছে। বিএসএফ-এর দ্বিতীয় প্রধান ব্যক্তিটি আরো বলেছেন যে, তারা (বাংলাদেশ) সীমান্তে তাদের শক্তিই শুধু বৃদ্ধি করে নাই সীমান্ত জুড়ে অনেকগুলো বাংকার এবং পরিখা খনন করেছে। এসব পরিখায় তারা আধুনিক অস্ত্র স্থাপন করেছে।

www.pathagar.com

ত্রিপুরার সীমান্ত থেকে বাংলাদেশী সৈন্যের আনাগোনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ২৫শে এপ্রিল খবরে প্রকাশ সিলেটের লাঠিটিলা সীমান্তে ভারত বিএসএফের বিপুল সৈন্য মোতায়েন করেছে এবং সেখান থেকে বাংলাদেশের গ্রামের ওপর গুলীবর্ষণ করেছে। ভারত ত্রিপুরা সীমান্তের মুহুরীর চর এবং বত্রিগাছ ও কিসামত বত্রিগাছ ছিটমহলের চারপাশে অকস্মাৎ বিপুল সৈন্য সমাবেশ করছে। মঙ্গলবার রাত থেকে ভারতীয় বাহিনীর এই সমাবেশের পর বাংলাদেশ ও দূর্গাপুর সীমান্তে টহলদারী জোরদার করেছে। লালমনিরহাট সীমান্তে দেখা যাচ্ছে যে, বিরাট সংখ্যক সাঁজোয়া যানবাহন রাতের অন্ধকারে চোখ ধাঁধাঁনো হেডলাইট জ্বালিয়ে বাংলাদেশ সীমান্তের দিকে এগিয়ে আসছে। শক্তিশালী ভারতীয় বাহিনীর এই উস্কানিমূলক সৈন্য সমাবেশের মুখেও বাংলাদেশ বিরাট সংযম দেখাচ্ছে। কিন্তু তারপরও ভারত চালাচ্ছে বৈরী প্রচারণা বিএসএফের উপপ্রধান এই মর্মে বৈরী প্রচারণা চালাচ্ছে যে, বাংলাদেশ সীমান্তে শুধুমাত্র বিডিআরই মোতায়েন করছে না, নিয়মিত সৈন্যবাহিনীও সেখানে মোতায়েন করা হচ্ছে। বাংলাদেশী সৈন্যরা অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হচ্ছে। বাংলাদেশকে এই মর্মে হুঁশিয়ার করে দিচ্ছে যে, সীমান্তে শান্তি রক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক মেকানিজম যেন ভেঙ্গে না পড়ে। পক্ষান্তরে বিডিআরের স্টাফ অফিসার মেজর মাহবুব এসব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেন যে, দুই দেশের ঐক্যমতের পর বিডিআর বরং তার সৈন্য সংখ্যা কমিয়েছে। কিন্তু সীমান্তের ওপারে ভারতীয়রা বিপুল পরিমাণে তাদের শক্তি বাড়াচ্ছে।

২৬ শে এপ্রিল সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরসমূহ আরো উদ্বেগজনক। সীমান্ত এলাকা থেকে প্রত্যক্ষদর্শীরা এবং সীমান্ত সফরকারী সাংবাদিকরা যা দেখছেন তাতে তারা হতভম্ব হয়ে যাচ্ছেন। তারা দেখছেন যে, রাজশাহীর চাঁপাইনবাবগঞ্জ থেকে শুরু করে সিলেট পর্যন্ত কয়েকশত মাইল বিস্তীর্ণ সীমান্ত এলাকা জুড়ে বিপুল পরিমাণ বিএসএফ সৈন্য মোতায়েন করা হয়েছে। এই বিস্তীর্ন সীমান্ত এলাকায় হাজার হাজার বাংকার এবং পরিখা খনন করা হয়েছে। বিএসএফের ঠিক পেছনে সেকেন্ড লাইন অব ডিফেন্স হিসাবে ভারতের নিয়মিত সৈন্যবাহিনী সশস্ত্র অবস্থান গ্রহণ করেছে। পর্যবেক্ষকরা বিপন্ন বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করছেন যে, রৌমারী এবং পাদুয়া ফ্রন্ট যখন শান্ত হতে চলেছে তখন ভারত নতুন নতুন ফ্রন্টে সৈন্য সমাবেশ করেছে এবং উত্তেজনা সৃষ্টি করছে। চাঁপাইনবাবগঞ্জ, দিনাজপুর, লালমনিরহাট, নওগাঁ, পঞ্চগড়, নিলফামারী, কুড়িগ্রাম, জামালপুর, শেরপুর এবং সিলেট সীমান্তে বিপুল সৈন্য মোতায়েন করা হয়েছে। এসব অশুভ সংবাদের শীর্ষে এসেছে আরেকটি পিলে চমকানো খবর। গত ২৫শে এপ্রিল বুধবার ভারত সরকারের সবচেয়ে ক্ষমতাসীন ব্যক্তি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লালকৃষ্ণ আদভানী মাইনকারচর সীমান্ত পরিদর্শন করেছেন। বাংলাদেশ সরকার স্বীকার করেছে যে, ফেনীর ছাগলনাইয়া সীমান্তেও ভারত বিপুল সংখ্যক সৈন্য মোতায়েন করেছে। এদিকে বাংলাদেশ সীমান্ত সংলগ্ন ভারতীয় রাজ্যসমূহ যথা আসাম, মেঘালয় এবং ত্রিপুরায় বিজেপি এবং তার অঙ্গসংগঠনসমূহ যুদ্ধের উন্মাদনা সৃষ্টি করে চলেছে। উল্লেখিত অঞ্চলগুলো ছাড়াও প্রতাবপুর, তামাবিল, মানিকপুর, বিয়ানীবাজার এবং

www.pathagar.com

জাকিগঞ্জ সীমান্ত অশান্ত হয়ে উঠছে। উত্তরাঞ্চলের পার্বতীপুর সীমান্তের উভয় দিকেই বিডিআর এবং বিএসএফ বাহিনী কড়া টহলদারী করছে। এর ফলে এলাকাবাসীর মধ্যে ভীতির সঞ্চার হয়েছে। অপর একটি খবরে প্রকাশ খুলনা সীমান্তেও ভারত সৈন্য সমাবেশ করা শুরু করেছে। এসব বিবরণী থেকে একটি বিষয় পরিষ্কার হয়ে যায় যে, শুধুমাত্র পার্বত্য চট্টগ্রাম সীমান্ত ছাড়া (এর বৃহত্তর অংশ বার্মার সাথে সংলগ্ন) বাংলাদেশের সমগ্র সীমান্ত ভারত ঘিরে ফেলেছে। সারা সীমান্ত এলাকা জুড়ে এক ভীতিকর যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করছে।

এমন একটি ভয়ংকর ও আতংকজনক পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা থেকে শুরু করে সরকারের সমস্ত মন্ত্রী এক রহস্যময় ও দূর্বোধ্য নীরবতা বজায় রাখছেন। সরকারের এই উদ্দেশ্যমূলক নীরবতার পাশাপাশি আওয়ামী শিবির এবং সেকুলার ও বামপন্থী ঘরানার বুদ্ধিজীবী কলামিষ্ট ও সাংবাদিকরাও এক ধরণের অর্থপূর্ণ নীরবতা পালন করছেন। যারা আর ঠোঁট সেলাই করে রাখতে পারছেন না তারা কলম চালাচ্ছেন। কিন্তু কি আশ্চর্য, তাদের কলম দিয়েও তারা যেন সমস্ত ঘটনার জন্য বাংলাদেশের ছিদ্রান্বেষণে লিপ্ত হয়েছে। অত্যন্ত চাতুরীর সাথে তারা প্রশ্ন করছেন যে বিডিআর পাদুয়া দখল করেছিল কেন? জ্ঞানপাপীরা মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য এসব প্রশ্ন উত্থাপন করে। ওরা বলছে যে, পাদুয়া বাংলাদেশের অংশ। তারপরও তো সেটা বিগত ৩০ বছর ধরে ভারতের দখলেই আছে। কিন্তু এই ৩০ বছর তো বাংলাদেশ সেটি দখল করতে যায়নি। তাহলে আজ হঠাৎ করে গেল কেন? ওরা আবার প্রশ্ন তুলেছে, ১৯৫৪ সালের মুজিব-ইন্দিরা সীমান্ত চুক্তি বাস্তবায়িত হলে তো আর এসব সংঘর্ষ ঘটার অবকাশ থাকে না। তাহলে সেই চুক্তি বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে না কেন? এমন সুক্ষ্মভাবে প্রশ্ন তোলা হচ্ছে যেন সমস্ত দোষের জন্য বাংলাদেশই নন্দ ঘোষ। ওদের পেটে এতো বিদ্যে তো এই প্রশ্নের জওয়াব দিক যে, নোম্যান্স ল্যান্ডের ১৫০ মিটারের মধ্যে কোনো স্থাপনা নির্মাণ করা যায় কিনা। তাহলে ইন্ডিয়া পাদুয়ার জিরো এলাকা বা নোম্যান্স ল্যান্ডে পাকা রাস্তা বানাতে গেল কেন? ওটা বানানো সম্পন্ন হলে তাদেরকে ঠেকানোর আর কোনো রাস্তা ছিল কি? আর সীমান্ত চুক্তি বাস্তবায়ন? ৭৪ সালে স্বাক্ষরের সাথে সাথেই বাংলাদেশ সেটা র‍্যাটিফাই বা অনুমোদন করেছে। তারপর ২৭ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। ভারত আজও সেটি র‍্যাটিফাই করে নাই। তাহলে সেই চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য দায়ী কে? আওয়ামী, সেকুলার ও বাম শিবির এই ব্যাপারে রা করে না কেন?

।। দুই ।।

গত কয়েকদিন হলো লক্ষ্য করছি যে, একটি চিহ্নিত শিবির অকস্মাৎ সবকিছুর পেছনে এক বিরাট ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করতে উঠে পড়ে লেগেছে। এতদিন ধরে বিভিন্ন সভা-সমিতি এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বোমাবাজি হয়েছে, অনেক প্রাণহানি ঘটেছে, আর সাথে সাথেই সবকিছুর পেছনে মৌলবাদী অর্থাৎ ইসলামী শক্তির কাল্পনিক ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করা হয়েছে। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষের

www.pathagar.com

পেছনেও ওদের পরিভাষা অনুযায়ী মৌলবাদী ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করা হচ্ছে। ওই ঘরানার একজন এ ব্যাপারে ১০ ডিগ্রী এগিয়ে গেছেন। দেখছি এরা শুরু করেছেন 'শ্যাডো বক্সিং।' করছেন ছায়ার সাথে মুষ্টিযুদ্ধ। ভীমবেগে গদা ঘোরাচ্ছেন শূন্যে। আবিষ্কার করেছেন সেই ছায়া আলেয়ার মত যাকে ধরা যায় না, মরীচিকার মত যাকে ছোঁয়া যায় না। কিন্তু আওয়ামী ঘরানার আঁতেলদের তো রয়েছে ক্লেয়ারভয়েন্স বা দিব্যদৃষ্টি। তাই তো তারা দেখছেন সেই ছায়া, যে ছায়ার (ওদের ভাষায়) মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানকে এক রাখতে চেষ্টা করেছিল। সেই ছায়া যারা শেখ মুজিবের প্রশাসনকে 'তছনছ' করে মুজিবের পতন ঘটিয়েছিল। ওরা প্রশ্ন করেছেন, বাকশালের মূল পরামর্শদাতা কে বা কারা? কারা বাকশালের কাঠামো রচনা করেছিলেন? হ্যাঁ, আপনারাই বলুন, মূল চিন্তাধারাটি কার? কে বাকশালী কাঠামোর রচয়িতা? গত ২৩শে এপ্রিল আপনারা প্রশ্ন তুলেছেন, কেন কর্নেল মতি সার্কিট হাউজে গিয়েছিলেন এবং প্রেসিডেন্ট জিয়া নিহত হয়েছিলেন? এসব প্রশ্নের জবাব ওদেরকেই দিতে হবে। ওরা যখন প্রশ্ন তুলেছেন তখন ওদেরকেই জবাব দিতে হবে, কেন জেল হত্যার বিচার গুরুত্ব পাচ্ছে না? কেন জিয়া হত্যার বিচার হচ্ছে না? ওরা বলছেন যে, জিয়াউর রহমান নাকি ক্ষমতায় এসেছিলেন কোন একজনের ইচ্ছায় এবং ক্ষমতা থেকে চলেও গেছেন সেই একই ইচ্ছায়। কার ইচ্ছায় এরশাদ ক্ষমতায় এলেন? কার ইচ্ছায় ক্ষমতা থেকে চলে গেলেন? কার ইচ্ছায় খালেদা জিয়া ৯১ সালের ইলেকশনে জিতলেন, অবার '৯৬ সালে হারলেন? আবার কার ইচ্ছাতেই বা শেখ হাসিনা ৯১ সালে ইলেকশনে হারলেন এবং '৯৬ সালে ইলেকশনে জিতলেন? তারাই প্রশ্ন করেছেন, তাই উত্তরগুলোও তাদেরকেই দিতে হবে।

।। তিন ।।

এসব প্রশ্ন যারা করেছেন তাদের আসল চেহারা ধরা পড়েছে সীমান্ত সংঘর্ষে এসে। ওরা প্রশ্ন করেছেন, এবার সীমান্তে বিডিআর প্রধান জেনারেল ফজলুর রহমানের এত বীরত্ব দেখানোর প্রয়োজন হলো কেন? ঠিক এখানে এসেই ওরা ধরা পড়ে যাচ্ছে। ওরা বলছে যে, পাদুয়া দখলের খবর ফলাও করে প্রচার করা হয়েছে বলেই নাকি ভারতীয়রা বড়ইবাড়ীতে হামলা করেছিল। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গ করে ভারত যখন নোম্যান্স ল্যান্ডে পাকা রাস্তা বানায় তখন সেটা কোনো অপরাধ হয় না। কিন্তু বাংলাদেশ যখন তার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বড়ইবাড়ীতে তার অধিকার প্রতিষ্ঠা করে তখনই সেটা অন্যায় হয়ে যায়। বিএসএফ যখন ৩০০ সৈন্য নিয়ে রৌমারীতে হামলা চালায় তখন সেটা অপরাধ হয় না, কিন্তু বিডিআর যখন মাত্র ১০ জন সৈন্য নিয়ে আত্মরক্ষার্থে পাল্টা আঘাত করে এবং সেই আঘাতে ১৬ জন ভারতীয় হানাদার নিহত হয়, তখনই সেটা অন্যায় হয়ে যায়। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নাসিম নাকি বিডিআরের বাহাদুরীতে প্রশংসা করেছেন। আর তা শুনে ঐ সব ভারতীয় দালালদের গায়ে ফোস্কা পড়েছে। ওরা প্রশ্ন করেছে যে, নির্বাচনের আগে ভারত বিরোধী ইমেজ তৈরীর জন্যই কি সীমান্তের এসব ঘটনার অবতারণা করা হলো? প্রশ্ন তোলা হয়েছে যে, বিডিআর

www.pathagar.com

প্রধান জেনারেল ফজলুর রহমানের বিরুদ্ধে সরকার কোনো ব্যবস্থা নেয়নি কেন? কিসের ব্যবস্থা ৩০০ ভারতীয় সৈন্যের বিরুদ্ধে মাত্র ১০ জন বিডিআর সৈনিক নিয়ে তিনি বাংলাদেশের আজাদী, সম্মান ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করেছেন, সেটাই কি তাঁর অপরাধ? সে জন্যই কি তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের উস্কানি। সেটিই কি হতে যাচ্ছে দেশ প্রেমিকের নাম? এই ভাবেই কি দেয়া হয় দেশপ্রেমের পুরস্কার? যারা এসব উস্কানি দিচ্ছে, তারা আসলে কি চায়? কার স্বার্থরক্ষা করছে এসব আঁতেল? তারা বাংলাদেশের নাগরিক হয়ে ভারতের পক্ষে নির্লজ্জ ওকালতি শুরু করেছে। ভারতের কাছে বাংলাদেশের সম্মান ধুলায় লুণ্ঠিত করছে।

।। চার ।।

এসব কেন হচ্ছে? উদ্দেশ্যটি বুঝতে কেনো অসুবিধা হয় না। কে না জানে যে সরকারের পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছে। এই মুহূর্তে যদি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হয় তাহলে শাসক দল সর্বোচ্চ ৪০টি আসন পেতে পারে। অবশিষ্ট আসন বিরোধী দলের ঘরে চলে যাবে। তাহলে জনপ্রিয়তার বেলুন ফুটো হয়ে যাবে। কিন্তু এখনো তো সরকারী দলের অনেক কাজ বাকী। পিতৃ হত্যার বিচারের রায় কার্যকরী করতে হবে। সেই জন্য তো চাই আরো সময়। সুতরাং আগাম নির্বাচন তো দূরের কথা, নির্ধারিত সময়ে নির্বাচন হলেও আওয়ামী লীগের ভরাডুবি হবে। তাই চাই নড়াচড়া করার একটু সময়। যদি জরুরী অবস্থা জারি করা যায় তাহলে জনগণ এবং বিরোধী দলের সমস্ত মৌলিক অধিকার কেড়ে নেয়া যাবে। আর যদি কৃত্রিম একটি সংঘর্ষ বাধানো যায় তাহলে তার ছুতা ধরে বর্তমান সংসদের মেয়াদ আরো ১ বছর বাড়ানো যাবে। এই দুটো কাজ করার জন্য প্রয়োজন চরম নৈরাজ্য, অভ্যন্তরীণ স্থিতিশীলতা নষ্ট করা এবং সীমান্ত সংঘর্ষ অথবা কৃত্রিম সীমিত যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া। পর্যবেক্ষক মহল বলেন, ১৩ই জুলাইয়ের পূর্বে আরো দু'একটি ভয়াবহ দৃশ্যের মহড়া দেয়া হবে। সীমান্তের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ সেদিকই ইঙ্গিত দেয়। সংবিধানের ১৪১ এবং ৭২(৩) অনুচ্ছেদ তেমন একটি সুযোগ সৃষ্টির সম্ভাবনায় পূর্ণ। আমাদের খটকা, ৭২(৩) এবং ১৪১ ধারার প্রয়োগের জন্য শাসকগোষ্ঠী ইতিমধ্যেই ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে নেমে পড়েছেন।

সূত্র ঃ দৈনিক সংগ্রাম তাং ২৮-৪-২০০১

www.pathagar.com

বাংলাদেশে মিগ-২৯ জঙ্গী বিমান ঃ রুশ ভারত অক্ষশক্তির বিপজ্জনক পুনরুত্থান

বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, বিশেষ করে প্রতিরক্ষা শক্তি নিয়ে আবার নতুন করে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। এবার বিতর্কের উৎপত্তিস্থল মিগ-২৯ জঙ্গী বিমান কেনার সিদ্ধান্ত। এটি সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং বর্তমানে রাশিয়ার নির্মিত যুদ্ধ বিমান। সরকার দেশের সামরিক বাহিনীর জন্য কোন যুদ্ধাস্ত্র কিনবেন কিনা কিনলে সেটা জনগণ পূর্বাহ্নে জানতে পারেন না। এমনকি বিদেশ থেকে অস্ত্রটি ডেলিভারী নিলেও সে খবর জানা যায় না। মাঝে মাঝে যখন মিলিটারী ডিসপ্লে হয় তখনই মানুষ সেই অস্ত্রটির কথা জানতে পারে। সামরিক বাহিনীর আকার আকৃতি এবং তার যুদ্ধাস্ত্র সম্পর্কে সাধারণভাবে কোনো প্রচার করা হয় না। এটাই স্বাভাবিক এবং সঠিক। রাষ্ট্রের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে সশস্ত্র বাহিনীর এই গোপনীয়তা নিয়ে জনসাধারণও এসব বিষয় নিয়ে মাথা ঘামান না এবং দেশের সংবাদপত্রসমূহও এই বিষয়টির চর্চা থেকে বিরত থাকে। তবে সরকার বিষয়টিকে যতই গোপন রাখার চেষ্টা করুক না কেন সমকালীন বিশ্বের এই অবাধ তথ্য প্রবাহের যুগে এসব গোপন তথ্য ঠিকই বেরিয়ে আসে। 'সিপ্রি ইয়ার বুক', লন্ডনের 'মিলিটারী ব্যালান্স', এনসাই ক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা বুক অব দি ইয়ার এনুয়াল রিপোর্ট ইত্যাদির বদৌলতে সামরিক বাহিনী এবং যুদ্ধাস্ত্রের বার্ষিক রিপোর্ট সচেতন জনগণের কাছে ঠিকই সময়মত পৌছে যাচ্ছে। সুতরাং এসব ক্রয়ের সমগ্র প্রেক্ষাপট আমরা ঠিকই জেনে যেতাম। এই সেদিন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেনাবাহিনীর একটি অনুষ্ঠানে মিগ-২৯ জঙ্গী বিমান ক্রয়ের সিদ্ধান্তের পুনরুল্লেখ করেছেন। তবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং বিরোধী দলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সুর ছিল সম্পূর্ণ ভিন্নতর। শেখ হাসিনা এটাকে প্রতিরক্ষা বাহিনী শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে বর্তমান সরকারের একটি ক্রেডিট বা সাফল্য হিসাবে দাবী করছেন। পক্ষান্তরে বেগম জিয়া এর মাধ্যমে আমাদের প্রতিরক্ষা শক্তিকে ভারতের ওপর নির্ভরশীল করার একটি ষড়যন্ত্র হিসাবে বর্ণনা করছেন। উভয় নেত্রীর বক্তব্যই সিরিয়াস বিশ্লেষণ এবং পর্যালোচনার দাবী রাখে। এখানে একটি কথা বলা দরকার যে, শেখ হাসিনা ক্ষমতায় আসার পর থেকে এই এক বছর সাত মাস সময়ে অসংখ্যবার অভিযোগ করেছেন যে, ৭৫ সালে আওয়ামী সরকারের পতনের পর ২১ বছর হল সামরিক বাহিনীকে নাকি শক্তিশালী করার কোনো পদক্ষেপই নেয়া হয়নি। এসব অভিযোগ করার সময় তিনি এমনও দাবী করেছেন যে, তার মরহুম পিতা শেখ মুজিবুর রহমানই নাকি বাংলাদেশ সামরিক বাহিনীকে শক্তিশালী বাহিনী হিসাবে গড়ে তোলার

www.pathagar.com

উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এসব কারণে এসব অভিযোগ, পাল্টা অভিযোগ, দাবী এবং পাল্টা দাবী নিরপেক্ষ পর্যালোচনার দাবী রাখে। প্রসঙ্গত আরো একটি বিষয় এসে যায়। সেটা হল, একশ্রেণীর তথাকথিত আঁতেলদের দাবী। এসব তথাকথিত প্রগতিশীল বিশেষ পলিটিক্যাল ক্যাম্পের আঁতেলরা বিগত একদশক থেকে বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীর সাইজ ছোট করার বিরতিহীন দাবী জানিয়ে আসছিলেন। তবে শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর সশস্ত্র বাহিনীর আকৃতি খর্ব করার ক্লান্তিহীন, বিরতিহীন কোরাসে একটি যতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

।। দুই ।।

প্রথমে বাংলাদেশের বর্তমান সামরিক শক্তি, বিশেষ করে বিমান শক্তির কথা। এ ব্যাপারে প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞরা লন্ডন থেকে প্রকাশিত প্রতিরক্ষা বিষয়ক বার্ষিক রিপোর্ট 'মিলিটারী ব্যালান্সের' ওপর সচরাচর নির্ভর করে থাকেন। মিলিটারী ব্যালান্সের রচনা ও সম্পাদনা করে থাকে, লন্ডনস্থ 'ইন্টারন্যাশনাল ইন্সটিটিউট ফর স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ'। ১৯৯৬-৯৭ সালের মিলিটারী ব্যালান্সে বাংলাদেশের বিমান শক্তির বর্ণনা নিম্নরূপ ঃ

বিমান বাহিনী ঃ

(১) বিমান সেনা-৬৫০০ (+)

(২) জঙ্গী বিমান-৫৭

(৩) জঙ্গী হেলিকপ্টার নাই

জঙ্গী বিমানের বিবরণ ঃ

(ক) চীনা এ-৫ ঃ ১২টি

(খ) চীনা এফ-৬ ঃ ১৬টি

(গ) চীনা এফ-৭ ঃ ১৬টি

(ঘ) চীনা এফ-৭বিঃ ৪টি।

এছাড়া রয়েছে ট্রেনিং বিমান, হেলিকপ্টার, পরিবহন বিমান ইত্যাদি।

নৌবাহিনী ঃ

(ক) নৌসেনা ঃ ১০,০০০ (+)

(খ) ফ্রিগেট ঃ ৪

(গ) কোন সাবমেরিন নাই, ডেস্ট্রয়ার নাই।

সেনাবাহিনী ঃ

(ক) সৈন্য সংখ্যা ঃ ১,০১,০০০

(খ) ট্যাংক ঃ ৮০টি (টি-৫৯, ৬৯, ৬০, ৫৪, ৫৫)

বাংলাদেশের সামরিক বাহিনীর এই সংক্ষিপ্ত খতিয়ান থেকে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীতে যেসব জঙ্গী বিমান রয়েছে সেগুলোর অধিকাংশই হলো মিগ-১৯। একমাত্র এফ-৭ জঙ্গী বিমান হলো রুশ মিগ-২১ এর চৈনিক সংস্করণ। মিগ-২১ একটি সুপারসনিক বিমান হলেও এটা ৩০ বছর আগের বিমান। ১৯৭১ সালের যুদ্ধে আমরা দেখেছি এই বিমানের ব্যবহার। ঐ যুদ্ধে পাকিস্তানের এফ-৮৬ 'স্যাবর'

www.pathagar.com

জেট জঙ্গী বিমানকে আকাশ পথে তাড়া করেছে ভারতীয় মিগ-২১ জঙ্গী বিমান। ভারত এসব মিগ-২১ জঙ্গী বিমান বর্তমান রাশিয়া এবং সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে আমদানি করেছিলো। পাকিস্তানের স্যাবর জেট ৫০/৫১ সালের যুদ্ধ বিমান। স্যাবর জেটের তুলনায় মিগ-২১ ছিলো অনেক দ্রুতগতিসম্পন্ন এবং প্রযুক্তিগতভাবে আধুনিক। কিন্তু সেই মিগ-২১ ও বিংশ শতাব্দীর শেষে এসে হয়ে গেছে সেকেলে। সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর বিমান বহরে অধিকাংশ বিমান মিগ-২১ হওয়াতে সেগুলো আরো সেকেলে।

তবে এখানে একটি বিষয় অবশ্যই উল্লেখের দাবী রাখে যে, আজ সেকেলে হওয়া সত্ত্বেও সশস্ত্র বাহিনীর তিনটি শাখায় যে বিরাট অগ্রগতি হয়েছে সেটা হয়েছে ৭৫ সালের ক্ষমতার পট পরিবর্তনের পর। তখন আমাদের সেনাবাহিনীর সংখ্যা ৬ হাজারের বেশী ছিলো না। পাকিস্তান থেকে বাঙ্গালী সৈন্য ও অফিসারদের স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর তাদেরকে বাংলাদেশের সেনাবাহিনীতে 'এ্যাবজর্ব' করা হয়। এর ফলে সৈন্য সংখ্যা সম্ভবত ২০ হাজারের কিছু বেশী হয়। আজ বাংলাদেশের সামরিক বাহিনীর অফিসার ও জোয়ানের সংখ্যা ১ লাখ ১৮ হাজার। অর্থাৎ প্রথম আওয়ামী শাসন থেকে দ্বিতীয় আওয়ামী শাসন এই মধ্যবর্তী সময়ে সৈন্য সংখ্যা বেড়েছে প্রায় ১ লাখ। অনুরূপভাবে বিমান বাহিনীতেও ছিলো মাত্র ১২টি সোভিয়েত (বর্তমানে রুশ) মিগ-২১ জঙ্গী বিমান। আজ বিমান বাহিনীর শক্তিও বৃদ্ধি পেয়েছে ৬ গুণ। এখানে একটি কথা দ্ব্যর্থহীনভাবে বলে রাখা প্রয়োজন যে, ২১ বছরে সশস্ত্র বাহিনীর তিনটি শাখায় যে সম্প্রসারণ ঘটেছে সেটা প্রয়োজনের তুলনায় মোটেও সন্তোষজনক নয়। যে দেশের জনসংখ্যা ১২ কোটির ওপর সে দেশের সামরিক বাহিনীর বর্তমান অবস্থা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক অপ্রতুল। যে দেশের সীমান্তের তিনটি দিক বেষ্টন করে আছে একটি আধিপত্যবাদী প্রভুত্বকামী পররাজ্য লোলুপ প্রতিবেশী, সেই দেশের সামরিক বাহিনীকে অবশ্যই দুর্জয় ক্ষিপ্রগতি এবং অত্যাধুনিক হতে হবে। স্বাধীনতার রক্ষক হিসেবে আমাদের সশস্ত্র বাহিনীকে কতখানি সম্প্রসারিত করতে হবে সে সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে। আমি এই নিবন্ধের শেষে শুধু মাত্র দু'চারটি পয়েন্ট উল্লেখ করবো। আমাদের সামরিক বাহিনীকে শক্তিশালী ও আধুনিক করার প্রয়োজন নতুন করে আর ব্যাখ্যা করার অবকাশ নেই। এই পটভূমিতে মিগ-২৯ জঙ্গীবিমান আমদানি করার সিদ্ধান্ত বাহ্যিকভাবে আপত্তি করার কিছু দেখা যায় না। কারণ মিগ-২৯ একটি আধুনিক জঙ্গী বিমান। আমেরিকার আধুনিক জঙ্গী বিমানসমূহের তালিকায় যেমন রয়েছে এফ-১৪ 'টম ক্যাট', এফ-১৫ 'ঈগল' অথবা এফ-১৬ 'ফেলক্রাম' অথবা এফ-১৮ 'হরনেট'। তেমনি রাশিয়ার বিমান বহরের সর্বশেষ সংযোজন হলো মিগ-২৯, মিগ-৩১, এবং এসইউ-৩০। আকাশে একটানা ওড়ার ক্ষমতা (রেঞ্জ), বোমা ধারণ ক্ষমতা, মধ্য আকাশে ডগ ফাইট, ইনফ্রারেড, লেসার-রশ্মির দৃষ্টি, শব্দের চেয়েও বেশীগতি এবং ইলেক্ট্রনিক কম্পিউটার ডিভাইস সম্পন্ন সর্বাধুনিক জঙ্গীবিমান হলো মিগ-২৯। তেমন অত্যাধুনিক শক্তিশালী জঙ্গী বিমান যদি আমাদের বিমান বাহিনীর ফ্রিটে যুক্ত হয় তাহলে বাধা দেয়ার কি আছে।

www.pathagar.com

।। তিন ।।

কিন্তু কথায় বলে যে, ঘর পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভয় পায়। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর শেখ মুজিব তার সাড়ে তিন বছরের শাসনামলে যুদ্ধাস্ত্রের মধ্যে মাত্র ১২টি সোভিয়েত মিগ-২১ এবং ১৫টি টি-৫৪ ট্যাংকের অর্ডার দিয়েছিলেন। 'সিপ্রি ইয়ার বুক' মোতাবেক মিগ-২১ বাংলাদেশকে সরবরাহ করা হয়েছিল সেটা সিপ্রি কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত নন। ধরে নেয়া যেতে পারে যে, সবগুলোর সরবরাহ করা হয়েছিল। তাহলেও বলতে হবে সে তৎকালীন ৮ কোটি লোকের দেশে জঙ্গীবিমান মাত্র ১২টি এবং ট্যাংক মাত্র ১৫টি কিন্তু সেখানেও জাতীয় স্বার্থ বিরোধী সবচেয়ে ভয়াবহ ব্যাপার হলো এই যে, ১৯৭৫ সালে সরকার পরিবর্তনের পর সোভিয়েত ইউনিয়ন বা রাশিয়া বাংলাদেশে ঐসব জঙ্গীবিমানের যন্ত্রাংশ সরবরাহ সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেয়। ফলে কিছুদিন পরেই দেখা যায় যে, ঐসব বিমান একটার পর একটা মুখ থুবড়ে পড়তে থাকে। আজ বাংলাদেশ বিমান বাহিনীতে মিগ-২১ এর আর চিহ্ন মাত্র নেই। মিগ-২১ এর অংশবিশেষ আছে বড়জোর আমাদের সেনা সদরে 'এ্যান্টিক' হিসেবে শোভা পেতে পারে। ৭৫-এর পরিবর্তনের পর পরই সোভিয়েত ইউনিয়ন বাংলাদেশকে সর্বপ্রকার সামরিক ও অর্থনৈতিক সাহায্য বন্ধ করে দেয় এবং যন্ত্রাংশ সরবরাহও সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেয়। বাংলাদেশের সৌভাগ্য যে তৎকালীন জিয়া সরকার সামরিক সরঞ্জামের উৎস ডাইভারসিফাউ বা বহুমুখী করতে সক্ষম হন। সেদিন যদি বিকল্প উৎস থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করা না হতো তাহলে আজ বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীর অবস্থা কোথায় গিয়ে দাঁড়াত? বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনী কি তাহলে আনসার বাহিনীর পর্যায়ে নেমে যেত না? যেসব দেশ সামরিক অস্ত্রের সরবরাহকে বিশেষ বিশেষ রাজনৈতিক দলের ক্ষমতায় থাকা না থাকার সাথে শর্তযুক্ত করে দেয় তাদের কাছ থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করা ভয়ংকর বিপজ্জনক।

আজ এই মিগ-২৯ জঙ্গী বিমান সংগ্রহের সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রেও রাশিয়ার অতীত আচরণ স্মরণ করতে হচ্ছে। রাশিয়া থেকে মিগ বিমান ক্রয় কোন আকস্মিক সিদ্ধান্ত নয়। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর গত বছরের প্রথম ভাগে ঢাকায় রুশ সমরাস্ত্রের একটি জমকালো প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। ঐ প্রদর্শনীর কিছুদিন পর গত বছরের ২৬শে মে ঢাকার একটি ইংরেজী দৈনিকে ঢাকাস্থ রুশ চার্জ দ্য এ্যাফেয়ার্সে একটি একান্ত সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়। ঐ সাক্ষাৎকারে তিনি সর্বপ্রথম এই মর্মে একটি তথ্য প্রকাশ করেন যে, রাশিয়া বাংলাদেশের সামরিক বাহিনীর আধুনিকায়ন করবে। সেই ইন্টারভিউয়ের ৭ মাস পর আজ জানা গেল যে, রাশিয়া থেকে মিগ-২৯ জঙ্গী বিমান কেনার সিদ্ধান্ত ইতোমধ্যেই হয়ে গেছে। বোঝা যাচ্ছে যে, বাংলাদেশের পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা নীতি রুশ-ভারত অক্ষশক্তির দিকে হেলে পড়েছে। এই পটভূমিতে আজ কয়েকটি প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন ঃ

www.pathagar.com

১। একটি ব্যাপার স্পষ্ট বোঝা গেল যে, বাংলাদেশের রাষ্ট্র ক্ষমতায় আওয়ামী লীগ অধিষ্ঠিত হলে রুশ-ভারত অক্ষশক্তির সামরিক সরবরাহের উৎস মুখ খুলে যায়। আবার আওয়ামী লীগ ক্ষমতাচ্যুত হলেই সেই উৎসমুখ বন্ধ হয়ে যায়। আজ যদি বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীকে রুশ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করা হয় তাহলে সেই সব অস্ত্র এবং তার যন্ত্রাংশ যে অব্যাহত থাকবে তার গ্যারান্টি কোথায়? আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় না থাকলে কি হবে? নাকি তারা ধরেই নিয়েছেন যে আওয়ামী লীগ অনন্তকাল ক্ষমতায় থাকবে?

২। পাকিস্তানের সশস্ত্র বাহিনী চীন, মার্কিন ও ফরাসী অস্ত্রে সজ্জিত। আমেরিকা যখন অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ করে তখন পাকিস্তান চীন বা ফ্রান্স থেকে অস্ত্র কেনে। আজ তাই পাক বিমান বাহিনীতে যেমন রয়েছে মার্কিন এফ-১৬, তেমনি ফরাসী মিরেজ, আবার তেমনি চীনা এফ-৭ এবং সর্বশেষে এফ-৮। রুশ ব্লকের ইউক্রেন থেকেও পাকিস্তান ট্যাংক ও এস ইউ-২৭ বিমান ক্রয় করেছে। রাশিয়ার নিকট থেকেও তারা এসইউ-৩০ জঙ্গী বিমান কিনতে চেয়েছিল। কিন্তু রুশরা দেয়নি। ভারতীয় অস্ত্র ভাণ্ডারেও তেমনি রয়েছে রুশ ও ফরাসী অস্ত্র। এক কথায় প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম ক্রয়ের ব্যাপারে তাদের হাত-পা কোথাও বাঁধা নেই। তাহলে আমাদের অর্থাৎ বাংলাদেশের হাত-পা ভারত ও রাশিয়ার নিকট বাঁধা থাকবে কেন? জনগণ কি আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়েছিল রুশ-ভারত ক্যাম্পে ঢুকে পড়ার জন্য?

৩। ভারতের ভাণ্ডারে রয়েছে ৩২৪টি মিগ-২১ এবং ৬৫টি মিগ-২৯। এছাড়াও 'হিন্দুস্তান এ্যারোনেটিক্স' নামক সমরাস্ত্র কারখানায় মিগ বিমান রিবিল্ড করা হচ্ছে। অর্থাৎ মিগ বিমানের মেরামত, রক্ষণাবেক্ষন এবং পুনসংযোজন ও পুনর্নির্মাণ করা হচ্ছে। এসব করার জন্য রাশিয়া ভারতে একটি বড় কমপ্লেক্স স্থাপনে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিয়েছে। দক্ষিণ এশিয়া এবং দূরপ্রাচ্যের দেশগুলোর মিগবহরের মেরামত ও আধুনিকায়নের জন্য রাশিয়া ভারতের কাছে পাঠাচ্ছে। এর ফলে বাংলাদেশের সামরিক বাহিনী, বিশেষ করে বিমানবাহিনী চূড়ান্ত পরিণামে ভারত নির্ভর হয়ে পড়ছে না কি? এভাবে সরাসরি না খেয়ে আওয়ামী লীগ সরকার হাত ঘুরিয়ে খাওয়ার কৌশল নিচ্ছে কেন?

সুতরাং মিগ বিমান ক্রয়কে ওয়ান টাইম সওদা হিসেবে বিবেচনা করলে চলবে না। এর সাথে জড়িত রয়েছে দীর্ঘমেয়াদী নিরাপত্তার প্রশ্ন, দীর্ঘমেয়াদী অব্যাহত সরবরাহের প্রশ্ন। আরও রয়েছে অন্য দেশ থেকে অস্ত্র কেনার প্রশ্ন। এসব প্রশ্নের সুরাহা না করে রুশ-ভারত অক্ষশক্তির কোলে ঝাঁপ দিলে জনগণ সেটা মেনে নেবে না।

সূত্র ঃ দৈনিক সংগ্রাম, তাং ১৫-১-৯৮

www.pathagar.com

শেখ হাসিনার সামরিক দর্শন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেদিন বাশার বিমান ঘাঁটিতে গিয়েছিলেন। তিনি টি-৩৭ ট্রেনিং বিমান কমিশন করলেন। এ উপলক্ষে বক্তৃতা করতে গিয়ে তিনি বললেন যে, গত ২৪ বছরে বাংলাদেশ বিমানবাহিনীতে কোন আধুনিক জঙ্গী বিমান সংগ্রহ করা হয়নি। একথা বলার পর তিনি বলেন যে, তাঁর পিতা মরহুম শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশে একটি শক্তিশালী ও আধুনিক সেনাবাহিনী গড়তে চেয়েছিলেন। তাঁর পিতার আমলে বাংলাদেশ সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে এক স্কোয়াড্রন অর্থাৎ ১২টি মিগ-২১ জঙ্গী বিমান লাভ করে। এরপর তিনি প্রতিশ্রুতি দেন যে, তাঁর সরকার দেশে একটি শক্তিশালী ও আধুনিক সেনাবাহিনী গড়ে তুলবে। শেখ হাসিনার বক্তব্যের তিনটি অংশ বিস্তারিত আলোচনা ও ব্যাখ্যার দাবি রাখে। প্রথমটি হল এই যে, গত ২৪ বছরেও বিমানবাহিনীতে কোনো আধুনিক জঙ্গী বিমান যুক্ত হয়নি। কারিগরি ও প্রযুক্তিভাবে বিচার করলে দেখা যাবে যে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এই মন্তব্য প্রকৃত সত্য থেকে দূরে নয়। আমাদের বিমানবাহিনীর কম্পোজিশন বা স্ট্রাকচার পর্যালোচনা করলে একটি ধারণা পাওয়া যায়। এর পাশাপাশি পৃথিবীর উন্নত দেশগুলো বাদ দিলেও যদি ভারত এবং পাকিস্তানের বিমানবাহিনীর সাথে আমাদের বিমানবাহিনীর তুলনা করি তাহলে এই আধুনিকতার স্বরূপ সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া যাবে। লন্ডন থেকে সারা দুনিয়ার সবগুলো দেশের সৈন্য ও যুদ্ধাস্ত্র সম্পর্কে একটি বার্ষিক রিপোর্ট বের হয়। '৯৬-৯৭ সালের এই রিপোর্ট থেকে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের বিমানবাহিনীতে রয়েছে নিম্নলিখিত বিভিন্ন টাইপের বিমান। এগুলো হল ঃ এ-৫, এফ-৬, এফ-৭। এছাড়া রয়েছে পরিবহন বিমান এএন ৩২ এবং ট্রেনিং বিমানের মধ্যে পিটি-৬, টি-৩৭ ইত্যাদি।

স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ রুশ-ভারত অক্ষশক্তির পক্ষপুটে আশ্রিত হয়ে পড়ে। অনুদান হিসাবে সোভিয়েত ইউনিয়ন বাংলাদেশকে ১২টি মিগ-২১ জঙ্গী বিমান দেয়। এসব বিমানের তালিকা আলোচ্য বার্ষিক রিপোর্টে নেই। না থাকাটাই স্বাভাবিক। '৭৫ সালে সরকার পরিবর্তনের পর নতুন সরকার একটি স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করে। ফলে মস্কো সরকার ঢাকাকে নতুন কোনো বিমান তো দিলই না, উপরন্তু এসব জঙ্গী বিমানের যন্ত্রাংশ ও সরবরাহ বন্ধ করে দেয়। ফলে এই ১২টি বিমান অকেজো হয়ে পড়ে। এখন এগুলো সম্ভবত এ্যান্টিক হিসাবে শোভা পাচ্ছে। আমাদের বিমানবাহিনীতে যেসব জঙ্গী বিমান রয়েছে সেগুলো সব চীনের তৈরি। এ-৫ বা এফ-৬ বিমানটি রাশিয়ার মিগ-১৯ বিমানের চীনা সংস্করণ। এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিচার করলে প্রধানমন্ত্রীর কথাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

www.pathagar.com

এর পাশাপাশি ভারত এবং পাকিস্তানের বিমানবাহিনীর তুলনা করা যেতে পারে। ভারতের বিমানবাহিনীতে নিম্নোক্ত টাইপের বিমান রয়েছে।

(১) মিগ-২১ (২) মিগ-২৩ (৩) মিগ-২৫ (৪) মিগ-২৭ (৫) মিগ-২৯ (৬) জাগুয়ার (৭) মিরাজ-২০০০ (৮) ক্যানবেরা (৯) অজিত। এগুলোর মধ্যে মিগ-২৯ এবং মিরাজ-২০০০ অত্যন্ত আধুনিক জঙ্গী বিমান। জাগুয়ারকে আধুনিক বন্ধনীর ভেতর ফেললে বলা যায় যে, ভারতীয় বিমানবাহিনীতে আধুনিক বিমানের সংখ্যা অন্তত ২শ'। ভারতের মোট জঙ্গী বিমানের সংখ্যা অন্তত ৯শ'।

এর পাশাপাশি পাকিস্তান বিমানবাহিনীর জঙ্গী বিমানের পর্যালোচনা করা যায়। পাকিস্তান বিমানবাহিনীতে রয়েছে মিরাজ-৩, মিরাজ-৫, এফ-৭ এবং মিরাজ ১১১। এছাড়া রয়েছে ৩৮টি এফ-১৬ ফ্যালকন। মোট জঙ্গী বিমানের সংখ্যা ৪শ' ৮০। এসব বিমানের মধ্যে সর্বাধুনিক এফ-১৬ ফ্যালকন। এই বিমানের যোগানদার আমেরিকা। মিরাজ-১১১ আধুনিক জঙ্গী বিমানের পর্যায়ে পড়ে। এখানে একটি জিনিস লক্ষ্য করার রয়েছে। সেটা হল এই যে, পাকিস্তান এবং ভারতের বিমানবহর শুধুমাত্র একটি দেশের জঙ্গী বিমান দিয়ে সজ্জিত নয়। ভারতের যেমন রয়েছে মিগ-২৯ বা মিরাজ-২০০০ এর মত ভীতিকর রুশ ও ফরাসী যুদ্ধ বিমান, তেমনি পাকিস্তানেরও রয়েছে এফ- ১৬ এর মত ভয়াবহ মার্কিন জঙ্গী বিমান। কিন্তু বাংলাদেশের সরবরাহ সূত্র ছিল মাত্র একটি। সোভিয়েত ইউনিয়ন বিলুপ্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ভারত সোভিয়েত গাঁটছড়ায় বন্দী ছিল। ফলে স্বাভাবিকভাবে ভারতীয় সামরিক বাহিনীতে কোনো মার্কিন অস্ত্র নেই। পক্ষান্তরে পাকিস্তান ছিল একই সাথে আমেরিকা ও চীনের মিত্র। তাই পাকিস্তানের অস্ত্রভাণ্ডারে চীন ও মার্কিন উভয় অস্ত্রই লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু আমেরিকা ভারতের দিকেও অনেকখানি হেলে পড়ে। ইসরাইল এবং ভারতের চাপে ইসলামী আন্দোলনে সমর্থন দেয়ার তথাকথিত অপরাধে আমেরিকা দীর্ঘদিন ধরে পাকিস্তানে অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ রাখে। এ কারণে পাকিস্তান কায়েম হওয়ার পর প্রথম দিকে পাকিস্তানে মার্কিন অস্ত্র কিছুটা সরবরাহ করা হলেও পরবর্তীতে পাকিস্তানে মার্কিন অস্ত্র প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায় এবং চীনের প্রবাহ বৃদ্ধি পায়।

স্বাধীনতার পর প্রথম সাড়ে তিন বছর বাংলাদেশ ভারতের উপাঙ্গে পরিণত হয়। এর ফলে রুশ-ভারত অক্ষশক্তির বাইরে দৃষ্টি নিক্ষেপের স্বাধীনতা বাংলাদেশ হারিয়ে ফেলে। '৭৫ সালে সরকার পরিবর্তনের পর ভারতের করালগ্রাস থেকে বাংলাদেশ মুক্ত হয়। আর এই সময় থেকেই বাংলাদেশের সামরিক বাহিনী গড়ে উঠতে থাকে। তাই দেখা যায় যে, বাংলাদেশের সামরিক বাহিনীর তিনটি শাখাই গড়ে উঠেছে চীনা অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে। এখানে একটি জিনিস বোধগম্য হয় না, ভারতের প্রভুত্ব থেকে মুক্ত হয়ে বাংলাদেশ যখন হাত-পা নড়াচড়া করার স্বাধীনতা ফিরে পেল, তখন অস্ত্র সংগ্রহের জন্য বাংলাদেশ ওয়াশিংটনের দিকে ঝুঁকল না কেন? অন্তত বাংলাদেশের যুদ্ধাস্ত্রের কাঠামোতে আমেরিকার কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। একটি কারণ এই হতে পারে যে, চীন কিছু অস্ত্র অনুদান হিসেবে এবং কিছু অস্ত্র লম্বা সময়ে কর্জ হিসেবে দিয়ে থাকে। আমেরিকা এই ব্যাপারে বড় বেনিয়াসুলভ আচরণ করে।

www.pathagar.com

।। দুই ।।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন যে, তাঁর পিতা মরহুম শেখ মুজিবুর রহমান একটি শক্তিশালী সামরিক বাহিনী গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পিতার মৃত্যুর পর যেসব সরকার ক্ষমতায় এসেছে তারা এই ব্যাপারে তেমন কিছু করেননি। আমার মনে হয় যে, একটি সুষ্ঠু গঠনমূলক এবং ইতিবাচক জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি গঠনের জন্য প্রতিটি ইস্যুতেই অতীতকে টেনে আনা ঠিক নয়। সবকিছুর মধ্যেই শেখ মুজিবকে টেনে আনা এবং তাঁর স্বপক্ষে কথা বলা স্বয়ং শেখ মুজিবের ভাবমুর্তিকেই প্রশ্নসাপেক্ষ করে তুলবে। আবার সবকিছুতেই বিএনপিকে টেনে আনা এবং তার অতীতের সমালোচনা করাও বিজ্ঞের কাজ নয়। এ ধরনের সমালোচনা 'বুমেরাং' হতে পারে। নিরাসক্ত মনে পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, কেউই সমালোচনার উর্ধ্বে নয়। কঠোর বাস্তব হচ্ছে এই যে, স্ট্রং মিলিটারী গড়ার জন্য বাংলাদেশের নতুন সরকার উল্লেখ করার মত কিছুই করেননি। অস্ত্র এবং গোলাবারুদের কারখানাটিও বাংলাদেশ আমলে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এটা স্থাপিত হয়েছে তারও আগে। তবে শেখ মুজিবের সরকার একটি 'বেনিফিট অব ডাউট' পেতে পারেন। কারণ তাঁর স্থায়িত্বকাল ছিল সাড়ে ৩ বছর। তবে এই সাড়ে ৩ বছরে তিনি কিন্তু আধুনিক ট্যাঙ্ক, জঙ্গী বিমান, ফ্রিগেট, ডেস্ট্রয়ার প্রভৃতির ব্যবস্থা করতে পারতেন। নিদেনপক্ষে অর্ডার তো প্লেস করতে পারতেন। '৭৫ সালের রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর গত ২১ বছর ধরে যারা দেশ শাসন করেছেন তাদের দায়-দায়িত্ব এ ব্যাপারে ছিল আরো বেশি। তারা ২১ বছরে বেশ কিছু করেছেন। এর আগে যেসব পরিসংখ্যান দেওয়া হয়েছে সেসব পরিসংখ্যান আমাদের এই বক্তব্যকে সমর্থন করে। সামরিক বাহিনীতে জনশক্তি ছিল ২৮ হাজার। এর মধ্যে প্রায় সকলেই ছিলেন পাকিস্তান ফেরত। সুতরাং সামরিক বাহিনীতে দেশের প্রথম সরকার বলতে গেলে কোনো রিক্রুটমেন্ট করেনি। কিন্তু এখন ঐ বার্ষিক রিপোর্ট অনুযায়ী সামরিক বাহিনীর জনসংখ্যা হল ১ লাখ সাড়ে ১৭ হাজার। একডজন খয়রাতী বিমান ছাড়া বিমানবাহিনীতে আর কোনো জঙ্গী বিমান ছিল না। এখন জঙ্গী বিমানের সংখ্যা ৮৫টি। নৌবাহিনীতে রয়েছে ৮০টি ট্যাঙ্ক। তবে এসব যথেষ্ট নয়।

উন্নত দেশগুলো তো দূরের কথা, ভারত-পাকিস্তানও তাদের সামরিক বাহিনীর তিনটি শাখাকেই ক্ষেপণাস্ত্রে সজ্জিত করেছে। ভূমি থেকে ভূমি, ভূমি থেকে আকাশ এবং আকাশ থেকে ভূমি- এই তিন ধরনের মিসাইল এই দুইটি দেশের সশস্ত্র বাহিনীতেই রয়েছে। কিন্তু আমাদের সামরিক বাহিনীর জন্য এগুলো একটি স্বপ্নের ব্যাপার।

বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা বিশাল ও সুবিস্তৃত। ১ হাজার মাইলের বেশী সমুদ্রসীমা পৃথিবীর বহু দেশেই নেই। অথচ স্বাধীনতার ২৬ বছর পরেও সেই দেশে নেই কোন ডেস্ট্রয়ার, নেই কোনো সাবমেরিন। বাংলাদেশের প্রথম সরকারের আমলের শেষ বছরে প্রতিরক্ষা বাজেট ছিল ৭১ কোটি টাকা। '৯৫-৯৬ সালের বাজেটে ঐ বরাদ্দ ২ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে। তারপরেও ডেস্ট্রয়ার বা ফ্রিগেট যুক্ত হয়নি কেন? এখন তো আমরা জানি যে, যুদ্ধাস্ত্র কেনার জন্য সব সময় নগদ অর্থের প্রয়োজন হয় না। অনুদান সব সময় পাওয়া না গেলেও সাপ্লায়ার্স ক্রেডিট বা ডেফার্ড পেমেন্টেও সমরাস্ত্র কেনা যায় এবং এসব পেমেন্টের কিস্তিও সংখ্যায় অনেক বেশী এবং মেয়াদে অনেক লম্বা হয়ে থাকে।

www.pathagar.com

।। তিন।।

শেখ হাসিনা একটি শক্তিশালী ও আধুনিক সামরিক বাহিনী গড়ে তোলার ওয়াদা বারবার করছেন। আমরা তাঁর সাফল্য কামনা করি। ওপরের তথ্যগুলো তাঁর এ কাজে সাহায্য করতে পারে।

ইসরাইল একটি ছোট দেশ। জনসংখ্যা ৫৮ লাখ। অথচ তার ট্যাঙ্কের সংখ্যা ৪ হাজার ৩শ'। পাকিস্তানের জনসংখ্যা ১৩ কোটি ৩৩ লাখ। তাদেরও ট্যাঙ্কের সংখ্যা ৩ হাজার ৬শ'। বাংলাদেশের জনসংখ্যা সাড়ে ১২ কোটি। অথচ আমাদের ট্যাঙ্কের সংখ্যা মাত্র ৮০ টি।

ওদের কথা বাদ দেওয়া যাক। আমাদের নিকট প্রতিবেশী বার্মা। তাদের জনসংখ্যা ৪ কোটি ৭৭ লাখ। ৭/৮ বছর আগেও আমরা বার্মার দিকে করুণার চোখে তাকাতাম। অথচ আজ তাদের সামরিক বাহিনীর জনশক্তি হল ৩ লাখ ২১ হাজার। শ্রীলঙ্কার জনসংখ্যা ১ কোটি ৮৩ লাখ। একটি ছোট দ্বীপ দেশ। অথচ তাদেরও সামরিক বাহিনীর জনশক্তি ১ লাখ ১৫ হাজার। আর আমরা জনসংখ্যার দিক দিয়ে শ্রীলঙ্কার চেয়ে ৬ গুণ বেশী, বার্মার চেয়ে ৩ গুণ বেশী এবং পাকিস্তানের প্রায় সমান সমান। অথচ আমাদের সামরিক বাহিনীর জনশক্তি মাত্র ১ লাখ ১৭ হাজার। আমাদের সামরিক বাহিনীর শক্তি পাকিস্তানের সমান সমান হওয়া দরকার।

আমাদের সামরিক বাহিনী নিয়ে প্রধানমন্ত্রী যখন পরিকল্পনা রচনা করবেন তখন এসব তথ্য ও পরিসংখ্যান বিবেচিত হবে বলে জনগণ আশা করে।

সূত্র ঃ দৈনিক ইনকিলাব; তাং ২০-৫-৯৭

www.pathagar.com

ভারতীয় 'অগ্নির' লেলিহান শিখা

গত ২০ এপ্রিল ভারত উড়িষ্যার বালাসর নামক একটি গ্রামে ১৬০০ কিলোমিটার অর্থাৎ ৯৬০ মাইল পাল্লার 'অগ্নি' নামক দূরপাল্লার ব্যালাস্টিক মিসাইলের পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ সাফল্যের সাথে সমাপ্ত করেছে। এই বিস্ফোরণের পূর্বেই বালাসর গ্রাম এবং সংলগ্ন এলাকা থেকে নিরাপত্তার কারণে ১১ হাজার গ্রামবাসীকে অন্যত্র সরিয়ে দেয়া হয়। এক টন বোমা বহন ক্ষমতা সম্পন্ন এ দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র 'অগ্নির' পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণের বিরুদ্ধে খোদ উড়িষ্যাতেই ব্যাপক বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয়। গত সোমবার উড়িষ্যার প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সমরেন্দ্র কুন্ডুর নেতৃত্বে পরিচালিত বিক্ষোভে বলেন যে, এই বিস্ফোরণের ফলে আঞ্চলিক ভিত্তিতে ব্যাপক অস্ত্র প্রতিযোগিতা শুরু হবে। কুন্ডুর মতে, বৃহৎ শক্তির নৌবাহিনী ইতিমধ্যেই ভারত মহাসাগরে অবস্থান করছে। আজ যদি কেউ ভাবেন যে, তারা এই বিস্ফোরণের পর চুপ করে বসে থাকবে তাহলে তিনি আহম্মকের স্বর্গেই বাস করছেন।

বিপুল সমর সজ্জার সূচনা

১৯৬২ সালে চীনের সাথে যুদ্ধে শোচনীয়ভাবে মার খাওয়ার পর ভারত তার সামরিক শক্তি বৃদ্ধির দিকে নজর দেয়। তখন তাঁর মাথাব্যথা ছিল চীন এবং চীন-ভারতের মধ্যবর্তী হিমালয়ের বিস্তীর্ণ পর্বত সঙ্কুল এলাকা। এই উদ্দেশ্যে ব্যাপকভাবে মাউন্টেন ডিভিশন বা পর্বত সেনা গড়ে তোলা হয়। ১৯৬৫ সালে পাক ভারত যুদ্ধের ফলাফল প্রায় সমান সমান হওয়ায় উভয় দেশে মিলিটারী ব্যালান্স বা সামরিক শক্তিসাম্যের থিওরী মোটামুটি অপরিবর্তিত থাকে। এরপর ইন্দিরা গান্ধী ক্ষমতায় এসে এই শক্তিসাম্য ব্যাপকভাবে ভারতের অনুকূলে নেয়ার জন্য বিপুল সমরসজ্জায় মেতে ওঠেন। ১৯৭১ সালের পাক-ভারত যুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ায় একদিকে পাকিস্তানের তুলনায় ভারতের সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব সন্দেহাতীতভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। অন্যদিকে ভৌগোলিকভাবে ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ড রাখার আর কোন প্রয়োজন না থাকায় সমগ্র স্থল বাহিনীকে ভারত, চীন ও পাকিস্তান সীমান্তে মোতায়েন করার সুযোগ পায়। বাংলাদেশের বিচ্ছিন্নতার অবধারিত পরিণতিতে পাকিস্তানের সামরিক শক্তির উপর কাশ্মীরের ভরসা কমে যায়। ফলে শেখ আব্দুল্লাহ ভারত অধিকৃত কাশ্মীরকে ভারতভূমির সিদ্ধান্ত মেনে নেন। এর পরিণতিতে কাশ্মীর সীমান্তে ভারতের মাথাব্যথা কমে যায় এবং সিয়াচেন হিমবাহের এই সামরিক দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে ভারত অধিকতর মনোযোগ দেয়।

www.pathagar.com

বর্তমান সমরশক্তি

প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী মাতা ইন্দিরার চেয়ে উগ্র ও জঙ্গীবাদী। দাদা পণ্ডিত নেহেরুর 'ডিসকভারী অব ইন্ডিয়ায়' বর্ণিত অখণ্ড ভারতের রামরাজ্য প্রতিষ্ঠায় তিনি সর্বশক্তি নিয়োগ করেছেন। আজ তাই সংখ্যার দিক দিয়ে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী পৃথিবীর চতুর্থ বৃহত্তম। প্রথম ঃ চীন- ৩২ লাখ। দ্বিতীয় ঃ আমেরিকা- ২২ লাখ। তৃতীয় ঃ রাশিয়া-১৯ লাখ। চতুর্থ ঃ ভারত-১৪ লাখ। আগ্রার তাজমহল থেকে মাত্র ৫ মাইল দূরে রয়েছে ভারতের ভূগর্ভস্থ শক্তিশালী বিমান ঘাঁটি। এই ঘাঁটি থেকেই উড়ে গিয়েছিলো ভারতীয় জঙ্গী বিমান এবং প্রচণ্ড ক্ষিপ্রতায় দখল করেছিল প্রবালদ্বীপ মালদ্বীপ। বোম্বে মাজাগণে রয়েছে বিরাট শিপইয়ার্ড। এখানে তৈরি হচ্ছে জার্মান হান্টার কিলার সাবমেরিন। মহারাজপুরে রয়েছে আরেকটি শক্তিশালী বিমানঘাঁটি। এখানে রয়েছে ৫০টি ফ্রেঞ্চ মিরাজ-২০০০ মডেলের জঙ্গী বিমান। শুধু এই ৫০টি বিমানের জন্যই ব্যয় হয়েছে ১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, বাংলাদেশী টাকায় যার মূল্য ৩ হাজার ৫শ' কোটি টাকা। বাঙ্গালোরের দক্ষিণাংশে রয়েছে হাল্কা জঙ্গী বিমান প্রকল্প, যে বিমান নির্মাণে আইবিএম কম্পিউটার প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে। এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে ভারত শুধু আঞ্চলিক পরাশক্তিই নয়, বিশ্বের ষষ্ঠ পরাশক্তি হিসেবে আবির্ভূত হবে। এই প্রকল্পে খরচ হয়েছে বাংলাদেশী মুদ্রায় সাড়ে তিন হাজার কোটি টাকারও বেশী অর্থ। বাঙ্গালোরে রয়েছে দৈত্যকায় প্রকল্প 'হিন্দুস্তান এ্যারোনোটিকস্ লিঃ। এখানে তৈরি হচ্ছে ইঙ্গ-ফরাসী দ্রুতগতি সম্পন্ন জাগুয়ার জঙ্গী বিমান। এখান থেকে আরও ৫শ' মাইল উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত নাসিকা। এখানে হাইপার সনিক স্পীডের সোভিয়েত মিগ-২৭ নির্মিত হচ্ছে। শিগগিরই এখানে সোভিয়েত মিগ-২৯ উৎপাদিত হবে। দক্ষিণ ভারতের কর্ণাটক রাজ্যে নির্মাণ করা হয়েছে বিরাট জাহাজ নির্মাণ কারখানা। এখানে রয়েছে সাবমেরিন, অন্যান্য ভাসমান যান এবং ত্রিশ হাজার টন ক্ষমতা সম্পন্ন বিমানবাহী জাহাজ। ভারতের বিশাল সামরিক বাহিনী এবং ভবিষ্যত সমরসজ্জা ও সমরাস্ত্র নির্মাণ প্রকল্পের বিস্তারিত বিবরণ এই নিবন্ধের স্বল্প পরিসরে দেয়া সম্ভব নয়। সম্মানিত পাঠক ভাইয়েরা জেনে রাখুন, ১৪ লাখ সদস্যের সামরিক বাহিনীর রক্ষণাবেক্ষণ নিত্য নতুন সমরসম্ভার সংগ্রহ ও বিরাট সমরশিল্প খাত অর্থাৎ প্রতিরক্ষা খাতে ভারতের বাৎসরিক ব্যয় বাড়তে বাড়তে ১৯৮৮ সালে বাংলাদেশী টাকায় ৪৪ হাজার কোটি টাকায় এসে দাঁড়িয়েছে।

এ দানবশক্তি অর্জনের মতলব কি?

সামরিক ক্ষেত্রে এ দানবশক্তি অর্জনের আসল মতলব কি? এ সম্পর্কে আমেরিকার বিশ্ববিখ্যাত টাইম সাময়িকীর এক সাম্প্রতিক সংখ্যায় এক অস্ট্রেলিয়ার সামরিক গোয়েন্দা অফিসারের বক্তব্য ছাপা হয়েছে। ঐ সামরিক গোয়েন্দা অফিসার জানিয়েছেন

www.pathagar.com

যে, ১৯৮৮ সালে অস্ট্রেলিয়ার নৌ পোতাশ্রয় সিডনীতে এক ভারতীয় জাহাজ আটক করা হয়। ভারতীয় অস্ত্রে জাহাজটি বোঝাই ছিল।

ফিজিতে ভারতীয় বংশোদ্ভুত ফিজিয়ানদের মাঝে এ অস্ত্র বিতরণ করত ভারত, যাতে তারা সেখানে একটি সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটিয়ে একটি ভারতীয়পন্থী সরকারকে ক্ষমতায় বসাতে পারে। ঐ সময় ফিজিতে গোষ্ঠীগত দাঙ্গা চলছিল। একপক্ষে ছিল ভারতীয় ফিজিয়ান। তদন্তে প্রকাশ পায়, ঐ দাঙ্গার সুযোগে সুদূর ফিজিতে ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য ভারতের কেন্দ্রীয় সংস্থা 'রিচার্স এ্যাড এ্যানালাইসিস উইং' এই সশস্ত্র অভ্যুত্থানের আয়োজন করে। এই ভয়াবহ ষড়যন্ত্র উদ্‌ঘাটিত হওয়ায় রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতায় উদ্বিগ্ন হয়ে ইন্দোনেশিয়া সুমাত্রা দ্বীপে একটি বৃহৎ নৌ ঘাটি গড়ে তোলার পরিকল্পনা নিয়েছে।

নিরাপত্তা পরিষদে স্থায়ী আসন চাই

ভারতের সামরিক আকাংখা সম্পর্কে নৌবাহিনীর এ্যাড্‌মিরাল কৃষান নায়ার বলেন, "বিশ্বের রাষ্ট্রগুলো আমেরিকা বা সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে গাটছড়া বেঁধে চলতে অভ্যস্ত। চীনের সাথে গাটছড়ায় আজকাল বাঁধা হচ্ছে। অতি শিগ্‌গীর বিশ্বমানবের এ অভিজ্ঞতা হবে যে ভারতও একটি পরাশক্তি। এ পরাশক্তির আশ্রয়েও অভিভাবকত্বের কিছু দেশ রয়েছে।

প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে ভারতের বিখ্যাত তাত্বিক কৃষ্ণস্বামী সুব্রমনিয়াম বলেন, "ভারত আন্তর্জাতিক অঙ্গনে একদিন তার যোগ্য স্থান পাবে। বিশ্বের এই দ্বিতীয় বৃহত্তম রাষ্ট্র জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য নয়। এটা ভারতের জন্য এক বঞ্চনা।" আরেকজন তাত্বিক গিরিজা শংকর বলেন, "আমাদের নেতৃবর্গ এটা মনে করেন যে, বিশ্বসমাজে ভারতের একটা যোগ্য আসন পাওয়া উচিত।" ভারতের প্রাক্তন পররাষ্ট্র সচিব সুয়ারান বলেন, "চীনকে যদি পরাশক্তি হিসেবে স্বীকার করে নেওয়া হয় তাহলে ভারতকে স্বীকার করে নিতে আপত্তি কোথায়?"

ব্লু ওয়াটার নেভী–অস্ট্রেলিয়া থেকে মৌরিতানিয়া

টাইম ম্যাগাজিনের নিবন্ধকার ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের শীর্ষস্থানীয় অফিসারদের সাথে জনৈক পশ্চিমা কূটনীতিবিদদের আলোচনার সারাংশ তুলে ধরেন। ঐ কূটনীতিবিদ বলেন, "পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের যুক্তি হচ্ছে, দক্ষিণ আফ্রিকায় যেভাবে গণ অসন্তোষ লেগে আছে সেই প্রেক্ষিতে ভারতকে ব্লু ওয়াটার নেভী গড়ে তুলতেই হবে।" ভারত এখন তার প্রভাব বলয়ের মধ্যে শুধু মালদ্বীপই নয়, মৌরিতানিয়া পর্যন্ত অন্তর্ভুক্ত করার চিন্তা করছেন। যদিও মৌরিতানিয়া ভারতের চেয়ে আফ্রিকার অনেক নিকটবর্তী।

www.pathagar.com

ভারত একরাতের মধ্যেই আণবিক বোমা বানাতে পারে

প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর এক নিকট সূত্র বলেছেন, ভারত রাতারাতি একটি পারমাণবিক বোমা বানাতে পারে। কৃষ্ণস্বামী সুব্রমনিয়াম বলেন, "আপনি যদি পারমাণবিক শক্তিসমৃদ্ধ বিশ্বে বাস করতে চান তাহলে আপনার হাতে অবশ্যই একটা বোমা থাকতে হবে। বিশ্ব বর্তমানে যদি ৫/৬ টি পরাশক্তি নিয়ে বাঁচতে পারে তাহলে ভবিষ্যতে আরও ১১/১২টি পরাশক্তি নিয়েও বাঁচতে পারবে।"

প্রতিবেশীরা হুঁশিয়ার

এই নিবন্ধ শুরু করেছিলাম দূর পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র 'অগ্নির' পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ দিয়ে। ভারত যেভাবে বিন্ধাচল থেকে মালদ্বীপ, কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারিকা, শ্রীলংকা থেকে ফিজি এবং এখন মৌরিতানিয়া পর্যন্ত থাবা বিস্তার করছে, পণ্ডিত নেহেরুর রামরাজত্ব বাস্তবায়িত করার জন্য নাতি রাজীব গান্ধী তার নখর মেলে ধরছেন, 'অগ্নি' সেই বিষাক্ত থাবারই একটি নখর। এই নখরাঘাত থেকে কারও নিস্তার নাই। কাশ্মীর, জুনাগড়, মানভাদাড়, গোয়া, দমন, দিউ, সিকিম, ভূটান, শ্রীলংকা ও মালদ্বীপে ভারত বিষাক্ত ছোবল মেরেছে। তার বিষ নিঃশ্বাসে জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে নেপাল। ক্রুদ্ধ ছোবল হানছে বাংলাদেশকে। 'অগ্নির' লেলিহান শিখা থেকে বাঁচতে হলে পাকিস্তান, বাংলাদেশ, শ্রীলংকা, নেপাল, আফগানিস্তান, ভূটানসহ সমস্ত প্রতিবেশীকে কাতারবন্দী হতে হবে ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে।

সূত্র ঃ পত্রিকা ঃ ২১-৪-৮৯

www.pathagar.com

সোফা ও হানা ঃ থাকে শুধু অন্ধকার মুখোমুখি বসিবার, বনলতা সেন

হাজার বছর ধরে আমি পথ
হাটিতেছি পৃথিবীর পথে
সিংহল সমুদ্র থেকে
নিশীথের অন্ধকারে মালয় সাগরে·
অনেক ঘুরেছি আমি
বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে
সেখানে ছিলাম আমি
আরো দূরে অন্ধকারে বিদর্ভ নগরে।
চুল তার কবেকার
অন্ধকার বিদিশার নিশা
মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য
অতিদূর সমুদ্রের পর
হাল ভেঙ্গে যে নাবিক
হারিয়েছে দিশা।

জীবনানন্দ দাসের 'বনলতা সেন' কবিতার প্রথম দুই স্তবকের কয়েকটি লাইন ওপরে উদ্ধৃত হলো। বাংলাদেশের হাল আমলের পররাষ্ট্রনীতির মতিগতি দেখে কবির এই বিখ্যাত কবিতাটির কথা মনে পড়লো। আমাদের পররাষ্ট্রনীতিতে সাম্প্রতিক কালে বহুল আলোচিত বিষয় তিনটি। ভারত পাকিস্তানের পারমাণবিক বিস্ফোরণ এবং সেই উছিলায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভারত ও পাকিস্তান গমন। তারপরের ইস্যু দুটি হলো সোফা এবং হানা। এই তিনটি ইস্যু নিয়ে বিশেষ করে পরের দুইটি ইস্যু সোফা এবং হানা নিয়ে আওয়ামী সরকারের কার্যকলাপ দেখে জীবনানন্দ দাসের কবিতার কথা মনে পড়ে। জীবনানন্দ দাস ভারতীয় বাংলার কবি হলেও বাংলাদেশেও তার কবিতার অনেক সমাঝদার আছে। বিশেষ করে তরুণ ও যুবকদের কাছে তিনি বেশ পপুলার। এই টিন এজ গ্রুপের কাছে জীবনানন্দ দাস যত না জনপ্রিয় তারচেয়ে বেশী জনপ্রিয় তার 'বনলতা সেন' কবিতাটি। আবার বনলতা সেন কবিতার চেয়েও বেশী প্রিয় কবিতার নায়িকা বনলতা সেন। মেয়েদের চোখ নিয়ে অনেক উপমা এবং রূপক রয়েছে। তবে

www.pathagar.com

'পাখীর নীড়ের মত চোখ' উপমাটি নিঃসন্দেহে আনকমন। সেই নীড় থেকে চোখ তোলা জিনিসটা অনেকটা এই রকম ঃ আনত মস্তকে বসে থাকা যুবতীটি মুখ তুললো। তারপর তাঁর ডাগর চোখ দু'টি ওপরে তুলে দয়িতের প্রতি পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালো। অবিবাহিত প্রেমিকের কাছে তার প্রেমাস্পদের এই মুহূর্ত্ব এবং ভঙ্গীর চেয়ে মধুরতর আর কিছু হয় না। সে জন্যই জীবনানন্দ দাস যুবক যুবতীদের কাছে এতো পপুলার। সেই বনলতা সেনের নায়ক 'সিংহল সমুদ্র' থেকে 'মালয় সাগর' পর্যন্ত পথ হাঁটছে। হাঁটতে হাঁটতে সম্রাট অশোকের বিম্বিসা থেকে প্রাচীন ভারতের বিদর্ভ নগরীতে। তারপরেও সে পথ হারিয়েছে। এই নায়কের অবস্থা অনেকটা সমুদ্র পথপাড়ি দেয়ার সময় সেই নাবিকের মত যে নাবিকের হাল ভেঙ্গে গেছে। হাল ভেঙ্গে সে দিশাহারা। 'বিদিশার নিশার' মত ভুল পথে অন্ধকারে পথ হাতড়াচ্ছে বনলতা সেনের নাবিক নায়ক। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিরও সেই একই হালত। সমুদ্র যাত্রায় নেমে দিক চক্রবালে পথ হারিয়েছে আওয়ামী সরকার। বর্তমান সরকারের কেবলা তো ভারত। সেই সুবাদে কেবলার সঠিক অবস্থান পূর্ব উত্তরের দিল্লী। কিন্তু টাকা পয়সার গরজ বড় বালাই। তাই পশ্চিম গোলার্ধের ওয়াশিংটনকেও খুশী করতে হয়। কিন্তু এক সাথে কি দুইজনকে খুশী করা যায়? কখনও যায় না। এসব ক্ষেত্রে আসল মানুষকে তুষ্ট রেখে নকল মানুষটির সাথে ছলনা করতে হয়। কিন্তু গল্প উপন্যাস এবং নাটক নভেলের মতই ছলনাময়ীর প্রেম অনেক সময় অরিজিনাল প্রেমিকের মনে ঈর্ষা এবং সন্দেহ জাগিয়ে তোলে। তখন সেই প্রেমাস্পদের হয় ত্রিশুংকু অবস্থা। আর দুইপক্ষের টানাটানিতে অবশেষে বেচারার অবস্থা হয় ত্রিভঙ্গমুরারী।

কাউকে কিছু না জানিয়ে বছর খানেক আগে পর্দার অন্তরালে আওয়ামী লীগ সরকার ওয়াশিংটনের সাথে শুরু করেছিল একটি নতুন চুক্তি স্বাক্ষরের আলোচনা। প্রস্তাবিত চুক্তিটির নাম সোফা (স্ট্র্যাটাস অব ফোর্সেস এগ্রিমেন্ট)। তারা যে আমেরিকার সাথে আলোচনা শুরু করেছিল সে কথাটি কিন্তু কেউ জানতো না। অথচ বাংলাদেশে রয়েছে একটি গণতান্ত্রিক সরকার। রয়েছে একটি পার্লামেন্ট। রয়েছে একটি বিরাট সংসদীয় বিরোধী দল। এবং রয়েছে তাদের নিজস্ব মন্ত্রিপরিষদ। কি আশ্চর্য, সেই সোফার আলাপ-আলোচনা নিয়ে কেবিনেট বা পার্লামেন্ট কোথাও কোনো আলোচনা হলো না। আর বিরোধীদলের সাথে আলোচনা? সেই ঐতিহ্য আওয়ামী লীগ সরকার সৃষ্টি করেনি। সবচেয়ে বড় কথা হলো, কেন এতো ঢাক ঢাক গুড় গুড়? সোফা বাংলাদেশের জন্য ভালো কি মন্দ, প্রশ্ন সেটা নয়। সোফা চুক্তি করলে বাংলাদেশ বেহেশতে যেতো, আর না করায় আমরা জাহান্নামে গেছি, তেমন কথাও আমরা বলছি না। মানুষের বক্তব্য হলো, সোফা নিয়ে যে আপনারা আমেরিকার সাথে কথা বলছেন, সেটা আপনারা কাউকে জানালেন না কেন? যে দেশের জন্য এই চুক্তি করা হবে অথবা করা হবে না সেই দেশের মানুষ, অর্থাৎ এই হতভাগ্য বাংলাদেশীরা জানতেই পারল না যে আমেরিকার সাথে কোনো একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথাবার্তা শুরু হয়েছে।

www.pathagar.com

।। দুই ।।

কিন্তু তারপরেই পরিস্থিতির নাটকীয় মোড়। ভারত ও পাকিস্তান কর্তৃক আণবিক বোমা ফাটানোর অজুহাতে হাসিনা গেলেন ইন্ডিয়া। যেতে আসতে লাগলো ৬ ঘন্টা। বিমানবন্দরের আনুষ্ঠানিকতা, এর সাথে দেখা করা, তার সাথে দেখা করা এসব কিছু মিলিয়ে আরো দুই ঘন্টা, মোট আট ঘন্টা। আনুষ্ঠানিক আলোচনা এক ঘন্টা, মোট ৯ ঘন্টা এবং প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ীর সাথে একান্ত বৈঠক ৩৫ মিনিট। এই ৩৫ মিনিটেই টেবিল উল্টে গেল। দেশী এবং বিদেশী সূত্র থেকে যেসব খবর এলো সেসব খবরের সাথে বাংলাদেশের সরকারী ভাষ্যের কোন মিল নেই। দেশী-বিদেশী বেসরকারী সূত্র অনুযায়ী এই ৩৫ মিনিটের একান্ত বৈঠকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ী শেখ হাসিনাকে বলেছেন, কিছু স্পষ্ট কথা। ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নাকি সোজাসাপ্টা বাংলাদেশী প্রধানমন্ত্রীকে বলেছেন যে, সোফার ব্যাপারে মার্কিনীদেরকে কথা দেয়ার আগে বাংলাদেশের উচিত ছিল ভারতের সাথে কথা বলা। এ বৈঠকের আগে ৫ মাস ধরে বাংলাদেশ সোফা নিয়ে আমেরিকার সাথে কথা বলছে, অথচ ভারতকে কিছুই জানানো হলো না, এতে নাকি মিঃ বাজপেয়ী তাজ্জব হয়ে যান। তিনি নাকি বলেন যে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বা পররাষ্ট্রমন্ত্রী আগভাগে ভারতকে কিছু জানালেন না। ভারতকে এটা জানতে হলো ঢাকায় অবস্থিত তাদের দূতাবাসের মাধ্যমে। এটা খুব দুঃখজনক ব্যাপার। ভারত নাকি এই বৈঠকে বাংলাদেশকে জানিয়েছে যে, সোফা হবে ভারতের বিরুদ্ধে একটি উস্কানি। ভারতের এই সোজাসাপটা কথার পর এটা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, শেখ হাসিনার ভারত সফরের মূল উদ্দেশ্য ছিল সোফার ব্যাপারে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে এক টেবিলে বসে মুখোমুখি কথা বলা এবং তার মনোভাব জেনে নেয়া। আণবিক বোমা বিস্ফোরণ, বিস্ফোরণের ফলে সৃষ্ট পাক-ভারত উত্তেজনা প্রশমনে দূতিয়ালী করা, এগুলো সব ছিল একটি ধূম্রজাল এই গোপন কথাটি ফাঁস করে দিয়েছিল ভারতীয় টেলিভিশন দূরদর্শন। গত ৮ই জুন দূরদর্শন এ সম্পর্কে একটি খবর প্রচার করে। খবরে বলা হয়, আজ সকালে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শ্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীকে টেলিফোন করেন এবং ভারতে তার সাথে দেখা করার প্রস্তাব করেন। এই দাওয়াতের ভিত্তিতে জরুরী আলোচনার জন্য শেখ হাসিনা দিল্লী আসছেন। ভারত ঐ বৈঠকে বাংলাদেশকে আরো বলে যে, বাংলাদেশের সাথে ভারতের বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে তারপরে সোফার আর কোন প্রয়োজন আছে কিনা সেটা যেন বাংলাদেশ ভেবে দেখে। সোফার মাধ্যমে যেসব বিষয়ে মার্কিন সাহায্য আসার কথা সেসব ক্ষেত্রে ভারতীয় সাহায্য মার্কিনী সাহায্যের চেয়ে আরো কার্যকরী হবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশে ফিরলেন। তার কয়েকদিন পর মার্কিন রাষ্ট্রদূত মিঃ হোলজম্যান ২১শে জুন পররাষ্ট্র সচিব মোস্তাফিজুর রহমানের সাথে দেখা করলেন। তাঁর ধারণা ছিল যে সোফার

www.pathagar.com

ব্যাপারে এবার তিনি বাংলাদেশ সরকারের সবুজ সংকেত পাবেন। তখনও তিনি জানতেন না যে, দিল্লীর ঐ ৩৫ মিনিটের একান্ত বৈঠকে দাবার ছক সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে। মিঃ হোলজম্যানকে পররাষ্ট্র সচিব মোস্তাফিজ স্পষ্ট করে কিছুই বললেন না। কূটনীতির পরিভাষা ব্যবহার করে তিনি বললেন যে, বিষয়টি সরকারের সক্রিয় বিবেচনায় রয়েছে।

রাজনৈতিক তথা সরকারী প্রশাসন সম্পর্কে যাদের যৎসামান্য ধারণা আছে তারা জানেন যে, কোনো কোনো সময় সরকার সরাসরি কোনো অপ্রীতিকর কাজ করতে পারে না। এসব ক্ষেত্রে অনুগত সংবাদপত্র এবং অন্যান্য ফ্রন্টকে মাঠে নামিয়ে দেয়া হয়। তারা তাদের প্রচার প্রপাগান্ডা এবং মেঠো বক্তৃতার মাধ্যমে সেই বিশেষ ধারণাটি নিয়ে মাঠ গরম করেন। এটাকেই পরে সরকার জনমত হিসেবে চালিয়ে দেয়। ক্ষেত্র প্রস্তুত হলে সরকার অপর পক্ষকে বলে যে জনমত বিরূপ হয়ে গেছে। সুতরাং সেই কাজটি আর করা যাবে না। ঠিক এই কৌশলটিই প্রয়োগ করা হয়েছে সোফার বেলায়। এই কৌশল অনুযায়ী আওয়ামী সরকার পর্দার অন্তরালে অবস্থান করে একদল বশংবদ বুদ্ধিজীবী এবং খয়ের খা সংবাদপত্রকে মাঠে নামিয়ে দিলেন। তাদেরকে আগেই বলা হয়েছিল যে, ইন্ডিয়া সোফার বিরোধী। তাই তোমরা সোফার বিরুদ্ধে মাঠ গরম কর। গ্রীনরুম থেকে ঘন্টা বাজানো হলো। আর সাথে সাথেই নটনটিরা মঞ্চে আবির্ভূত হলেন। সারাদেশ জুড়ে শুরু হলো সোফার বিরুদ্ধে প্রচারণা। তারা সমস্বরে বলতে লাগলেন যে, সোফা স্বাক্ষরিত হলে আমাদের সার্বভৌমত্ব বিপন্ন হবে। সোফার ভেতরে নাকি লুকিয়ে আছে বাংলাদেশে মার্কিন সামরিক ঘাঁটি প্রতিষ্ঠার দানব। সোফা সই হলে বাংলাদেশে মার্কিন সৈন্যরা নাকি ইচ্ছামত যত্রতত্র ঘুরে বেড়াবে এবং চূড়ান্ত পরিণামে বাংলাদেশের নিরাপত্তা বিপন্ন হবে।

আমরা একটি কথা স্পষ্ট করে বলে রাখতে চাই। সোফা বা হানার পক্ষে বা বিপক্ষে কোন কিছু বলার উদ্দেশ্য নিয়ে এই লেখা লিখছি না। আমাদের বক্তব্য এই যে সোফা যদি এতই খারাপ হবে তাহলে শেখ হাসিনার সরকার ৯ মাস ধরে মার্কিনীদের সাথে কি আলোচনা করলেন? ব্যাপারটি এতদূর গড়িয়েছিল যে, তারা চুক্তি সই করার জন্য একপায়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন। এবং ভারতীয় সম্মতি আদায়ের জন্যই তো প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দিল্লী গিয়েছিলেন। যদি মিঃ বাজপেয়ী সবুজ সংকেত দিতেন তাহলে তো সোফা সই হয়ে যেত। আর সে ক্ষেত্রে সোফা বাংলাদেশের স্বার্থের খুব অনুকূল হতো। যেই ভারত এটার বিরোধিতা করলো আর অমনি সোফা বাংলাদেশের স্বার্থের পরিপন্থী হয়ে গেল। তাহলে আওয়ামী বুদ্ধিজীবী ও আওয়ামী পত্র-পত্রিকার দৃষ্টিতে বাংলাদেশের স্বার্থ ও সার্বভৌমত্বের অনুকূল কোন বিষয়টি? সেটিই যেটা ভারত পছন্দ করে। আর সেই বিষয়টিই প্রতিকূল, যেটা ভারত অপছন্দ করে। তাহলে ভারত ও বাংলাদেশের স্বার্থ ও সার্বভৌমত্ব সমর্থক হয়ে যাচ্ছে।

www.pathagar.com

।। তিন ।।

সোফা হল খতম। এবার এলো হানা। আসবে না কেন? দিল্লীতে ওদের নাড়িপোঁতা থাকলে কি হবে, দিল্লী তো হলো সেই "ভাত দেওয়ার মুরোদ নেই, কিল মারার গোঁসাই।" এই হাড়হাভাতে বাংলাদেশ বিদেশী টাকা অর্থাৎ ফরেন এইড ছাড়া তো আর চলতে পারে না। সেই টাকা দেবে কে? আমেরিকা ছাড়া আর বা কে? দিল্লীতো নিজেই খাতক। সে আবার ধার দেবে কোত্থেকে? সে তো খালি চোখ রাঙাতে পারে। কিন্তু শুধু চোখ রাঙানি খেয়ে তো আর পেট ভরবে না। এ কথাটি আওয়ামী সরকার হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে সোফা স্বাক্ষর থেকে পীঠটান দেয়ার পর। মার্কিনীরা ভাবলো, তাদেরকে লেট্‌ডাউন করা হয়েছে। এর পরিণতি তো ভয়ানক। সুতরাং দু'কূল সামাল দেয়ার জন্য পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী আবুল হাসান চৌধুরী সই করলেন হানা (Humanitarian Assistance Need Assessment) । আবার কথা উঠলো। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বললেন যে, হানা কখন কিভাবে সই হয়েছে, তিনি সেটা জানেন না। পররাষ্ট্র মন্ত্রী সামাদ আজাদ বললেন যে, এ সম্পর্কে তিনি কিছু জানেন না। জেনে নিয়ে পরে বলবেন। হানার কথা প্রথম জানা গেল মার্কিনীদের এক সংবাদ সম্মেলন থেকে। যেখানে বক্তব্য দিয়েছেন দূতাবাসের একজন সিনিয়র অফিসার। তিনি বললেন যে বাংলাদেশের সাথে তারা হানা স্বাক্ষর করেছেন। তখন খোলস থেকে বেরিয়ে এলেন প্রতিমন্ত্রী আবুল হাসান চৌধুরী। তিনি বললেন যে, কোন চুক্তি সই হয়নি। বাংলাদেশে দূর্যোগকালে কি পরিমাণ সাহায্য প্রয়োজন সেটা নির্ণয় করার জন্য ১০ সদস্যের একটি মার্কিন টীমকে এক মাসের জন্য ঢাকায় থাকার অনুমতি দেয়া হয়েছে। এই কমিটি মার্কিন সরকারের কাছে একটি রিপোর্ট পেশ করবে। এর একটি অনুলিপি বাংলাদেশকে দেয়া হবে। তখন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হবে যে, হানা চুক্তি সই করা হবে কি না। অর্থাৎ এখানেও স্বচ্ছতার অভাব।

দেশবাসীর প্রশ্ন এখানেই। প্রধানমন্ত্রী বলেন এক কথা। আর পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বলেন ভিন্ন কথা। আসলে আমাদের পররাষ্ট্রনীতিতে বিরাজ করছে চরম অস্বচ্ছতা ও বিভ্রান্তি। হালধরা ছিলো দিল্লীর দিকে। আর ধূম্রজাল সৃষ্টির জন্য সেই হাল মাঝে মাঝে ঘোরাতে গিয়ে ভেঙ্গে তারা এখন দিশেহারা। মাঝ দরিয়ার অথৈ পানিতে এখন তারা কি করবেন? কিইবা করার আছে? জীবনানন্দ দাস এমন একটি সমস্যায় তাঁর নায়ক-নায়িকাকে মুখোমুখি বসিয়ে রেখেছিলেন। 'নাই কাজ তো খৈ ভাজ' নয় আঁধার দিগন্তে মুখোমুখি বসে পরস্পরের মুখ দর্শন করা। বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতিতেও এখন একই অবস্থা। দিল্লী ও ঢাকা এখন মুখোমুখি বসে আছে সেই কবিতার মত ঃ

থাকে শুধু অন্ধকার
মুখোমুখি বসিবার
বনলতা সেন।

সূত্র ঃ দৈনিক সংগ্রাম তাং ২০-৮-৯৮

www.pathagar.com

পৃথ্বী বনাম শাহিন, ঘোরী বনাম অগ্নি
কেহ কারে নাহি পারে সমানে সমান

ভারত এবং পাকিস্তান মাঝারি পাল্লার দুটো ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ করলো। এই ঘটনা নিয়ে প্রথম দু'একদিন মৃদু আলোচনা ও সমালোচনা হলো, তারপর সব চুপচাপ। যেটুকু আন্তর্জাতিক ক্রিয়া বা প্রতিক্রিয়া সেটুকু অনেকটা সেই চায়ের পেয়ালায় ঝড় তোলার মত। মনে হলো যেন পুরো ঘটনাটাই ঘটলো একটি ফর্মুলা ধরে। অগ্নি-২ নামক ২,০০০ কিলোমিটার পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র ভারত বেশ কিছুদিন আগে থেকেই তার অস্ত্র ভাণ্ডারে মজুদ রেখেছিল। এটিকে এমন অবস্থায় প্রস্তুত রাখা হয়েছিল যাতে যে কোনো মুহূর্তেই বিস্ফোরণ ঘটানো যায়। আর বাজপেয়ী সরকার বিস্ফোরণ যে ঘটাবে সে সিদ্ধান্তও নিয়ে রেখেছিলেন। তারা শুধুমাত্র অপেক্ষা করছিলেন একটি উপযুক্ত সময়ের জন্য।

তামিলনাড়ুর ফিল্মী হিরোইন থেকে দেশনেতায় রূপান্তরিত জয়ললিতা জয়ারাম যখন সিদ্ধান্ত নিলেন যে, তাঁর ১৮ জন সদস্যসহ বিজেপি সরকারের ওপর থেকে তিনি সমর্থন প্রত্যাহার করবেন তখনই প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ী এই বিস্ফোরণের সিদ্ধান্ত নেন। এই বিস্ফোরণকে তিনি রাজনীতির পুঁজি হিসেবে ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নেন। এবং সেই হিসেবে ১২ই এপ্রিল অগ্নি-২ নামক ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ করেন। কিন্তু এটা করেও বাজপেয়ীর শেষরক্ষা হয়নি। ভারতীয় পার্লামেন্টে (লোকসভায়) আস্থা ভোট উত্থাপিত হলে বাজপেয়ী সরকার ১ ভোটে হেরে যায় এবং সরকারের পতন ঘটে। অগ্নির বিস্ফোরণের পর পশ্চিমা বিশ্বে মৃদু প্রতিবাদ হয়। ঐ সব প্রতিবাদের সাথে এই আশংকাও ব্যক্ত করা হয় যে, পাকিস্তান হয়তো পাল্টা জবাব হিসেবে ক্ষেপণাস্ত্রের বিস্ফোরণ ঘটাবে। তাই পাকিস্তানকে আগাম অনুরোধ করা হলো যাতে তারা পাল্টা বিস্ফোরণ না ঘটায়। কিন্তু কেউ কারো কথা শুনলো না। পাকিস্তান দু'দিন পর দু'টি বিস্ফোরণ ঘটালো। একটি হলো শাহিন নামক স্বল্প পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র। এটার রেঞ্জ হলো ৭৫০ কিলোমিটার। আরেকটি বিস্ফোরণ ঘটালো ঘোরী-২ নামক পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র। এটার রেঞ্জ হলো ২২০০ কিলোমিটার। এসব বিস্ফোরণের পর পাকিস্তানের তরফ থেকে ঘোষণা করা হলো যে, তাদের ভাণ্ডারে আরো ক্ষেপণাস্ত্র মজুদ রয়েছে। এর নাম হলো শাহিন-২। শাহিন-২ এর পাল্লা হলো ২৫০০ কিলোমিটার। পাকিস্তানের তরফ থেকে আরো দাবী করা হয়েছে যে, শাহিন-২ নির্মাণে পাকিস্তান যে প্রযুক্তি ব্যবহার করেছে সে প্রযুক্তি ভারতের কাছে নেই। সেটা হলো নিয়ন্ত্রিত ক্ষেপণাস্ত্র। বোতাম টিপে পূর্ব নির্ধারিত টার্গেটে নির্ভুলভাবে আঘাত করা যায়।

www.pathagar.com

ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ শেষ হয়েছে। আগেই বলেছি যে, প্রথম দু'একদিন আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কিছুটা সোরগোল হয়েছে তারপর সব চুপচাপ। গত বছরের মে মাসে ভারত এবং পাকিস্তান যখন আণবিক বিস্ফোরণ ঘটালো তখনও বিরাট হৈচৈ হয়েছিল। তাই বলে এ দু'টি দেশের আণবিক কর্মসূচী থেমে থাকেনি। হাঁক-ডাক করে তারা পরবর্তী আণবিক বিস্ফোরণ হয়তো ঘটায়নি। কিন্তু নতুন বোমা যে তারা তাদের ভাণ্ডারে সংযোজন করেনি সে কথা বলা যায় না। আণবিক বিস্ফোরণের পর ঘটলো মিসাইল বিস্ফোরণ। এটাই স্বাভাবিক। আণবিক বোমা তো বহন করতে হবে। যাদের প্রয়োজনীয় জঙ্গী বিমান নেই তারা এ্যাটম বোমা বহন এবং নিক্ষেপ করবে কিভাবে। ভূমি থেকে ভূমিতে নিক্ষেপণযোগ্য ক্ষেপণাস্ত্র বা এসএসএম এখন সেই চাহিদা মেটাচ্ছে। মিসাইল থাকলে সেটা চালানোর জন্য কোনো পাইলট লাগে না। মিসাইলের ওপর বোমাটি ফিট করা হয়। তারপর বোতাম টিপলে মিসাইলটি উড়ে যায় এবং যথা স্থানে বোমাটি নিক্ষেপ করে। এ জন্যই মিসাইলের আরেক নাম ডেলিভারী সিস্টেম। সুতরাং আণবিক বোমা বানালে মিসাইল বানানো হবেই। এটা পশ্চিমা মুরুব্বীরা চাউক আর নাই চাউক। চাহিদা বা প্রয়োজন কোনো সীমা-পরিসীমা মানে না।

।। দুই ।।

বলা হচ্ছে যে, অগ্নি-২ মিসাইলটির সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য হলো গণচীন। এর স্বপক্ষে যুক্তি দিয়ে বলা হয় যে, টার্গেটটি যদি হয় পাকিস্তান তাহলে অগ্নি-২ এর মত এতবড় পাল্লার প্রয়োজন হয় না। 'পৃথ্বী' নামক ভারত যে স্বল্প পাল্লার মিসাইল উদ্ভাবন করেছে সেটা পাকিস্তানের অভ্যন্তরে যে কোনো স্থানে আঘাত হানতে সক্ষম ইতিমধ্যেই। ভারত নাকি 'পৃথ্বী' তার স্থল বাহিনীর কাছে সরবরাহ করেছে। আর স্থলবাহিনী নাকি এসব মিসাইল পাকিস্তানের বিরুদ্ধে তাক করে রেখেছে। এই পটভূমিতে বলা হয় যে, পাকিস্তানকে ঘায়েল করার জন্য 'অগ্নির' প্রয়োজন নেই। আসলে অগ্নি উদ্ভাবন করা হয়েছে গণচীনকে সামনে রেখে। এই তত্ত্বের পক্ষে এবং বিপক্ষে অনেক কথাই বলা যায়। বিশেষজ্ঞরা বলেছেন যে, দিল্লী থেকে বেইজিং অন্তত ৫০০০ কিলোমিটার দূরে। অগ্নি-২ মিসাইলের রেঞ্জ ২০০০ কিলোমিটার। এই মিসাইলটি বেইজিং-এর ওপর আঘাত হানতে পারবে না। সুতরাং গণচীনের রাজধানী বেইজিংকে যদি মিসাইলের আয়ত্তে আনতে হয় তাহলে অগ্নির পাল্লা আরো অন্তত ৩০০০ কিলোমিটার বাড়াতে হবে। এই পটভূমিতে এসব মিসাইলের পাল্লা বাড়িয়ে ৫০০০ কিলোমিটার করা হবে। যতদিন পর্যন্ত সেটা অর্জিত না হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত অগ্নির আধুনিকায়ন চলতেই থাকবে। সোজা কথা ভারতের মিসাইল কর্মসূচী অপ্রতিহত গতিতে চলবে। গণচীনকে মোকাবিলা করাই যদি ভারতের আণবিক ও ক্ষেপণাস্ত্রের কর্মসূচীর চূড়ান্ত লক্ষ্য হয়ে থাকে, তাহলে সেখানে কিছুকথা থেকে যায়। ভৌগোলিকভাবে চীন ভারতের চেয়ে অন্তত তিনগুণ বড়। চীনের অর্থনীতিও বিশাল। শুধু বিশালই নয়, চীনের অর্থনীতি ভারতের চেয়ে অনেক অগ্রসর। গণচীনের অর্থনীতির ভিত ভারসাম্যমূলক এবং মজবুত। এই উন্নত ও শক্তিশালী অর্থনীতির পাশাপাশি চীনের সামরিক বাহিনীও অনেক শক্তিশালী।

www.pathagar.com

জনবলে তাঁরা যেমন অনেক বেশী, তেমনি অস্ত্রবলেও তারা ভারতের চেয়ে অনেক শক্তিশালী। অস্ত্রের ক্ষেত্রেও তারা দু'দিক দিয়েই শক্তিশালী। প্রচলিত অস্ত্রের ক্ষেত্রে তারা যেমন ভারতের চেয়ে অনেক এগিয়ে আছে, তেমনি আণবিক বোমা ও ক্ষেপণাস্ত্রের ক্ষেত্রেও তারা ভারতকে অনেক পেছনে ফেলে এসেছে। আজ যদি ভারত এবং চীনের মধ্যে সশস্ত্র সংঘর্ষ হয়, তাহলে ভারত ৬২ সালের মতই চীনের কাছে প্রচন্ড মার খাবে।

পাকিস্তান এবং ভারতের মধ্যে যুদ্ধের সময় পাকিস্তানের অনেকেই ধারণা করেছিলেন যে, হয়তোবা গণচীন অথবা আমেরিকা ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের স্বপক্ষে সামরিক হস্তক্ষেপ করবে। ৭১ সালে ১৫ দিন ধরে যুদ্ধ হয়ে গেল। কিন্তু আমেরিকা পাকিস্তানের পাশে এসে দাঁড়ায়নি। অনুরূপভাবে অনেকেই ধারণা করেন যে, আবার যদি কোনোদিন চীন-ভারতের মধ্যে যুদ্ধ লাগে, তাহলে আমেরিকা ভারতের পাশে দাঁড়াবে। এ ধারণাও ভুল। পাক-ভারত যুদ্ধের মত চীন-ভারত যুদ্ধেও আমেরিকা কোনো পক্ষ নিবে না। ভারতের শাসক গোষ্ঠিও সম্ভবত একথা জানে। তাই তাদের মনে এখন এ ধারণা জাগ্রত হচ্ছে যে, কৌশলগত ভাবে ভারতকেও চীনের প্রাধান্য মেনে নিতে হচ্ছে। ভবিষ্যতে চীনের সাথে কোন সংঘর্ষ বাধলে ভারতকে প্রতিরক্ষার ব্যাপারে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে হবে। এই পটভূমিতে কেউ কেউ বলতে চান যে, সামরিক ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের পথে মিসাইল বিস্ফোরণ একটি পদক্ষেপ।

এই প্রসঙ্গে অনেকে প্রতিরক্ষামন্ত্রী জর্জ ফার্নান্দেজের একটি মন্তব্য স্মরণ করেন। গত বছরের মে মাসে ভারত যখন পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটায় তখন জর্জ ফার্নান্দেজ ঘোষণা করেন যে, ভারতের আণবিক বিস্ফোরণের লক্ষ্য হলো চীন। তিনি আরো বলেন যে, পাকিস্তান চীনের কোনো প্রতিদ্বন্দী নয় ভারতের আসল প্রতিদ্বন্দী হলো গণচীন। চীনের সাথে ভারতের বিশাল এলাকাজুড়ে বিরাজমান সীমান্ত বিরোধ এখনও অমীমাংসিত রয়ে গেছে। ১৯৬৪ সালে চীন সর্বপ্রথম তার আণবিক বিস্ফোরণ ঘটায়। ৩২ বছর ধরে অসংখ্য বিস্ফোরণ ঘটানোর পর চীন ১৯৯৬ সালে ঘোষণা করে যে, তারা আণবিক বিস্ফোরণ বন্ধ রেখেছে। খবর পাওয়া গেছে যে, আণবিক বিস্ফোরণ বন্ধ রেখে চীন তার প্রচলিত অস্ত্রের আধুনিকায়নে নজর দিয়েছে। রাশিয়া অর্থনৈতিক দুর্দশায় পতিত হয়েছে। রাশিয়ার প্রয়োজন নগদ অর্থের। গণচীন এখন নগদ অর্থ দিয়ে রাশিয়ার নিকট থেকে জঙ্গী বিমান, সাবমেরিন, ক্ষেপণাস্ত্র সজ্জিত ডেস্ট্রয়ার প্রভৃতি ক্রয় করছে। আণবিক এবং মিসাইল প্রযুক্তিতেও গণচীন ভারতের চেয়ে অনেক দূর এগিয়ে আছে। আণবিক বোমা তো দূরের কথা মিসাইল প্রযুক্তিতেও ভারত চীনের এত যোজন যোজন দূরে আছে যে, সে দূরত্ব অতিক্রম করতে ভারতের দু'এক বছর নয়, অনেক বছর লেগে যাবে। সে জন্যেই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের অভিযোগ এই যে, এশীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থায় চীনের লেজুড় হয়ে থাকবে কেন পাকিস্তান? এশীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থায় ভারতের জন্য হুমকি হলো চীন। সেক্ষেত্রে পাকিস্তান ভারতের এই নিরাপত্তা চিন্তাকে বিবেচনায় আনবে না কেন?

www.pathagar.com

।। তিন ।।

পাকিস্তান কিন্তু ভারতের এই বক্তব্য মানে না। পাকিস্তান মনে করে যে, '৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হওয়ার পর থেকেই সে দেশের প্রধানমন্ত্রী জওহর লাল নেহেরু ভারতকে সোভিয়েত ইউনিয়নের পাখার তলে নিয়ে যান। জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের নাম করে সোভিয়েত ইউনিয়ন তিনটি দেশ তথা সেই তিন নেতার মাধ্যমে তার প্রভাব বলয় বিস্তার করতে থাকে এবং এভাবে মার্কিন মোকাবিলার নীতি অব্যাহত রাখে। এই তিনটি দেশ হলো ভারত, মিশর এবং যুগোশ্লাভিয়া। এই তিন দেশের তিন নেতা হলেন যথাক্রমে নেহেরু, নাসের এবং টিটো। সোভিয়েত বরকন্দাজির বিনিময়ে ভারত অবিশ্বাস্য পরিমাণে সোভিয়েত সমরাস্ত্র লাভ করতে থাকে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভারতে এত বেশি অস্ত্র দেয় যে, সোভিয়েত অস্ত্রে বলীয়ান হয়ে ভারত এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম শক্তিতে পরিণত হয়। সোভিয়েত অস্ত্রে বলীয়ান হয়েই ভারত ধরাকে শরা জ্ঞান করে এবং তিব্বতের দালাইলামাকে চীন বিরোধী তৎপরতায় ক্রমাগত উস্কানি এবং মদদ দিতে থাকে। ফলে বাধ্য হয়ে ৬২ সালে চীন কর্তৃক ভারতকে একটি শিক্ষা দিতে হয়। লক্ষ্য করার বিষয় হলো এই যে, ৬২ সালে চীনের ভূমিকা মোটেই হানাদার ছিল না। তারা ভারতকে পিটিয়ে যেমন তেজপুর এলাকা পর্যন্ত আসে তেমনি একতরফাভাবে ফিরে যায়। সুতরাং চীনের এই তৎপরতা থেকে পরিস্কার হয়ে ওঠে যে, তার ভূমিকা মোটেই হানাদারের ভূমিকা ছিল না।

ভারতের প্রতি রাশিয়ার অন্ধ সমর্থন আজও অব্যাহত রয়েছে। বিমানবাহী জাহাজ, পারমাণবিক শক্তিচালিত সাবমেরিন থেকে শুরু করে আন্তঃমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্রের প্রযুক্তি রাশিয়া ভারতকে সরবরাহ করছে। রাশিয়া ভারতকে চীনের পাল্টা শক্তি হিসেবে গড়ে তুলছে। সুতরাং ভারতের চীনভীতি থাকবে কেন? চীনের মোকাবিলা করতে হলে ভারতের প্রয়োজন পাকিস্তানকে পদানত রাখা। পাকিস্তান 'শাহিন' এবং 'ঘোরীর' পাল্টা বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। আণবিক এবং ক্ষেপণাস্ত্র প্রযুক্তিতে ভারত এবং পাকিস্তান উভয়েই এখন সমানে সমান।

সূত্র ঃ দৈনিক সংগ্রাম, তাং ২২-৪-৯৯

www.pathagar.com

মুসলিম বিশ্বের সমর সম্ভার ঃ একটি তুলনামূলক আলোচনা

[এই লেখাটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় ১৯৯০ সালে। তারপর এক যুগ গত হয়েছে। সুতরাং তথ্য ও পরিসংখ্যান অনেক বদলে গেছে। আজ ২০০৩ সালের তথ্য ও উপাত্তের সাথে তুলনা করলে হয়তো অনেক গরমিল দেখা দেবে। কিন্তু মূল বিষয়টি ঠিকই আছে। মুসলিম বিশ্ব সামরিক শক্তিতে আজও দুর্বল। পক্ষান্তরে পশ্চিমা দুনিয়া ভারত ও ইসরাইল অনেক এগিয়ে গেছে। এই নিবন্ধটি পাঠ করার সময় এই বিষয়টি খেয়াল রাখার অনুরোধ করছি। – লেখক]

পাকিস্তান আমলে বাংলা একাডেমী একটি গানের বই প্রকাশ করে। বইটির নাম 'নবজীবনের গান'। বিপুল সংখ্যক ইসলামী গানের এক দুর্লভ সংকলন এই গানের সংকলনটি। এই গানের বইয়ে একদার বিখ্যাত সাহিত্য সাময়িকী 'সমকালের' সম্পাদক মরহুম সিকান্দার আবু জাফরের একটি গান রয়েছে। গানটির অন্যতম স্তবক হলো ঃ

অর্ধ পৃথিবী জয় করেছিল মুসলমান
কিসের জোরে? কই সে জোর?

আজ ১৯৯০ সালে এসে গানের ঐ চরণ ক'টি বারবার মনে পড়ছে। যখন দেখি মাত্র ৭ হাজার ৯৯২, অর্থাৎ প্রায় ৮ হাজার বর্গমাইলের একটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্র ইসরাইল, যে কিনা বাংলাদেশের আয়তনের প্রায় সাত ভাগের এক ভাগ, যার জনশক্তি বাংলাদেশের প্রায় পঁচিশ ভাগের এক ভাগ, সেই দেশটি কিনা '৬৭ ও '৭৩ এর আরব ইসরাইল যুদ্ধে ২০ হাজার বর্গমাইলেরও বেশী আরব এলাকা দখল করে নেয়। পাঠক ভাইয়েরা, একথা জানলে আপনাদের চেতনা মূঢ় বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে যাবে যে, ইসরাইল যার সশস্ত্র বাহিনীর সম্মিলিত সদস্য সংখ্যা ১ লক্ষ ৪১ হাজার সেই দেশটি কয়েকডজন আরব দেশকে পদানত করে রেখেছে। পাঠক, আপনার স্তম্ভিত চেতনার ওপর একটি তীব্র চাবুকের প্রহার পড়বে যদি আপনি জানেন যে, ইসরাইল যার আয়তন মাত্র ৮ হাজার বর্গমাইল যার জনসংখ্যা মাত্র ৪৫ লক্ষ সেই দেশটি ৩৯টি মুসলিম দেশ, যাদের সম্মিলিত আয়তন ৯৭ লক্ষ বর্গমাইলেরও বেশী, যাদের সম্মিলিত জনসংখ্যা ৮৯ কোটিরও বেশী, তাদেরকেও বিনা চ্যালেঞ্জে অব্যাহতভাবে রক্তচক্ষু দেখিয়ে যাচ্ছে। কেন এমন হলো? এই কেন'র একটি সুনির্দিষ্ট জবাব অবশ্যই রয়েছে। সেই জবাবও আমরা এই নিবন্ধেই খুঁজে বের করবো। তৎপূর্বে ইসরাইল ও মুসলিম বিশ্বের সামরিক

www.pathagar.com

শক্তির দিকে একবার নজর বুলানো যাক। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এই নিবন্ধে যে সব পরিসংখ্যান দেওয়া হয়েছে তা প্রধানত নেওয়া হয়েছে লন্ডন থেকে প্রকাশিত বিশ্বের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও মর্যাদাসম্পন্ন সামরিক জার্নাল দি ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ এর 'দি মিলিটারী ব্যালান্স' ১৯৮৮–৮৯, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্রনিয়ন্ত্রণ ও নিরস্ত্রীকরণ এজেন্সী কর্তৃক প্রকাশিত 'ওয়ার্ল্ড মিলিটারী এক্সপেন্ডিচার্স এন্ড আর্মস ট্রান্সফারস ১৯৮৮' 'এনসাইক্লোপেডিয়া বিট্রানিকা বুক অব দি ইয়ার ১৯৮৯' ফারইস্টার্ন ইকোনমিক রিভিউ কর্তৃক প্রকাশিত 'এশিয়া ইয়ার বুক ১৯৮৯' থেকে।

।। ২।।

উপরে উল্লিখিত সূত্রসমূহ থেকে ৩৯টি মুসলিম দেশের একটি চিত্র পাওয়া যায়। এই ৩৯টি দেশ হল (১) ব্রুনাই (২) বাহরাইন (৩) কমোরোস (৪) কুয়েত (৫) কাতার (৬) মালদ্বীপ (৭) গাম্বিয়া (৮) মেয়ট (৯) জিবুতি (১০) মালি (১১) গিনি (১২) মৌরিতানিয়া (১৩) নাইজার (১৪) নাইজেরিয়া (১৫) শাদ (১৬) সেনেগাল (১৭) সিয়েরা লিওন (১৮) ইরান (১৯) ইরাক (২০) মিশর (২১) লিবিয়া (২২) সিরিয়া (২৩) জর্ডান (২৪) আলজেরিয়া (২৫) সৌদি আরব (২৬) তুরস্ক (২৭) বাংলাদেশ (২৮) পাকিস্তান (২৯) ইন্দোনেশিয়া (৩০) আফগানিস্থান (৩১) মালয়েশিয়া (৩২) মরক্কো (৩৩) ওমান (৩৪) সোমালিয়া (৩৫) সুদান (৩৬) সংযুক্ত আরব আমিরাত (৩৭) উঃ ইয়েমেন (৩৮) দঃ ইয়েমেন (৩৯) তিউনিসিয়া।

এই ৩৯টি দেশের আয়তন হল ৯৭ লক্ষ ২৩ হাজার ৭২২ বর্গমাইল। ১৯৮৮ সালের জুন মাস পর্যন্ত তাদের জনসংখ্যা হল ৮৯ কোটি ৫৪ লক্ষ ৯৯ হাজার। সৈন্য সংখ্যা ৪৫ লক্ষ ৭৭ হাজার ৭ শত ৩৪। জঙ্গী বিমান ৩ হাজার ৪১৬। সাবমেরিন ৫০, ডেস্ট্রয়ার ফ্রিগেট ৮২। এদের মধ্যে ৮টি দেশের সামরিক বাহিনীর কোন ট্যাঙ্ক নাই, জঙ্গী বিমান নাই, সাবমেরিন নাই, ডেস্ট্রয়ার নাই, ফ্রিগেট নাই। দেশগুলি হল ঃ (১) কমোরোস (২) মালদ্বীপ (৩) গাম্বিয়া (৪) মেয়ট (৫) জিবুতি (৬) নাইজার (৭) শাদ (৮) সিয়েরা লিওন। এই ৮টি দেশ ছাড়াও সেনেগাল ও মৌরিতানিয়ার কোন ট্যাঙ্ক, সাবমেরিন, ডেস্ট্রয়ার, ফ্রিগেট নাই। আছে ১৬টি জঙ্গী বিমান।

এই ১০টি দেশে নাম কা ওয়াস্তে সেনাবাহিনী আছে। এই দশটি দেশের মধ্যে আবার মেয়টের কোন সেনাবাহিনী নাই। অবশিষ্ট নয়টি দেশের সৈন্যসংখ্যা হল ঃ (১) গাম্বিয়া–৬০০ (২) মালদ্বীপ–৭০০ (৩) কমোরোস ৮০০ (৪) জিবুতি–২৮৭০ (৫) সিয়েরা লিওন–৩০০০ (৬) নাইজার–৩৩০০ (৭) সেনেগাল–৯৭০০ (৮) মৌরিতানিয়া–১১,০০০ (৯) শাদ–১৭,০০০। বোধগম্য কারণে ইসরাইলের সাথে মুসলিম দেশসমূহের তুলনামূলক পর্যালোচনার জন্য উপরোক্ত ১০টি দেশকে আমাদের হিসাব থেকে বাদ দেওয়া হল। অবশিষ্ট রইলো ২৯টি দেশ। এই ২৯টি দেশের সৈন্য সংখ্যা হল ৪৫ লক্ষ ২৮ হাজার ৮৫০।

www.pathagar.com

এর বিপরীতে ইসরাইলের সৈন্য সংখ্যা হল ১ লক্ষ ৪১ হাজার। ট্যাঙ্ক ৩ হাজার ৮৫০টি। জঙ্গী বিমান ৬১৩টি। সাবমেরিন ৩টি। ডেস্ট্রয়ার/ফ্রিগেট নেই। ইসরাইলের ট্যাংক বহরে রয়েছে ১ হাজার ৮০টি সেঞ্চুরীয়ান ট্যাংক, ১৩শ'টি এম-৬০ ট্যাংক, ৫৬১টি এম-৪৮ ট্যাংক, ১১৫টি টি-৬২ ট্যাংক প্রভৃতি অত্যাধুনিক ট্যাংক। বিমান বাহিনীতে রয়েছে ৫০টি এফ-১৫ ঈগল, ১৪৫টি এফ-১৬ ফ্যালকন প্রভৃতি অত্যাধুনিক জঙ্গী বিমান। ইসরাইলের ক্ষেপণাস্ত্রবহর অত্যন্ত শক্তিশালী। তাদের রয়েছে ৫ শত মাইল পাল্লার ভূমি থেকে ভূমিতে নিক্ষেপযোগ্য ক্ষেপণাস্ত্র (এস এস এম)। নাম 'জেরিকো'। আরও রয়েছে ২৮০ মাইল পাল্লার এস এস এম। নাম 'ল্যান্স'। বিমান বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্রের মধ্যে রয়েছে ভুমি থেকে আকাশে নিক্ষেপযোগ্য ক্ষেপণাস্ত্র (এস এ এম) 'রেডিয়ো', সাবমেরিনে রয়েছে 'হারপুন' ক্ষেপণাস্ত্র। ট্যাংক বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্রের মধ্যে রয়েছে 'ড্রাগন' 'পিকেট', 'রামতা'। নৌবাহিনীর অন্যান্য ক্ষেপণাস্ত্রের মধ্যে রয়েছে ভূমি থেকে আকাশে নিক্ষেপযোগ্য 'হক' আকাশ থেকে ভূমিতে নিক্ষেপযোগ্য 'ম্যাভেরিক', 'শাইক', 'জিব্রাইল' এবং আকাশ থেকে আকাশে নিক্ষেপযোগ্য 'সাইড উইন্ডার', 'স্প্যারো', 'পাইথন' প্রভৃতি। মিলিটারী ব্যালান্স অসমর্থিত সংবাদ সূত্রের উল্লেখ করে জানাচ্ছে যে, ইসরাইলের অন্তত ১০০টি আণবিক ওয়ারহেড রয়েছে, যেগুলো 'জেরিকো' এবং 'ল্যান্স' ক্ষেপণাস্ত্রের মাধ্যমে নিক্ষেপযোগ্য।

।।৩।।

ইসরাইলের উপরে উল্লিখিত সমরশক্তির বিপরীতে ২৯টি মুসলিম দেশের যে সমরশক্তি রয়েছে সে সম্পর্কে পূর্বেই একটি চিত্র দেওয়া হয়েছে। এই ২৯টি দেশের মধ্যে ৮টি দেশকে আমরা ফ্রন্টলাইন রাষ্ট্র বা ইসরাইল বিরোধী শিবিরের অগ্রবর্তী রাষ্ট্র হিসেবে অভিহিত করতে পারি। এই দেশগুলি হলো ঃ (১) ইরান (২) ইরাক (৩) সৌদি আরব (৪) মিশর (৫) আলজেরিয়া (৬) লিবিয়া (৭) সিরিয়া (৮) জর্ডান। এই ৮টি রাষ্ট্রের সম্মিলিত আয়তন ১৭ লক্ষ ৮৪ হাজার ৫৯৫ বর্গমাইল। এই ৮টি দেশের মোট জনসংখ্যা ১৯৮৮ সালের জুন মাস পর্যন্ত ২৫ কোটি ৬ লক্ষ ৯৪ হাজার। সশস্ত্র বাহিনীর সংখ্যা ২৩ লাখ ৯৬ হাজার ৭০০। মোট ট্যাংক ১৬ হাজার ৫৪৭টি। মোট জঙ্গী বিমান ২ হাজার ৬১৬টি। মোট সাবমেরিন ২৫টি। ডেস্ট্রয়ার/ফ্রিগেট ৩১টি। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, ঐ ২৯টি নয়, এই ৮টি ফ্রন্টলাইন রাষ্ট্রই ইসরাইলের মিলিটারী মেশিনকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিতে পারে। কিন্তু কঠোর বাস্তব সত্য হলো এই যে, তারা তা পারছে না এবং ইসরাইলের হাতে মার খাচ্ছে।

এই ৮টি রাষ্ট্র তো পরের কথা, এদের মধ্যে ইরাকের একারই ইসরাইলকে পিটিয়ে ঠাণ্ডা করে দেয়ার কথা। কারণ ৯০ সালের উপসাগরীয় যুদ্ধের পূর্বে ইসরাইলের ১ লক্ষ ৪১ হাজার সৈন্যের বিপরীতে ইরাকের ছিল ১০ লক্ষ সৈন্য। ইসরাইলের

www.pathagar.com

৩৮৫০টি ট্যাঙ্কের বিপরীতে ইরাকের ৪৬৫০টি ট্যাঙ্ক। ইরাকের ট্যাঙ্ক বহরে রয়েছে রুশ অত্যাধুনিক টি-৬২, টি-৭২ ও বৃটিশ 'চীফ টেইন' মার্কিন এম-৬০, এম-৭৭ প্রভৃতি ট্যাঙ্ক। ৬শ' জঙ্গী বিমান বহরে রয়েছে সর্বাধুনিক মিগ-২৯ 'ফ্যালকাম' ২৫টি, ১৫টি মিগ-২৫ 'ফক্সব্যাট', ৭০টি মিগ-২৩ 'ফ্লগার' , ৩০টি এস ইউ-২৪ 'ফেন্সার' , ৯৪টি মিরাজ এফ-১ প্রভৃতি। ইরাকের মিরাজ-১ বিমান গুলিতে আকাশে উড়ন্ত অবস্থায় জ্বালানী ভরা, অর্থাৎ ইনফ্লাইট রিফুয়েলিং-এর ব্যবস্থা রয়েছে। ইরাকের ক্ষেপণাস্ত্রের নাম 'স্কাড' ও 'ফ্রগ'। এসব মিসাইল আণবিক বোমা অথবা জৈব রাসায়নিক অস্ত্র বহন ও নিক্ষেপ করতে পারে। ইরাকের অস্ত্রভাণ্ডারে রয়েছে ১৫০টি আর্মড হেলিকপ্টার। একমাত্র পরাশক্তি ছাড়া আর কোন দেশের এত বিপুল সংখ্যক জঙ্গী হেলিকপ্টার নাই। ভূমি থেকে ভূমি, ভূমি থেকে আকাশ, আকাশ থেকে আকাশ-প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রে ছিল ইরাকের আধুনিক মিসাইল। ইরাকের এই বিশাল সশস্ত্র বাহিনী এবং দানবাকৃতি মিলিটারী মেশিন থাকতেও ইসরাইল এখনও তার সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রেখে চলেছে। কিন্তু কেমন করে?

মার্কিন অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ ও নিরস্ত্রীকরণ এজেন্সীর 'ওয়ার্ল্ড মিলিটারী এক্সপেন্ডিচার্স এণ্ড আর্মস ট্রান্সফারস্' ম্যাগাজিন থেকে দেখা যায় যে, ১৯৮৮ সালের জুন মাসে সমাপ্ত এক বৎসরে এই আটটি ফ্রন্ট লাইন রাষ্ট্রের মধ্যে ৪টি দেশ অর্থাৎ ইরাক, সৌদি আরব, সিরিয়া এবং মিশর মোট ১২.৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমরাস্ত্র ক্রয় করেছে। বাংলাদেশী মুদ্রায় এ অর্থের পরিমাণ হলো ৪৩ হাজার ৪৯৪ কোটি টাকা। এদের মধ্যে অস্ত্র আমদানী ক্ষেত্রে শীর্ষে ছিল ইরাক। ইরাক ৫০৬ বিলিয়ন ডলার অর্থাৎ ১৯ হাজার ২৮ কোটি টাকার অস্ত্র আমদানী করেছে। আলোচ্য বছরে ইরাকের সামরিক খাতে ব্যয় ছিল ১৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। অর্থাৎ বাংলাদেশী মুদ্রায় ৪৭ হাজার ৫৭২ কোটি টাকা। অস্ত্র আমদানীর ক্ষেত্রে মধ্যপ্রাচ্যে দ্বিতীয় ছিল সৌদী আরব। তাদের অস্ত্র আমদানীর পরিমাণ ৩০৮ বিলিয়ন ডলার। বাংলাদেশী মুদ্রায় এ অর্থের পরিমাণ ১২ হাজার ৯১২ কোটি টাকা। ৩য় স্থানে সিরিয়া। তাদের অস্ত্র আমদানীর পরিমাণ ছিল ১.৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। বাংলাদেশী মুদ্রায় এ অর্থের পরিমাণ ৬ হাজার ৪৫৬ কোটি টাকা। ৪র্থ স্থানে ছিল মিশর। তাদের অস্ত্র আমদানীর পরিমাণ ছিল ১.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। বাংলাদেশী মুদ্রায় এ অর্থের পরিমাণ ৫ হাজার ৯৭ কোটি টাকা। ৭১ হাজার ৪৯৮ বর্গমাইলের এই দেশটিতে রয়েছে ১ কোটি ১৩ লক্ষ ৩৮ হাজার লোকের অধিবাস। জনসংখ্যা ও আয়তনে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র এই দেশটির সশস্ত্র বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা হলো ৪ লক্ষ ৪ হাজার। তাদের ট্যাংকের সংখ্যা হলো ৪ হাজার ৫০। বিমান বাহিনীতে রয়েছে ৪৪৮টি জঙ্গী বিমান। এছাড়া রয়েছে ৩টি সাবমেরিন ও ২টি ডেস্ট্রয়ার/ফ্রিগেট। এদের ট্যাংক বহরে রয়েছে অন্তত ৯৫০টি সর্বাধুনিক ট্যাংক টি-৭২। আরও রয়েছে ১ হাজার অত্যাধুনিক টি-৬২ ট্যাংক। এদের বিমানবাহিনীতে

www.pathagar.com

রয়েছে ১৪০টি মিগ-২৩ 'ফ্লগার', ৩৫টি মিগ-২৫ 'ফক্সব্যাট', ১৫টি মিগ-২৯ 'ফ্যালকাম', ৩৩টি এস ইউ-২২ 'ফিটার' বোমারু বিমান। মধ্যপ্রাচ্যের অপর একটি দেশ কর্ণেল গাদ্দাফীর ইসলামী প্রজাতন্ত্র লিবিয়া। ৬ লক্ষ ৮৫ হাজার ৮২৪ বর্গমাইলের এ দেশটির জনসংখ্যা মাত্র ৪৩ লক্ষ ২৬ হাজার। কারণ দেশটির বিস্তীর্ণ অঞ্চল হলো ধু-ধু মরু প্রান্তর। কিন্তু ইসলামের বিপ্লবী চেতনায় উদ্বুদ্ধ কর্ণেল গাদ্দাফী গড়ে তুলেছেন ৭১ হাজার ৫০০ সৈন্যের এ সশস্ত্র বাহিনী। ট্যাংক সংখ্যা ১ হাজার ৯৪০। বিমান বাহিনীতে রয়েছে ৪৭৪টি জঙ্গী বিমান। এছাড়াও রয়েছে ৬টি সাবমেরিন, ২টি ডেস্ট্রয়ার/ফ্রিগেট। লিবিয়ার ট্যাংক বহরে রয়েছে ১৮০টি টি-৭২ ট্যাংক। লিবিয়ার বিমান বাহিনীতে রয়েছে ১৭৩টি মিগ-২৩ 'ফ্লগার', ৬৭টি মিগ-২৫ 'ফক্সব্যাট,' ৯২টি এসইউ-১৭ 'ফিটার' বোমারু বিমান, ৩৬টি এফ-১ মিরাজ প্রভৃতি।

৯ লক্ষ ১৯ হাজার ৫৯৫ বর্গমাইলের দেশ আলজেরিয়ার জনসংখ্যা হলো ১ কোটি ৪৪ লক্ষ ৮১ হাজার। তাদের ১ লক্ষ ৩৯ হাজার সদস্য নিয়ে গঠিত সশস্ত্র বাহিনীতে রয়েছে ৯৫৩টি ট্যাংক ও ২৬৬টি জঙ্গী বিমান। তাদের রয়েছে ৩০০টি টি-৬২ ও ১০০টি টি-৭২ ট্যাংক। বিমান বাহিনীতে রয়েছে ৫৪টি মিগ-২৩ ও ২৫টি মিগ-২৫। সৌদী আরবের আয়তন ৮ লক্ষ ৬৫ হাজার বর্গমাইল ও জনসংখ্যা ১ কোটি ২৯ লক্ষ ৭২ হাজার হলেও সশস্ত্র বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা মাত্র ৭২ হাজার। ট্যাংক মাত্র ৫৫০ ও জঙ্গী বিমান মাত্র ১৮২। সৌদী বিমান বাহিনীতে উল্লেখযোগ্য হলো ৬২টি এফ-১৫ অত্যাধুনিক জঙ্গী বিমান।

৩৩ হাজার ৪৪৩ বর্গমাইলের একটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্র জর্ডান। জনসংখ্যা মাত্র ২৯ লক্ষ ৬৫৪ হাজার। কিন্তু সৈন্য সংখ্যা ৮৫ হাজার ২০০। তাদের অস্ত্র ভাণ্ডারে রয়েছে ৯৭৯টি ট্যাংক এবং ১৩৪টি জঙ্গী বিমান। মিরাজ এফ-১ কে যদি আধুনিক বিমান বলা যায় তাহলে তাদের রয়েছে ৩৫টি মিরাজ এফ-১।

৬ লক্ষ ৩৪ হাজার ৫৫ বর্গমাইলের দেশ ইরানের জনসংখ্যা ৫ কোটি ১২ লক্ষ ২৫ হাজার। সৈন্য সংখ্যা ৩ লক্ষ ৫ হাজার। ট্যাংক মাত্র ১ হাজার ও জঙ্গী বিমান মাত্র ৯০টি। এর মধ্যে মাত্র ১০টি এফ-১৪ আধুনিক বিমান।

৩ লক্ষ ৮৫ হাজার ২শ' ২৯ বর্গমাইলের দেশ মিশরের জনসংখ্যা ৫ কোটি ২ লক্ষ ৭৩ হাজার। ৩ লক্ষ ২০ হাজার সদস্য সম্বলিত সশস্ত্র বাহিনীতে রয়েছে ২ হাজার ৪২৫টি ট্যাংক, ৪৪১টি জঙ্গী বিমান, ১২টি সাবমেরিন ও ৫টি ডেস্ট্রয়ার/ফ্রিগেট, ৬০০ টি-৬২ ট্যাংক। বিমান বাহিনীতে রয়েছে ৩৩টি এফ-১৬ ও ১৬টি মিরাজ-২০০০, মোট ৪৯টি সর্বাধুনিক জঙ্গী বিমান।

উপরের এই সামরিক চিত্র থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, যেসব মুসলিম দেশ মার্কিন শিবিরভূক্ত তাদের কাউকেই আমেরিকা সামরিক দিক দিয়ে শক্তিশালী করেনি।

www.pathagar.com

।।৪।।

আবার সেই পুরনো প্রশ্ন ইসরাইলের কাছে এমনি করে এসব মুসলিম দেশ মার খেল কেন? উত্তর খুব সোজা। জেহাদী আদর্শ ও জেহাদী মনোভাবের অভাব। ইসরাইলের বিরুদ্ধে প্রধানত মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলির কিসের সংগ্রাম? একটি স্বাধীন ফিলিস্তিনী রাষ্ট্র গঠন। কিন্তু এ রাষ্ট্রের আদর্শিক বুনিয়াদ কি? ইয়াসির আরাফাত কি চান? মিশর সর্ব প্রথম ইসরাইল বিরোধী শিবিরের নেতৃত্ব দেয়। মিশরের প্রেসিডেন্ট মরহুম জামাল আবদুন নাসের আরব জাতীয়তাবাদের ধুয়া তোলেন। ঐ দিকে মরহুম জওহর লাল নেহেরু ও মরহুম টিটোর সাথে মিলে রুশ প্রভাবিত তৃতীয় শিবির গড়ার চেষ্টা করেন। মুসলমানদের আবহমান কালের আদর্শ বিসর্জন দিয়ে সমাজতন্ত্রের বুলি ছাড়েন। তার পথ ধরে রক্তাক্ত সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ইরাকের তখতে তাউসে বসেন নুরী আস্ সাইদ, করিম কাসেম প্রমুখ। সিরিয়ার নেতৃত্বে আসে বাথ্‌পার্টি। আলজেরিয়ায় আসেন বেনবেল্লাহ ও বেন খেদ্দা। এদেরও ঐ কমন শ্লোগান সমাজতন্ত্র ও আরব জাতীয়তাবাদ। এভাবেই সমগ্র মুসলিম জাহানে ইসলামী বিপ্লবের পরিবর্তে ভিনদেশী আদর্শের মাধ্যমে অনৈক্যের বীজ বপন করা হয়। ইসরাইলের বিরুদ্ধে আরব জাতীয়তাবাদই যদি ঐক্যের মুখ্য নিয়ামক হয়, তাহলে ৫ কোটি ৪১ লক্ষ লোকের দেশ তুরস্ক, ১৭ কোটি ৫৯ লক্ষ লোকের দেশ ইন্দোনেশিয়া, ১০ কোটি ৯৬ লক্ষ লোকের দেশ বাংলাদেশ, ১১ কোটি লোকের দেশ পাকিস্তান, ৫ কোটি ১২ লক্ষ লোকের দেশ ইরান, এই মোট ৫০ কোটি মানুষ ইসরাইল বিরোধী সংগ্রামে সামিল হবে কেন? এই ৫টি দেশ তো আরব দেশ নয়। ভৌগোলিক জাতীয়তাবাদই যদি প্রথম পরিচয় হয় তাহলে তো এরা ইরানী, তুর্কী, পাকিস্তানী, বাংলাদেশী বা ইন্দোনেশিয়া। অনুরূপভাবে মালয়েশিয়া, আফগান, নাইজেরিয়া, সোমালিয়া, ব্রুনাই, কমোরস, মালদ্বীপ, গাম্বিয়া, মেয়ট, জিবুতী, মালি, গিনি, মৌরিতানিয়া, নাইজার, সেনেগাল, সিয়েরা লিওন প্রভৃতি দেশের অধিবাসীরা আরব নয়। এরা কেন ইসরাইল বিরোধী ফিলিস্তিনী সংগ্রাম সমর্থন করবে? কিন্তু তবু তারা সমর্থন করছে বিগত ৩ দশক ধরে। মুক্ত কণ্ঠে, বুলন্দ আওয়াজে।

এই অর্ধশত কোটি অনারব ইসরাইল বিরোধী সংগ্রামকে দেখেছে একটি জেহাদ হিসেবে। পশ্চিমা সমর্থনপুষ্ট ইহুদীদের বিরুদ্ধে সারা দুনিয়ার মুসলমানদের ইসলামী বিপ্লব হিসেবে। ইসরাইল বিরোধী রক্তক্ষয়ী সংগ্রামকে সঠিকভাবে চিত্রিত করেছেন লিবিয়ার প্রেসিডেন্ট কর্ণেল গাদ্দাফী। নিজে একজন আরব হয়েও তিনি লিবিয়ার বিপ্লবকে পবিত্র কোরআন ও সুন্নার অনুশাসনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করেছেন এবং সমগ্র মুসলিম জাহানকে প্যান ইসলামী আদর্শের প্রশ্নিতে আবদ্ধ করার চেষ্টা করেছেন। এই পথে আরেকজন কালজয়ী নেতা সঠিক পথের দিশারী হিসাবে আবির্ভূত হন। তিনি হলেন পশ্চিমা ও কমিউনিস্ট দুনিয়ার জানি দুশমন, ৫ কোটি ইরানীর নয়নমনি,

www.pathagar.com

ইসলামী বিপ্লবের মশাল বরদার আয়াতুল্লাহ রুহল্লা খোমেনী। কর্ণেল গাদ্দাফী ও ইমাম খোমেনীর বহু পূর্বে ইসরাইল বিরোধী সংগ্রামকে সঠিকপথে পরিচালিত করা এবং তাকে ইসলামী বিপ্লবের মহামন্ত্রে উজ্জীবিত করার নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়েছেন ইসলামী প্রজাতন্ত্র পাকিস্তান। ৯০ কোটি মুসলমানের সমর্থন ও আশীর্বাদে অভিসঞ্চিত এই দুর্বার সংগ্রামকে আরব জাতীয়তাবাদ ও সমাজতন্ত্রের সংকীর্ণ চোরাগলিপথে প্রোথিত করা হয়। ঐদিকে কয়েকটি আরব রাষ্ট্র রুশ ও চীন বিরোধী ভূমিকার নামে আমেরিকার পায়রবী করা শুরু করে।

এসবের অবধারিত পরিণতি হিসেবে ইসরাইল বিরোধী সংগ্রাম লক্ষ্যহীন, দিশাহীন দিকভ্রান্ত হয়ে পড়ে। এই বিভ্রান্ত ছত্রখান অবস্থারই সুযোগ নিয়েছে ইসরাইল। '৬৭ ও '৭৩-এ আরব এলাকা দখল করে, '৮১তে ইরাকী পারমাণবিক স্থাপনায় 'ব্লিৎক্রীপ' হামলা করে এবং বার বার অসংখ্যবার আরব বসতিতে আক্রমণ চালায়।

।।৫।।

পাকিস্তান, ইরান ও লিবিয়ার স্বপ্ন ছিল অবৈধ রাষ্ট্র ইসরাইলকে বিষবৃক্ষের মত সমূলে উৎপাটিত করা। কিন্তু কোরআন ও সুন্নাহর মহান আদর্শ ইসলাম ও তার অনুসারীদের মধ্যে তন্ত্র মন্ত্র আমদানী করে আপোষ ও ষড়যন্ত্রের সুড়ঙ্গপথে হামাগুড়ি দিয়ে ইয়াসির আরাফাত ইসরাইলকে স্বীকৃতি দানে অঙ্গীকার করেছেন। যদি ইসরাইলকে খতম করতে হয়, যদি পবিত্র জেরুজালেম নগরী পুনরুদ্ধার করতে হয়, যদি মস্‌জিদুল আকসার পবিত্রতা ফিরিয়ে আনতে হয়, তাহলে ফিলিস্তিনী সংগ্রামকে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে চলবে না। আফগানিস্তানে মুজাহিদীনদের রক্তক্ষয়ী জেহাদ, ভারতীয় বেয়নেট ও ইন্ডিয়ান সিপাহীর বুটেরতলায় কাশ্মীরী মুসলমানদের আজাদী ও ইসলামী বিপ্লবের রক্তঝরা সংগ্রাম, আজারবাইজানে রুশ দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে ইসলামী ইনকিলাব, বার্মার রোহিঙ্গা মুসলমান, ইরিত্রিয়া ও ফিলিস্তিনী ও মরো মুসলমানদের আজাদী আন্দোলন, ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা সংগ্রাম-এই সমস্তকে এক জামাতের পথ দেখিয়েছে শাশ্বত, পূর্ণাঙ্গ জীবনদর্শন- মহান ইসলাম। আর এই জামাতে শামিল হতে পারলেই ফিলিস্তিনীদের জন্য নেমে আসবে বিশ্ব স্রষ্টা ও বিশ্বপ্রতিপালকের দোয়া।

'নাসরুম মিন আল্লাহে ফাত্‌হুন করীব।'

নিশ্চয়ই মোমিনদের জন্য আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় নিকটবর্তী।

www.pathagar.com

আণবিক যুদ্ধের দুয়ার থেকে ফিরে এসেছে পাক ভারত

[২০০১ সালের ডিসেম্বর এবং ২০০২ সালের জানুয়ারিতে পাকিস্তান ও ভারতের দশ লক্ষ সৈন্য মুখোমুখী দাড়িয়ে গিয়েছিল। দক্ষিণ এশিয়ার এক শত ২৫ কোটি মানুষ এবং সেই সাথে বৃহৎ শক্তিগুলো যখন পারমাণবিক যুদ্ধের আতংকে অস্থির তখন সাপ্তাহিক পূর্ণিমায় এই লেখাটি প্রচ্ছদ কাহিনী হিসেবে ছাপা হয়েছিল। সেই পটভূমিতে এই লেখা পড়তে হবে। তবে পাকিস্তান ও ভারতের প্রচলিত সামরিক শক্তি এবং পারমাণবিক ও ক্ষেপণাস্ত্র শক্তির যে পরিসংখ্যান এই নিবন্ধে দেওয়া হয়েছে পরবর্তীতে তার বড় রকমের হেরফের হয়নি। – লেখক]

ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে আদতেই কি যুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠবে? যদি যুদ্ধ লাগে তাহলে কবে নাগাদ সেটা লাগতে পারে? নাকি যুদ্ধের উত্তেজনা ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে পড়ছে? কাশ্মীর এবং সমগ্র পাকিস্তান সীমান্ত জুড়ে ভারত মোতায়েন করেছে সাড়ে ৭ লাখ সৈন্য এবং তিন হাজার ট্যাঙ্ক। এছাড়া কয়েকশত স্বল্প পাল্লার ভূমি থেকে ভূমিতে নিক্ষেপযোগ্য ক্ষেপনাস্ত্র ও (এস এস এম) মোতায়েন করেছে। এসব ক্ষেপণাস্ত্রের নাম 'পৃথ্বি'। এসব মিসাইল পারমাণবিক বোমাও বহন করতে পারে। ২৫০০ মাইল পাল্লার 'অগ্নি' নামক ক্ষেপণাস্ত্র অগ্রবর্তী অবস্থানে মোতায়েন করা হয়েছে কিনা সে সম্পর্কে কোনো কনফার্মেশন পাওয়া যায়নি।

এখন বিভিন্ন মহলে গুঞ্জন সৃষ্টি হয়েছে যে, যদি যুদ্ধ নাই লাগে তাহলে ৬ মাস ধরে এই বিশাল সৈন্য সামন্ত এবং অস্ত্রপাতি সীমান্তে নিয়ে যাওয়া হয়েছে কেন? ৬ মাস ধরে তারা সীমান্ত এলাকায় আছে। আর কত মাস তারা সেখানে থাকবে? এই যে ৬ মাস ধরে তারা সীমান্তে অবস্থানের জন্য শত শত কোটি রূপী খরচ করলো তার চূড়ান্ত লক্ষ্য কি? পাকিস্তান তো ভারতকে এমন কথা দেয়নি যে, তারা কাশ্মীরের মুক্তিযুদ্ধে কোনো সমর্থন দেবে না। বরং সেদিনও জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত রেডিও ও টেলিভিশন ভাষণে জেনারেল পারভেজ মোশাররফ কাশ্মীরের মুক্তিসংগ্রামে রাজনৈতিক, কূটনৈতিক এবং নৈতিক সমর্থন অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত পুনর্ব্যক্ত করেছেন। তাহলে বিজেপি সরকার ভারতবাসীর কাছে কি জবাব দেবে? কেন ৬ মাসের মতো লম্বা সময় ধরে ভারতীয় সামরিক বাহিনীকে সীমান্তে রাখা হয়েছে? আর কতদিন তারা সেখানে থাকবে? কোনো কিছু কংক্রিট অর্জন যদি তারা দেশবাসীকে দেখাতে না পারে তাহলে কোন মুখে তারা ব্যারাকে ফিরে আসবে? পাকিস্তানের আকাশসীমার একটি বিরাট অংশ এখন আমেরিকার নিয়ন্ত্রণে। সেদেশের ৪টি সামরিক ঘাঁটির কর্তৃত্বও নাকি এখন মার্কিনীদের হাতে। মাঝে মাঝে তারা ফয়সালাবাদসহ কোনো কোনো এলাকায় আল কায়দা খুঁজে বেড়াচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে কি ভারত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু করবে? সেটি করে তারা কি আমেরিকাকে চটাতে

www.pathagar.com

দুই মাসের সময় দিয়েছেন। এই দুই মাসের মধ্যে পাকিস্তান অথবা আজাদ কাশ্মীর থেকে ভারতীয়দের ভাষায় 'কাশ্মীরে অনুপ্রবেশকারীদের প্রশিক্ষণ শিবিরসহ' সমস্ত স্থাপনা গুটিয়ে ফেলতে হবে। এই খবরের কোনো প্রতিবাদ ভারত বা পাকিস্তান কেউই করেনি। তাহলে কি ধরে নিতে হবে যে যুদ্ধের সম্ভাবনা তিরোহিত হয়নি, যুদ্ধ দুই মাস পিছিয়ে গেছে মাত্র? আরো চলছে অনেক জল্পনা কল্পনা। যুদ্ধ যদি লেগেই যায় তাহলে চূড়ান্ত পরিণামে কে হারবে আর কে জিতবে? যদি পাকিস্তানের কিছু ভূখণ্ড ভারত দখল করে তখনও কি পাকিস্তান 'ওম শান্তি' 'ওম শান্তি' বলে শান্তির ললিত বাণী জপ করতেই থাকবে? নাকি দেয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়ায় ভারতীয় ভূখণ্ডে পারমাণবিক বোমা ফেলবে? অর্থাৎ জ্ঞানী গুণীদের ভাষায় যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে এই উপমহাদেশে কি শুরু হবে নিউক্লিয়ার হলোকাস্ট? এ ধরনের অসংখ্য প্রশ্নের ভিড়ে আসুন, সর্বাগ্রে দেখি যুদ্ধ কি সত্যি সত্যি আসন্ন? এই সম্ভাবনা পরীক্ষার পূর্বে আসুন, সাম্প্রতিক কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার প্রতি একটু নজর বুলিয়ে নেয়া যাক।

৬ মাস হল সাড়ে ৭ লাখ সৈন্য কি করছে?

সকলেই জানেন যে, গত বছরের ১৩ ডিসেম্বর তারিখে ভারতীয় পার্লামেন্টের সামনে গোলাগুলির একটি ঘটনা ঘটে। এই গোলাগুলিকে শাসক দল বিজেপি ভারতের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের ওপর হামলা বলে প্রচার করে। তারা এ হামলার জন্য পাকিস্তান সরকারকে দায়ী করে।

টুইন টাওয়ারে গত ১১ সেপ্টেম্বর অজ্ঞাতনামা শক্তি কর্তৃক বিমান হামলার পর বুশ প্রশাসন ঘোষণা করে যে, আমেরিকা আক্রান্ত হয়েছে। সুতরাং হামলাকারীদের শাস্তি দেয়ার জন্য আমেরিকা আফগানিস্তানে হামলা চালায় এবং দেশটি দখল করে নেয়। এখানে তাদের যুক্তি ছিলো যে হামলা পরিচালনা করেছে ওসামা বিন লাদেনের আল কায়দা সংগঠন। আল কায়েদার প্রধান ঘাঁটি ছিলো আফগানিস্তানে। যদিও আজ পর্যন্ত কোনো বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ আমেরিকা হাজির করতে পারেনি যে, আল কায়েদাই টুইন টাওয়ার এবং পেন্টাগণে হামলা করেছে তৎসত্ত্বেও আমেরিকা আফগানিস্তানে প্রচণ্ড হামলা চালায় এবং দেশটি দখল করে নেয়। আমেরিকার পদাঙ্ক অনুসরণ করে ভারতও বলছে যে, পাকিস্তানই ভারতীয় লোকসভায় হামলা করার জন্য দায়ী। ভারত অভিযোগ করছে যে, পাকিস্তান এবং আজাদ কাশ্মীরে চরমপন্থীদের সশস্ত্র ট্রেনিং শিবির এবং আস্তানা রয়েছে। এগুলো ধ্বংস করার জন্য পাকিস্তানের অভ্যন্তরে এবং কাশ্মীর নিয়ন্ত্রণ রেখা পার হয়ে ভারতীয় বাহিনীকে প্রবেশ করতে হবে। ভারত হয়ত শুধুমাত্র আমেরিকা নয়, ইসরাইলের কাছ থেকেও এই অনুপ্রেরণা পেয়েছে। স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র গঠনের দাবীতে এবং ফিলিস্তিন ভূখণ্ড ইসরাইলের আগ্রাসন থেকে মুক্ত করার জন্য নিজেরা আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছে। ফিলিস্তিনীদের এই আত্মত্যাগ সর্বোচ্চ কোরবানি। অথচ আত্মত্যাগের এই মহান আদর্শকে সন্ত্রাসী হামলা বলে বদনাম দিয়ে ইসরাইল পশ্চিম তীর এবং গাজায় বর্বর হামলা চালিয়েছে। আমেরিকা এবং ইসরাইলের এই সহিংস বর্বর হামলাকেই ভারত নজির হিসেবে গ্রহণ করেছে। সম্ভবত সেই কারণে ১৩ ডিসেম্বরের পর ভারত পাকিস্তান ও কাশ্মীর সীমান্তে সাড়ে ৭ লাখ সৈন্য মোতায়েন করেছিলো। সীমান্ত এলাকায় ভারত তিন

www.pathagar.com

হাজার ট্যাঙ্ক এবং কয়েকশত ক্ষেপণাস্ত্র মোতায়েন করেছে। ডিসেম্বর মাসেও দুই দেশের মধ্যে প্রচণ্ড উত্তেজনার সৃষ্টি হয় এবং তারা যুদ্ধের মুখোমুখি দাঁড়ায়। পশ্চিমা দুনিয়া সক্রিয়ভাবে হস্তক্ষেপ করলে ডিসেম্বর জানুয়ারি মাসে যুদ্ধ পরিহার করা সম্ভব হয়।

আর্মী ও নেভীর অধীনে আধাসামরিক বাহিনী

সেই থেকে লক্ষ লক্ষ ভারতীয় সৈন্য সীমান্তেই অবস্থান করছে। এটার নামই হল সার্বক্ষণিক যুদ্ধ প্রস্তুতি। অর্থাৎ ভারত মনে করছে যে, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি অনুকূল হলে সে পাকিস্তান আক্রমণ করবে। গত ১৪ মে ভারতের দখলকৃত কালুচক নামক স্থানে কাশ্মীরী মুক্তিযোদ্ধারা গেরিলা হামলা চালালে ভারত আবার পাকিস্তান আক্রমণের সর্বাত্মক প্রস্তুতি গ্রহণ করে। এ উদ্দেশ্যে গত ২৩ মে থেকে ভারতের আধাসামরিক বাহিনীকে সেনাবাহিনীর অধীনে এবং কোস্টগার্ডকে নৌবাহিনীর কমান্ডে ন্যস্ত করা হয়েছে।

যন্ত্রাংশের অভাব এবং কারিগরি সমস্যার জন্য ভারতের বিমান বাহিনীর মেরুদণ্ড শত শত মিগ-২১ জঙ্গী বিমানের ফ্লাইট অপারেশন স্থগিত রাখা হয়েছিলো। কিন্তু ২৩ মে'র পর মিগ-২১ জঙ্গী বিমানের স্থগিত ফ্লাইট অপারেশন আবার চালু করা হয়েছে।

ভারতের পারমাণবিক প্রকল্পের প্রধান ঘোষণা করেছেন যে, নিম্নতম পারমাণবিক আগ্রাসন প্রতিরোধ প্রস্তুতি Minimum nuclear deterrence গ্রহণ করা হয়েছে। এই টেকনিক্যাল পরিভাষার অর্থ হল, পাকিস্তান যদি পারমাণবিক হামলা চালায় তাহলে ভারতও পাল্টা পারমাণবিক আঘাতের জন্য প্রস্তুত।

গত ২১ মে থেকে তিন দিনের জন্য প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ী ফরওয়ার্ড এরিয়া পরিদর্শন করেন। এই পরিদর্শনকালে তিনি সামরিক বাহিনীর জওয়ানদেরকে চূড়ান্ত মুহূর্তের জন্য প্রস্তুত থাকতে বলেছেন। এর সোজা বাংলা হল, 'সময় এসে যাচ্ছে। তোমরা আক্রমণের জন্য তৈরি থেকো।'

ওয়ার বুকের অশুভ উচ্চারণ

গত ২১ মে বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি ভারতীয় মন্ত্রিসভার দ্বিতীয় সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি মিঃ এল কে আদভানী ঘোষণা করেছেন যে, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে এবার যে ব্যবস্থা গৃহীত হবে সেটা নির্ধারিত হবে 'বুক অব ওয়ার' অনুযায়ী। বুক অব ওয়ার সম্পর্কে যাদের ছিটেফোটাও ধারণা আছে তারা জানেন যে, এটি অত্যন্ত বিপজ্জনক উক্তি। ওয়ার বুক হল অত্যন্ত গোপনীয় একটি দলিল। এই বইয়ে রক্ষিত আছে অতীতের সমস্ত যুদ্ধ বিগ্রহের রেকর্ড। সেই সব যুদ্ধ বিগ্রহে কি প্লান করা হয়েছিলো, কোন কৌশল অবলম্বন করা হয়েছিলো, সেই সব কৌশল কতদূর কার্যকরি হয়েছে অথবা ব্যর্থ হয়েছে, সে সম্পর্কে থাকে খুঁটিনাটি তথ্য। শত্রুর সাথে পরবর্তী যুদ্ধে কি কৌশল নেয়া হবে সেটাও বিধৃত থাকে এই ওয়ার বুকে। এই অতীব গুরুত্বপূর্ণ দলিলটি প্রতিটি রেজিমেন্টের নিকট সংরক্ষিত থাকে। এটা তখনই ব্যবহার করা হয় যখন ধরে নেয়া হয় যে সামরিক বাহিনী যুদ্ধযাত্রা করছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এল কে আদভানীর মত লৌহমানব এবং কট্টর হিন্দুত্ববাদী নেতার মুখ থেকে ওয়ার বুকের উচ্চারণ অত্যন্ত তাৎপর্যময়।

www.pathagar.com

প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ী যখন কাশ্মীরের ফরওয়ার্ড পজিশন সফর করেন তখন সেখানে ইউনিফাইড কমাণ্ডের বৈঠক হয়। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ইউনিফাইড বা সংযুক্ত কমাণ্ডের অন্যান্য সদস্য হলেন প্রতিরক্ষা ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, সামরিক বাহিনীর তিন প্রধান এবং আধা সামরিক বাহিনী ও পুলিশ প্রধান। সংযুক্ত কমাণ্ডের বৈঠক তখনই অনুষ্ঠিত হয় যখন একটি দেশ যুদ্ধযাত্রার আয়োজন করে।

গুজরাটের বীভৎস মুসলিম নিধনের অবসান হয়নি। তার আগেই সেখান থেকে সেনাবাহিনী সরিয়ে নেয়া হয়েছে এবং সেই সেনাবাহিনীকে অগ্রবর্তী এলাকাসমূহে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

পাক-ভারত উত্তেজনায় মার্কিন ফ্যাক্টর

এতক্ষণ ধরে যে ৭টি ঘটনার বর্ণনা করা হলো সেসব ঘটনার বিবরণ পড়লে মনে হতেই পারে যে, যে কোনো দিন যে কোনো মুহূর্তে ভারত পাকিস্তানের ওপর হামলা চালাবে। তাই দেশী-বিদেশী সংবাদপত্রে যুদ্ধ আসন্ন বলে ভবিষ্যদ্বাণী করা হচ্ছিলো। সত্যি কথা বলতে কি, ব্যক্তিগতভাবে আমার তেমন কোনো আশঙ্কা কোনো সময়ই হয়নি। পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে যুদ্ধ লাগবে না, এমন ঢালাও মন্তব্য আমি করছি না। আমার বক্তব্য হলো এই যে, যদি যুদ্ধ লেগেই যায় তাহলেও সেটা আগষ্ট মাসের আগে না। তবে এখানেও যেটা বড় ফ্যাক্টর সেটা হলো দুই দেশের এই যুদ্ধ পরিস্থিতিতে আমেরিকা ঠিক কোন স্থানে অবস্থান করছে। আর ঠিক এই বিবেচনার ওপরই নির্ভর করছে যুদ্ধ আদতেই কি লাগবে কি না? যদি লাগে তাহলে কোন ধরনের যুদ্ধ? সর্বাত্মক যুদ্ধ? নাকি লিমিটেড ওয়ার? এ ব্যাপারে কয়েকটি বিষয় বিবেচনায় আনতে হবে। এগুলো হলো ঃ

১. মার্কিন সৈন্য এখন সরাসরি পাকিস্তানের মাটিতে অবস্থান করছে। পাকিস্তানের ৪টি সামরিক ঘাঁটিতে এখন রয়েছে মার্কিনী নিয়ন্ত্রণ। আরো খবর বেরিয়েছে যে, ভারতীয় বোমা ও গোলার আঘাত থেকে মার্কিন সৈন্যরা রক্ষা পাবে না। সুতরাং যে যুদ্ধে মার্কিন সৈন্যরা রক্ষা পাবে না। সুতরাং যে যুদ্ধে মার্কিন সৈন্যদের জীবননাশের আশঙ্কা আছে তেমন যুদ্ধ ভারতীয়রা শুরু করবে কি না?

২. পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মধ্যে রয়েছে ২৮০০ কিলোমিটারের এক সুদীর্ঘ সীমান্ত। সীমান্তের পাকিস্তান অংশে রয়েছে বেলুচিস্তান এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ। সীমান্তের অপর অংশে রয়েছে অন্তত ১০টি আফগান প্রদেশ। এই আফগান প্রদেশসমূহের মধ্যে রয়েছে নিমরুজ, হেলমন্দ, কান্দাহার, পাকতিয়া, নাঙ্গারহার প্রভৃতি। এসব প্রদেশের অধিবাসী হলেন পশতুন। তাদের অধিকাংশই পশতু ভাষায় কথা বলেন। এদের প্রায় সকলেই সুন্নী মুসলমান। আফগানিস্তানের এই ১০টি প্রদেশের মানুষের সাথে পাকিস্তানী বালুচ এবং পাঠানদের মধ্যে রয়েছে বহু বিষয়ে অভিন্নতা।

এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, উভয় দেশের মানুষই পাঠান। তাদের বেশির ভাগই পশতুতে কথা বলেন। তাদের মধ্যে রয়েছে গভীর ধর্মীয় বন্ধন। তালিবানদের প্রায় সকলেই নৃতাত্ত্বিকভাবে পাঠান। তালিবান সরকারের প্রধান মোল্লা ওমরও একজন পাঠান। গত অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে আফগানিস্তানে মার্কিন হামলার সময় পাকিস্তান ও

www.pathagar.com

আফগানিস্তানের অংশবিশেষ সফর করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। তখন আমি দেখেছি পাকিস্তানের সীমান্ত প্রদেশ এবং বেলুচিস্তানের অধিবাসীদের সাথে আফগানিস্তানের ঐ ১০টি প্রদেশের অধিবাসী বিশেষ করে পশতুনদের কি অদ্ভুত মিল। আমি কোয়েটা এবং পেশাওয়ারে হাজার হাজার নারী-পুরুষ দেখেছি। আমি আরো দেখেছি পেশাওয়ারে যুদ্ধাহত তালিবান যোদ্ধাদের চিকিৎসার জন্য তাৎক্ষণিকভাবে প্রতিষ্ঠিত অসংখ্য চিকিৎসা কেন্দ্র। ঐ ধরনের কয়েকটি চিকিৎসা কেন্দ্রে যেয়ে আমি আহত ব্যাক্তিদের সাথে কথা বলেছি। আমি চমন এবং পেশাওয়ারের তোরখাম সীমান্তে দেখেছি, সীমান্তের উভয় পারে উভয় দেশের নাগরিকদের কি অবাধ চলাচল। সেদিন বেলুচিস্তান এবং সীমান্ত প্রদেশের বিস্তীর্ণ সীমান্ত অঞ্চল সফর করে কান্দাহারের স্পীনবোল্ডাক এবং নাঙ্গারহারের জালালাবাদ ঘুরে আমার স্থির বিশ্বাস জন্মেছিলো যে সীমান্ত যদি খোলা থাকে তাহলে আমেরিকা তালিবানদের কোনোদিন দমাতে পারবে না। কারণ তালিবানদের রয়েছে অবিশ্বাস্য জনসমর্থন। তারা সীমান্তের উভয় পারে বসবাসরত আড়াই কোটি পাঠান ও বালুচ জনসমর্থনে বলীয়ান হয়ে তাদের ইসলামী বিপ্লব চালিয়ে যাবে। ইসলামের বিপ্লবী শাসন প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে নিমরুজ, হেলমন্দ, কান্দাহার, জাবুল, পাখতিয়া, পাকতিকা, নাঙ্গারহার, গজনী, কোনারা, বাদাখশান, বেলুচিস্তান এবং সীমান্ত প্রদেশের মানুষ আজ একাকার হয়ে গেছেন। এই অমোঘ সত্যটি বুজতে আমেরিকা ভুল করেনি। তাই মার্কিনীদের ইচ্ছায় জেনারেল পারভেজ মোশাররফ পাক-আফগান সীমান্তে ৫০ হাজার পাকিস্তানী সৈন্য মোতায়েন করেছেন। এই অর্ধ লক্ষাধিক পাকিস্তানী সৈন্য তালিবানদের সীমান্ত অতিক্রম করে পাকিস্তানে প্রবেশে বাধা দেবে। যেহেতু পাকিস্তানী সৈন্যরা এই সীমান্তের এপার এবং ওপারের মাটি ও মানুষ সম্পর্কে ভালোভাবে ওয়াকেফহাল তাই তারা কার্যকরভাবেই তালিবানদের ঠেকিয়ে রাখছেন। এখন যদি ইন্ডিয়া পাকিস্তান আক্রমণ করে তাহলে দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য পাকিস্তানকে আফগান সীমান্ত থেকে ঐ ৫০ হাজার সৈন্য উঠিয়ে নিয়ে ভারত সীমান্তে মোতায়েন করতে হবে। আর সেটা ঘটলে তালিবানরা ঝাঁকের কৈ এর মতো হাজারে হাজারে পাকিস্তানে ঢুকবে। অনুরূপভাবে পাকিস্তান থেকেও হাজার হাজার সশস্ত্র উপজাতীয় যোদ্ধা তালিবানদের সমর্থনে কাবুল কান্দাহারে অভিযান চালাবে। সেক্ষেত্রে শত শত কোটি ডলার ব্যয় করে আমেরিকা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের মত প্রস্তুতি নিয়ে যেভাবে আফগানিস্তান জয় করেছে সেই বিজয় ধূলিস্মাৎ হয়ে যাবে। আমার ব্যাক্তিগত মতে, সম্ভাব্য পাক-ভারত যুদ্ধে মার্কিনীদের জন্য সবচেয়ে বড় মাথাব্যথার কারণ হবে এই বিষয়টি।

৩. বিগত ৪/৫ বছরে আমেরিকা এবং ইংল্যান্ড পাকিস্তানের প্রতি যে অন্যায় আচরণ করেছে সেটি রীতিমত শত্রুতার পর্যায়ে পড়ে। পাকিস্তানের চিরশত্রু ভারতের পক্ষ নিয়ে আমেরিকা পাকিস্তানের জাতীয় স্বার্থবিরোধী অনেক কাজ করেছে। এসব কারণে পাকিস্তানের ১৪ কোটি মানুষ, যারা এক সময়ে আমেরিকার প্রতি বন্ধু ভাবাপন্ন ছিলো, তারা আজ বৈরী ভাবাপন্ন হয়েছে। যতই দিন যাচ্ছে ততই মার্কিন ও পশ্চিমা বিরোধী মনোভাব পাকিস্তানে তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। তারই বহিঃপ্রকাশ দেখা যায় মার্কিন সাংবাদিক ড্যানিয়েল পার্লের হত্যাকাণ্ডে। তারই বহিঃপ্রকাশ দেখা যায় খ্রীস্টান গির্জায়

www.pathagar.com

বোমা বিস্ফোরণে, তারই বহিঃপ্রকাশ দেখা যায় ফরাসী সাবমেরিন কর্মীদের হত্যাকাণ্ডে। এসব কোনো হত্যাকাণ্ডই সমর্থনযোগ্য নয়। কিন্তু তারপরেও কথা থেকে যায়। যেভাবে পাকিস্তানে ইসলামী রাজনৈতিক কর্মীদের ওপর জুলুমের স্টীমরোলার চালানো হচ্ছে, যেভাবে কাশ্মীরের মুক্তিযোদ্ধাদের জেলে নিক্ষেপ করা হচ্ছে অথবা তাদের পদে পদে বাধা সৃষ্টি করা হচ্ছে তার ফলে যদি পাক-ভারত যুদ্ধ বেধেই যায় তাহলে মার্কিনবিরোধী মনোভাব একেবারে শেষ সীমায় পৌঁছবে। আর সেই যুদ্ধে যদি পাকিস্তানের বিপর্যয় ঘটে তাহলে পাকিস্তানী জনগণ এবং কাশ্মীরী মুক্তিযোদ্ধাদের সমস্ত আক্রোশ গিয়ে পড়বে মার্কিনীদের ওপর। সে আক্রোশের পরিণতিতে যে কি ভয়াবহ ঘটনা ঘটবে সেটা কল্পনা করতেও গা শিউরে উঠে। এই সহজ সত্যটি আমরা যত সহজে বুঝতে পারি, মার্কিনীরা ততো সহজে বুঝতে পারে না, সেটা ভাবা ঠিক হবে না।

মার্কিনীদের উভয় সংকট

সারা দুনিয়া জুড়ে মার্কিনীরা সন্ত্রাস দমন বলে যে প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে সেটা আসলে বিভিন্ন দেশে মুসলিম জাতিসত্তার অভ্যুদয় এবং মুসলিম জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে মুসলমানদের রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা সংগ্রাম। মুসলমানদের রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা সংগ্রাম আজ ওদের চোখে ইসলামী জঙ্গীবাদ। আফগানিস্তানে মার্কিনীরা জবরদস্তির সাথে তালিবানদের পদানত করেছে। একটি বিপ্লবকে তারা পাশবিক শক্তি দিয়ে হত্যা করেছে। ফিলিস্তিনের মুক্তির সংগ্রামেও ফিলিস্তিনী স্বাধীনতাকামীদেরকে সন্ত্রাসী বলে তাদেরকে নির্বিচারে হত্যা করা হচ্ছে। আমেরিকা চায় কাশ্মীরের মুক্তিযোদ্ধাদেরকেও সন্ত্রাসের অপবাদ দিয়ে হত্যা করা হোক। ভারতের দখলদার সেনাবাহিনী সেই অপকর্মই করছে এবং আমেরিকা সেই হত্যাকাণ্ডে মদদ দিয়ে যাচ্ছে। সুতরাং আমেরিকা চায়, কাশ্মীরের মুক্তিযোদ্ধারা নির্মূল হয়ে যাক এবং কাশ্মীরের মুক্তির আওয়াজ স্তব্ধ হয়ে যাক। জেনারেল পারভেজ মোশাররফ পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি এবং কাশ্মীরনীতিতে যা করছেন তার ফলে ভারত মার্কিন পার্পাস সার্ভ করা হচ্ছে। সুতরাং এই দৃষ্টিকোণ থেকে ভারতীয় হামলাকে আমেরিকা সমর্থন করে। তারাও চায় কাশ্মীরের মুক্তিযোদ্ধাদেরকে বেধড়ক পিটুনি দেয়া হোক। কিন্তু যদি হিতে বিপরীত হয়? তাহলে?

পাকিস্তানের বিপর্যয় মোশাররফ উৎখাত

যদি যুদ্ধ লাগে এবং সেই যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধারা নির্মূল হন তাহলে মোশাররফের ভাগ্যে কি ঘটবে? এখানে একটি কথা স্পষ্ট বলে রাখা দরকার। কাশ্মীরী মুক্তিযোদ্ধা, তারা ভারতের দখলীকৃত কাশ্মীরে অবস্থান করুন অথবা আজাদ কাশ্মীরেই অবস্থান করুন না কেন, সর্বত্রই তাদের পেছনে রয়েছে বিশাল জনসমর্থন। পাকিস্তানের ১৪ কোটি মানুষ ও কাশ্মীরী মুক্তিযোদ্ধাদেরকে পরমাত্মীয় বলে মনে করেন। যারা জনগণের মাঝে মিলেমিশে থাকেন তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করা এত সহজ নয়। তখনই তাদেরকে নির্মূল করা যাবে যখন বৃহত্তর জনগোষ্ঠী পদানত হবেন। ভারতের অকুপাইড কাশ্মীরে দখলদার বাহিনী যদি শ্বেতসন্ত্রাস চালায় তাহলে মুক্তিযোদ্ধারা আজাদ কাশ্মীরে চলে আসবে। যদি আজাদ কাশ্মীর পদানত হয় তাহলে তারা মূল পাকিস্তানে চলে আসবে। আর যদি মূল পাকিস্তানের অংশবিশেষ পদানত হয় তাহলে? সম্ভবত তার আর পর নাই। নাই কোনো ঠিকানা। একটি

www.pathagar.com

কথা মনে রাখা দরকার। ১৯৭১ সালের যুদ্ধে পাক বাহিনীর পরাজয়ের ফলে সামরিক শাসক জেনারেল ইয়াহিয়া খানকে জিল্লতীর সাথে বিদায় নিতে হয়েছিলো। আর আগামী যুদ্ধে যদি পাকিস্তানের বিপর্যয় ঘটে তাহলে জেনারেল মোশাররফ শুধু গদিই হারাবেন না, ৬ লক্ষ সৈন্যবিশিষ্ট পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী ১৪ কোটি পাকিস্তানীর কাছে অপমানিত এবং ধিকৃত হবেন। এই বিষয়টি এখন পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট মোশাররফ ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন নন। সাদ্দামের অসীম সাহসিকতা এবং ইস্পাতকঠিন মনোবল মোশাররফের নাই। সাদ্দাম হোসেন মচকাতে পারেন কিন্তু ভেঙে পড়েন না। '৯০-'৯১ এর ইঙ্গো-মার্কিন হামলায় ইরাক পর্যুদস্ত হয়েছে। লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা গেছেন। তারপরেও সাদ্দাম হোসেন পশ্চিমাদের কাছে মাথা নত করেননি। সাদ্দাম সম্পর্কে ইংরেজি ভাষায় বলা যায়– Hard nut to crack. কিন্তু জেনারেল মোশাররফ ১১ সেপ্টেম্বরের পর আমেরিকার এক ধমকেই কুপোকাত। ভারত যদি হামলা করে এবং সেই হামলায় পাকিস্তান যদি পর্যুদস্ত হয় তাহলে জেনারেল মোশাররফ শুধুমাত্র গতিচ্যুতই হবেন না, তিনি গ্রেফতার ও বন্দী হবেন এবং তার বিচার করা হবে। আমেরিকা যেখানে জেনারেল মোশাররফের মতো একজন পোষ্যপুত্র পেয়েছে সেখানে পরিস্থিতিকে তারা এতদূর গড়াতে দেবে না, যেখানে জেনারেল পারভেজ মোশাররফ ক্ষমতা থেকে উৎখাত হয়ে যান। সেজন্যই আগামী ৬ জুন মার্কিন উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিঃ রিচার্ড আর্মিটেজ পাকিস্তান ও ভারতে ছুটে আসছেন। তার পরপরই আসবেন জর্জ বুশের অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন ব্যক্তি প্রতিরক্ষামন্ত্রী ডোনাল্ড রামসফেল্ড। সুতরাং এই মুহূর্তে এইটুকু বলা যায় যে জুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত ভারত হামলা শুরু করছে না। তারপর কি হবে? পরেরটা পরে।

ভারত হামলার জন্য মুখিয়ে আছে কেন?

একথা বিস্তারিতভাবে বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন নাই যে, ভারত পাকিস্তানের ওপর সামরিক আক্রমণ চালানোর জন্য এক পায়ে খাড়া হয়ে আছে। যে কোনো ছুতানাতায় তারা পাকিস্তানের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়। কিন্তু বাধ সাধছে আমেরিকা। তৎসত্ত্বেও তারা সুযোগের অপেক্ষায় ওৎ পেতে বসে আছে। সেজন্যই তারা ৬ মাস হয়ে গেছে, সেই সৈন্য প্রত্যাহারের কোনো লক্ষণ নেই। অর্থাৎ ভারত মনে করছে যে, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অভিযান করার এখনই সময়। এখন যুদ্ধ লাগালে পাকিস্তানকে পরাস্ত করা সম্ভব। যুদ্ধ লাগলে কে হারবে কে জিতবে সে সম্পর্কে নির্ভুলভাবে বলা কিছু সম্ভব নয়।

ভারত ও পাকিস্তানের সামরিক শক্তি সম্পর্কে সর্বশেষ তথ্যাবলী অন্তর্ভুক্ত করা হলো। আসন্ন যুদ্ধে ভারতের অনুকূল ফ্যাক্টরসমূহ নিম্নরূপ ঃ

১। প্রাপ্ত তথ্য মোতাবেক প্রচলিত অস্ত্র ও পারমাণবিক অস্ত্র উভয়দিক দিয়েই ভারত পাকিস্তানের চেয়ে অধিক শক্তিশালী।

২। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং বর্তমান রাশিয়ার সাথে ভারতের ঘনিষ্ঠ মৈত্রী সুদীর্ঘ ৫০ বছরের সময়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। এখন পর্যন্ত সেই সম্পর্কে বিন্দুমাত্র চিড় ধরে নাই। গত ৫ বছর হলো আমেরিকাও ভারতকে মিত্র হিসেবে পাওয়ার জন্য উদগ্রীব। ভারতও আমেরিকার বন্ধুত্বের প্রসারিত হাত শক্ত করে ধরেছে। বিনিময়ে তাকে কিছু দিতে হচ্ছে না।

www.pathagar.com

৩। গণচীন পাকিস্তানের মিত্র হিসেবে এতদিন পরিচিত ছিলো। কিন্তু গত ২ বছর হলো তারাও পাকিস্তানের কাছ থেকে কিছুটা দূরে সরে এসেছে এবং ভারতের দিকে কিছুটা ঝুঁকে পড়েছে।

৪। গুজরাটে মুসলমানদেরকে বলীর পাঁঠার মতো নির্বিচারে জবাই করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ৩ হাজার মুসলমানের খুনে বিজেপির হিন্দুরা তাদের হাত রঞ্জিত করেছে। কিন্তু তারপরেও মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ নির্বিকার। ওআইসি নামক মুসলমানদের একটি সংস্থা রয়েছে। তারাও গুজরাট তথা বিশ্বব্যাপী মুসলিম নিধনের বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবাদ করেনি। সুতরাং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পাকিস্তান, একদিকে বলতে গেলে পরিত্যক্ত। অন্যদিকে ভারত অত্যন্ত সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে।

৫। টুইন টাওয়ার ধ্বংসের পর আমেরিকা সন্ত্রাস বিরোধী অভিযানের নামে যেভাবে আফগানিস্তানসহ পররাজ্য গ্রাস করছে, তার ফলে বিশ্বের দুর্বল রাষ্ট্রগুলোর স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্বের সংজ্ঞাই পাল্টে গেছে। সেই সাথে পাল্টে গেছে মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা যুদ্ধের সংগ্রাম। লন্ডনের একজন বয়োবৃদ্ধ বাংলাদেশী সাংবাদিক এবং ঢাকার আরেকজন বয়োবৃদ্ধ সাংবাদিক তাদের লেখায় একটি অকপট স্বীকারোক্তি দিয়েছেন। তারা বলেছেন যে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ যদি ১৯৭১ সালে না হয়ে ২০০১ কি ২০০২ সালে হতো, যদি মুক্তিযোদ্ধারা ভারত থেকে এসে বাংলাদেশে গেরিলা অপারেশন '৭১ সালে না করে ২০০১ সালে বা ২০০২ সালে করতেন তাহলে তারাও আজ আমেরিকা বা পশ্চিমা শক্তি কর্তৃক 'সন্ত্রাসী' বলে চিহ্নিত হতেন। স্বাভাবিকভাবেই ইয়াহিয়া খানের সেদিনের যুদ্ধ আজ সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বলে আমেরিকা, ইসরাইল, ইংল্যান্ড প্রভৃতি দেশ কর্তৃক বিবেচিত হতো।

আমেরিকা আজ সন্ত্রাসের যে নতুন সংজ্ঞা দিয়েছে তার ফলে সমস্ত মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা যুদ্ধ আজ 'সন্ত্রাসী হামলা' এবং মুক্তিযোদ্ধা ও গেরিলারা আজ 'সন্ত্রাসী' বলে চিহ্নিত হচ্ছেন। গুয়েভারা, ফিডেল কাস্ট্রো, মাও সেতুং যদি ২০০২ সালে তাদের সংগ্রাম চালাতেন তাহলে ঐ তিন মহান নেতাই আজ ওসামা বিন লাদেনের মতো বিশ্ব সন্ত্রাসী হিসেবে চিহ্নিত হতেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, আমেরিকা তথা পশ্চিমা দুনিয়ার এই 'জোর যার মুল্লুক তার' নীতি অনেকে অবনত মস্তকে মেনে নিয়েছেন। ফলে এই সুযোগটিরই সদ্ব্যবহার করছে ভারত।

৬। ১৯৯৯ সালের কারগিল যুদ্ধে ভারতের বিজয় হয়নি। তৎসত্ত্বেও ভারতের প্রচার মাধ্যম ঐ যুদ্ধের ফলাফলকে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের বিরাট বিজয় হিসেবে চিহ্নিত করে। '৭১ সালে ভারতের প্রকৃত বিজয় এবং '৯৯ সালে কল্পিত বিজয় ভারতীয় জনগণকে উগ্র জাত্যাভিমানী (Great Nation chauvinism) করে তুলেছে। সুতরাং তারা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে তাদের চিন্তাধারা অনুযায়ী ফাইনাল রাউন্ড চাচ্ছে।

৭। ভারতের প্রদেশগুলোর সাম্প্রতিক নির্বাচনে বিজেপি প্রতিটি প্রদেশে পরাজিত হয়েছে। উত্তর প্রদেশের মতো সবচেয়ে জনবহুল প্রদেশে বিজেপি প্রথম স্থান থেকে তৃতীয় স্থানে নেমে এসেছে। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সমীক্ষকগণের একবাক্যে রায়

www.pathagar.com

দিচ্ছেন যে, ভারতীয় পার্লামেন্টের আগামী নির্বাচনে বিজেপির ভরাডুবি হবে। সুতরাং বিজেপি ক্ষমতার রাজনীতির জন্য ব্যবহার করছে কাশ্মীরের ট্রাম্পকার্ড। কারগিল যুদ্ধে তুরুপের ঐ তাসটি খেলেই তারা ইলেকশনে বাজিমাত করেছে। এবারেও তারা সেই তাসটি ব্যবহার করতে চাচ্ছে।

৮। আগামী সেপ্টেম্বর মাসে কাশ্মীরে নির্বাচন। ভারত চায় বিশ্ব সম্প্রদায়কে একটি স্বাভাবিক চিত্র দেখাতে। সেই চিত্রে থাকবে কাশ্মীরে স্বাভাবিক অবস্থা। জনগণ ভোট দিচ্ছে এবং ভারতীয় এজেন্ট ফারুক আবদুল্লাহকে জয়ী করছে। যদি যুদ্ধ করে পাকিস্তানকে কাবু করা যায় তাহলে ভারত সবকিছু স্বাভাবিক দেখাতে পারবে। সুতরাং ভারত যুদ্ধের জন্য মুখিয়ে আছে।

পাকিস্তানের অনুকুল ফ্যাক্টরসমূহ

১। ১৩ ডিসেম্বর ভারতীয় লোকসভায় গোলাগুলির ঘটনার পর ভারত সাড়ে ৭ লাখ সৈন্য মোতায়েন করেছে। মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে তারা পাশবিক হামলা চালাচ্ছে। কিন্তু তারপরেও মুক্তিযোদ্ধারা এতটুকু দমেনি। তারা হামলা চালিয়েই যাচ্ছে। তাদের স্পিরিট এতটুকু কমেনি।

২। এখন সারা দুনিয়া জেনে গেছে যে, এই যুদ্ধ ভারত জোর করে পাকিস্তানের ওপর চাপিয়ে দিচ্ছে। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল মোশাররফ সেই যুদ্ধ পরিহার করার জন্য অথবা ভারতকে আক্রমণ থেকে নিবৃত্ত করার জন্য বিশ্ব নেতৃবৃন্দের কাছে ধর্ণা দিচ্ছে। এরপরেও যদি যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়া হয় তাহলে নিজেদের আজাদী ও সার্বভৌমত্বের জন্য পাকিস্তানের ১৪ কোটি লোক শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে লড়বে। ভারতের জন্য এটা আগ্রাসন আর পাকিস্তানের জন্য এটা বাঁচা মরার লড়াই। এদিক দিয়ে পাকিস্তানের প্রতিরোধ হবে তীব্র।

৩। সামরিক বিশারদের মতে, আফগানিস্তানের মতই কাশ্মীর পর্বতসংকুল চড়াই উৎরাইয়ে পূর্ণ এক দুর্গম অঞ্চল। কাশ্মীরের ভূগোল হানাদারদের বিরুদ্ধে এবং আত্মরক্ষাকারী বা ডিফেনডারদের পক্ষে।

৪। আজাদ কাশ্মীরের শতকরা একশত ভাগ এবং ভারতের জবর দখলকৃত কাশ্মীরের (জম্মুবাদে) শতকরা ৯৮ শতাংশ মানুষ ভারতের গোলামীর জিঞ্জির ছিন্ন করতে চান। সুতরাং যুদ্ধ শুরুর সাথে সাথে ভারত এক বৈরী ভূখণ্ড এবং প্রায় ১ কোটি বৈরী জনতার মোকাবিলা করবে। পাকিস্তানের নিয়মিত সেনাবাহিনী ছাড়াও উপজাতীয় এবং ইসলামী বিপ্লবীরা হানাদার ভারতীয়দের ওপর গেরিলা হামলা চালাবে।

৫। যদি ভারত সত্যি হামলা করে তাহলে পাক-আফগান সীমান্তে মোতায়েন পাকিস্তানের ৫০ হাজার নিয়মিত সৈন্য আফগান সীমান্ত থেকে ভারত সীমান্তে মোতায়েন হবে। এর ফলে সীমান্ত খুলে যাবে এবং আফগানিস্তানের হাজার হাজার তালিবান যোদ্ধা এবং সোভিয়েত যুদ্ধ ফেরত মুজাহিদরা ভারতীয়দের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরবে।

www.pathagar.com

৬। সাড়ে ৭ লাখ সৈন্য মোতায়েনের পরেও কাশ্মীরী মুজাহিদদের জোশ বিন্দুমাত্র কমেনি। এখন তারা আর বেসামরিক টার্গেট নয় রীতিমত ভারতীয় হানাদার বাহিনীকে টার্গেট করছে এবং সম্ভব হলে তাদেরকে হত্যা করছে।

৭। ভারত যতই গরম বোলচাল ছাড়ুক না কেন ভারত আমেরিকা নয়, আর পাকিস্তানও আফগানিস্তান নয়। অনুরূপভাবে ভারত ইসরাইল নয় এবং পাকিস্তান ফিলিস্তিন নয়। এখানে কোনো একতরফা যুদ্ধ হবে না এবং ভারত ওয়াকওভারও পাবে না।

শেষ সংবাদ ঃ যুদ্ধের পদধ্বনি

ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সৃষ্ট উত্তেজনার পারদ ক্ষণে ক্ষণে ওঠানামা করছে। ভারতের উগ্রবাদী নীতি উপমহাদেশকে যুদ্ধের গিরিখাদে নিয়ে যাচ্ছে। আবার আমেরিকা ছুটে এসে হস্তক্ষেপ করলে উত্তেজনার পারদ কিছুটা নেমে যাচ্ছে। আমেরিকার দীর্ঘ মেয়াদী এশীয় এবং ভূমণ্ডলীয় প্রভুত্বের লক্ষ্যকে সামনে রেখে তারা দারুণভাবে ভারতের দিকে ঝুঁকে পড়ছিলো। ফলে ভারত আস্কারা পেয়ে পাকিস্তানের ওপর হামলে পড়তে যাচ্ছিলো। এমন পরিস্থিতিতে পাকিস্তানের জন্য জান বাঁচানো ফরয হয়ে দাড়িয়েছে। গত ৩১ মে বিবিসি এবং ভয়েস অব আমেরিকার খবরে প্রকাশ, মার্কিন প্রেসিডেন্ট বুশ পাকিস্তানকে বলেছেন যে, প্রেসিডেন্ট পারভেজ মোশাররফকে তার কথা রাখতেই হবে। গত ১২ জানুয়ারি জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে প্রেসিডেন্ট মোশাররফ বলেছিলেন যে, নিয়ন্ত্রণ রেখা দিয়ে অনুপ্রবেশ বন্ধ করবেন। কিন্তু আমেরিকা যেভাবে কাশ্মীরী মুক্তিযোদ্ধাদের ওপর জুলুম ও দমনের স্টীম রোলার চালাতে বলছে সেটা করলে পাকিস্তানের ৫৩ বছরের কাশ্মীর নীতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে। সেটি করলে পাকিস্তানের জনগণ এবং সেনাবাহিনীতে বিদ্রোহ হবে। সুতরাং জেনারেল মোশাররফ এই সর্বপ্রথম মার্কিনীদের ইচ্ছা পরিপূর্ণভাবে পূরণ করতে পারেননি। বরং ভারতের যুদ্ধংদেহী আচরণ দেখে পাকিস্তান আফগান বর্ডারে মোতায়েন ৫০ হাজার সৈনিকের মধ্যে বেশ কয়েক হাজার সৈন্য উঠিয়ে এনেছেন। তারপর তাদেরকে কাশ্মীর সীমান্তে মোতায়েন করেছেন। এর ফলে দারুন বিচলিত হয়েছে আমেরিকা। মার্কিন উপ পররাষ্ট্রমন্ত্রী রিচার্ড আর্মিটেজ ভারত ও পাকিস্তানে আসছেন ৬ এবং ৭ জুন। তার পরপরই প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রামস ফেল্ডকে পাঠাচ্ছেন প্রেসিডেন্ট বুশ। পাকিস্তানী জনমত এবং সেনাবাহিনীর চাপে অগ্রবর্তী ঘাটিতে গিয়ে জেনারেল মোশাররফ ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছেন যে, ভারত হামলা করলে সেই যুদ্ধকে ভারতের মাটিতে ছড়িয়ে দেয়া হবে। এর মধ্যে বৃটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী জ্যাক স্ট্র এবং জাপানী উপ পররাষ্ট্রমন্ত্রী সিক্যান সুরিকা ২৮ তারিখ থেকে ৩১ তারিখের মধ্যে দুই দেশ সফর করেছেন। রাশিয়ার উপ পররাষ্ট্রমন্ত্রী আনাতলী সাকুনভ ২৭ থেকে ২৯ মে পাকিস্তান সফর করে গেছেন। গত বুধবার কাজাখাস্তানে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ী ও প্রেসিডেন্ট মোশাররফের মধ্যে একটি মধ্যস্থতার চেষ্টা চালাবার কথা।

এর আগেই ইসলামাবাদ এবং নয়াদিল্লী থেকে জাতিসংঘ, আমেরিকা, ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্সের কূটনীতিকদের একাংশ স্বদেশ ফিরে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। ঐদিকে আমেরিকা

www.pathagar.com

ও ইংল্যান্ড ভারতে কর্মরত ৬০ হাজার মার্কিনী ও ৩০ হাজার বৃটিশকে ভারত ছেড়ে যেতে বলেছে। এসব অত্যন্ত অশুভ ইঙ্গিত। পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনীর মুখপাত্র জেনারেল রশিদ কোরেশী স্বীকার করেছেন যে, আফগান সীমান্ত থেকে পাক সেনাবাহিনীর একটি অংশকে উঠিয়ে আনা হয়েছে। এসব ঘটনাবলীর প্রেক্ষিতে কয়েকদিন আগে যুদ্ধের যে কালো মেঘ কাটতে শুরু করেছে। এ প্রেক্ষিতে প্রতিরক্ষা বিশ্লেষকগণ বলছেন যে, ভারত প্রথমে পাঞ্জাব বা সিন্ধু সীমান্তে হামলা চালাবে না। তার বদলে নিয়ন্ত্রণ রেখা অতিক্রম করে আজাদ কাশ্মীরে ঢুকে পড়বে। সেখানকার একটি অংশ দখল করে তারা পাকিস্তানের সাথে দর কষাকষি করবে। এমন একটি পরিস্থিতির যদি উদ্ভব ঘটে তখন প্রবল জনমতের চাপে পাকিস্তান ভারতের অভ্যন্তরে আঘাত হানতে বাধ্য হবে। ভারত এক্ষেত্রে ইসরাইলী প্রধানমন্ত্রী এরিয়েল শ্যারনের স্টাইলে কাশ্মীরের একটি অংশকে জেনিন বা নাবলুস বলে মনে করলে ভুল করবেন। এমন একটি পর্যায়ে এসে উপমহাদেশের পরিস্থিতি ভয়ংকর হয়ে উঠতে পারে।

পারমাণবিক হামলার আশঙ্কা

জেনারেল পারভেজ মোশাররফ আফগান যুদ্ধের শুরু থেকে আমেরিকার তাবেদারি করতে শুরু করেছিলেন। তারপর ইসলামী কর্মীদের ওপর দমননীতি এবং কাশ্মীরী মুক্তিযোদ্ধাদের ধরপাকড়ের ফলে তার জনপ্রিয়তা শূন্যের কোঠায় নেমে এসেছে। সামরিক বাহিনীতেও তার অবস্থান আগের মতো সংহত নয়। যদি ভারত আজাদ কাশ্মীরে ঢুকতে পারে এবং কয়েকদিন দখল করে থাকতে পারে তাহলে পাকিস্তানের স্বাধীনতা এবং জেনারেল মোশাররফের ব্যক্তিগত অস্তিত্বের তাগিদে তাকে এ্যাটম বোমা নিয়ে হামলা করতে হতে পারে। এই হলো মোটামুটি পাক-ভারত যুদ্ধ পরিস্থিতির সর্বশেষ অবস্থা। তবে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে আফগান বর্ডার থেকে পাকিস্তানের অর্ধলক্ষ সৈন্যের সকলকেই মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য মোতায়েন করতে হবে। যদি তাই হয় তাহলে গোপন আস্তানা থেকে হাজার হাজার যোদ্ধা আফগানিস্তানে মার্কিনীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। সুতরাং সময় থাকতেই যুদ্ধপ্রতিহত করতে আমেরিকা সর্বশক্তি নিয়োগ করবে, সেটাই একমাত্র ভরসা।

ভারত পাকিস্তান সামরিক ব্যয়

ভারত ঃ ১৯৯৮ সালে ভারতের প্রতিরক্ষা বাজেট ছিল ১০ মিলিয়ন ডলার। '৯৯ সালে বেড়ে দাঁড়ায় ১০ দশমিক ৭ বিলিয়ন ডলার। আর ২০০১ সালে প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৩ দশমিক ৯৪ বিলিয়ন ডলার।

পাকিস্তান ঃ অপরদিকে '৯৮ সালে পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা ব্যয় ছিল ৩ দশমিক ২ বিলিয়ন ডলার। '৯৯ সালে তা কমে দাঁড়ায় ২ দশমিক ৭ বিলিয়ন ডলার। আর ২০০১ সালে ব্যয় বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৩ দশমিক ৩ বিলিয়ন ডলার।

www.pathagar.com

পাক-ভারত সামরিক শক্তি

ভারত

(ক) সামরিক বাহিনী ঃ ১২ লক্ষ ৬৩ হাজার।(রিজার্ভ ৫ লক্ষ ৩৫ হাজার)।

(খ) সেনাবাহিনী ঃ ১১ লক্ষ।

(গ) নৌবাহিনী ঃ ৫৩ হাজার।

(ঘ) বিমানবাহিনী ঃ ১ লক্ষ ১০ হাজার।

(ঙ) ট্যাঙ্ক ঃ ৩ হাজার ৪১৪ (এর মধ্যে রয়েছে রুশ টি– ৫৫, টি-৭২ বৈজয়ন্তী এবং অর্জুন)

(চ) ক্ষেপণাস্ত্র ঃ অগ্নি, পৃথ্বি এবং নাগ (ট্যাঙ্ক বিধ্বংসী)।

(ছ) নৌবাহিনী ঃ (i) বিমানবাহী জাহাজ। একটির নাম বিরাট। আরেকটির নাম এডমিরাল গরশব। এটি এখনো ভারতে এসে পৌছেনি।

(ii) সাবমেরিন-১৬

(iii) ডেস্ট্রয়ার-৮

(iv) ফ্রিগেট-১১

(v) নৌ-জঙ্গী বিমান– জনবল ৫ হাজার, বিমান সংখ্যা ৬৭।

(vi) ক্ষেপণাস্ত্র সাগরিকা।

(জ) বিমান বাহিনী ঃ ১ লক্ষ ১০ হাজার।

(i) জঙ্গী বিমান ঃ ৭৩৮।

(ii) জঙ্গী হেলিকপ্টার ঃ ২২টি।

(ঝ) ক্ষেপণাস্ত্র ঃ ত্রিশূল।

(ঞ) প্যারামিলিটারী ঃ ১০ লক্ষ ৮৯ হাজার।

পাকিস্তান

(ক) সামরিক বাহিনী ঃ ৬ লক্ষ ২০ হাজার। (রিজার্ভ ৫ লক্ষ ১৩ হাজার)

(খ) সেনাবাহিনী ঃ ৫ লক্ষ ৫০ হাজার।

(গ) নৌবাহিনী ঃ ২৫ হাজার

(ঘ) বিমান বাহিনী ঃ ৪৫ হাজার।

(ঙ) ট্যাঙ্ক ঃ ২ হাজার ৩ শতটি (এর মধ্যে মার্কিন এম-৪৭, এম– ৪৮, টি- ৫৪/৫৫ চীনা, টি-৫৯, টি– ৬৯, টি ৮৫ এবং ইউক্রেনের টি-৮০)।

(চ) ক্ষেপণাস্ত্র ঃ (i) ঘোরী ও শাহীন এই মুহূর্তে সর্বোচ্চ পাল্লা আড়াই হাজার মাইল। প্রযুক্তিগত ভিত্তি উত্তর কোরিয়ার নডং-১

(ii) সমরাস্ত্র উৎপাদন (১) মিরাজ রিবিল্ড ফ্যাক্টরী, (২) মিগ রিবিল্ড ফ্যাক্টরী, (৩) ট্যাঙ্ক উৎপাদন কারখানা।

(iv) পারমাণবিক কর্মসূচী ঃ পারমাণবিক বিস্ফোরণের কথা সবাই জানেন।

www.pathagar.com

পাক-ভারত সামরিক শক্তি

(ছ) নৌবাহিনী ঃ (i) সাবমেরিন-১০
(ii) বিমানবাহী জাহাজ নাই।
(iii) ফ্রিগেট-৮
(vi) নৌবিমান-৫
(v)জঙ্গী, নৌ-হেলিকপ্টার-৯
(জ) বিমান বাহিনী ঃ (i) জঙ্গী বিমান-৩৫৩। এর মধ্যে রয়েছে মিরাজ-৩, মিরাজ-৫, মিরাজ-১১১০, কিউ-৫, জে-৬, এফ-৭ এবং এফ-১৬ (৩২টি)।

সামরিক শক্তিঃ বাংলাদেশ

(ক) সদস্য সংখ্যা ঃ ১ লক্ষ ৩৬ হাজার।
(খ) সেনাবাহিনী ঃ ১ লক্ষ ২০ হাজার।
(গ) নৌবাহিনী ঃ ১০ হাজার ৫০০
(ঘ) বিমান বাহিনী ঃ ৬ হাজার ৫০০
(ঙ) ট্যাঙ্ক ঃ (i) ১০০টি, টি ৫৯
(ii)১০০টি, টি- ৫৪/৫৫
(চ) নৌবাহিনী ঃ (i)সাবমেরিন নেই
(ii) ডেস্ট্রয়ার- নেই
(iii) ফ্রিগেট-৪টি
(vi) পেট্রোল ও উপকূলীয় ক্ষুদ্র রণতরী-৪১।
(ছ) বিমান বাহিনী ঃ (i) জঙ্গী বিমান-৮৩। এর মধ্যে ১৮টি চীনা এফ-৭
(ii) ৮টি রুশ মিগ-২৯।
(iii) জঙ্গী হেলিকপ্টার নেই।

পাক ভারত সামরিক শক্তি ঃ নতুন যুদ্ধাস্ত্র সংগ্রহ

ভারত

ভারতে অত্যাধুনিক অস্ত্র সংগ্রহের মূল উৎস এখনও রাশিয়া। ২০০১ সালের জুনে স্বাক্ষরিত প্রোটোকল অনুযায়ী আগামী এক দশকে রাশিয়া ভারতে ১ হাজার কোটি ডলারের অস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জাম সরবরাহ করবে। নতুন জঙ্গী বিমান নির্মাণ ও পরিবহন বিমানের উন্নয়ন সাধনে ভারত ও রাশিয়া যৌথভাবে কাজও করতে পারে। এ ব্যাপারে বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে বলা হচ্ছে, একটি এন্টিব্যালেস্টিক মিসাইল লিস্ট গড়ে তোলাই ভারতের লক্ষ্য। এ ক্ষেত্রে ভারত রুশ এস-৩০০ ভিএম সিস্টেমকে ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করতে পারে। ভারত ইসরাইলের কাছ থেকেও যুদ্ধ সাজ-সরঞ্জাম পেতে যাচ্ছে। গতবছর জুনে দুই সরকারের মধ্যে ১০ বিলিয়ন ডলারের একটি প্রোটোকল স্বাক্ষর হয়েছে। এর অধীনে আগামী দশকে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র পাবে ভারত। এ ছাড়াও ভারত রাশিয়ার নিকট থেকে ৩০০ টি ট্যাঙ্কের (টি-৯০) প্রথম চালান ইতোমধ্যেই পেয়ে গেছে।

www.pathagar.com

পাক ভারত সামরিক শক্তি ঃ নতুন যুদ্ধাস্ত্র সংগ্রহ

পাকিস্তান

ভারতে ক্রমবর্ধমান সমরসজ্জার প্রেক্ষাপটে পাকিস্তানও তার সেনাবাহিনীকে আধুনিক করে তোলার চেষ্টা করছে। এটা স্পষ্ট যে, পাকিস্তান বেশি নজর দেবে পারমাণবিক ও ক্ষেপণাস্ত্রের উন্নয়নে। এর ফলে পাকিস্তান সম্ভাব্য হুমকি মোকাবেলায় যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে উঠবে। পাকিস্তানের মূল অস্ত্র সরবরাহকারী দেশ চীন। তবে ভারতের তুলনায় পাকিস্তানের অস্ত্র সংগ্রহের হার যথেষ্ট কম।

অতিসম্প্রতি পাকিস্তান চীনের কাছ থেকে ৫০টি এফ– ৭ এমজি জঙ্গী বিমানের একটি চালান হাতে পেয়েছে। যৌথভাবে নতুন জঙ্গী বিমান নির্মাণেও উদ্যোগ নিয়েছে দেশ দুটি। পাকিস্তান ফ্রান্সের কাছ থেকেও কিছু অত্যাধুনিক অস্ত্র সংগ্রহ করেছে। ফ্রান্স পাকিস্তানকে ডিজেল ডুবো জাহাজও সরবরাহ করেছে। প্রথমটি সরবরাহ করা হয় ১৯৯৯ সালে। এ ছাড়া আরও দুটি করাচীতে নির্মাণ করা হচ্ছে ফরাসী লাইসেন্সে। পাকিস্তান গতবছর ৮টি উন্নতমানের মিরাজ– ৩ এবং মিরাজ– ৫ জঙ্গী বিমান ফ্রান্সের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছে। এর পাশাপাশি পাকিস্তান ইউক্রেনের কাছ থেকে বেশ কিছু ট্যাঙ্ক সংগ্রহ করেছে সেই সঙ্গে দেশে নির্মিত আল খালিদ ট্যাঙ্কগুলোকে কিভাবে আরও উন্নত করা যায়, তার সম্ভাবনাও খতিয়ে দেখছে পাকিস্তান। ফ্রান্স হতে পাকিস্তান একটি সাবমেরিনও সংগ্রহ করেছে। '৯৯ সালে করাচীতে এই সাবমেরিনটি কমিশনিং হয়।

পাক-ভারত ক্ষেপণাস্ত্র শক্তি

ভারত

(১) অগ্নি– ২ হাজার কিলোমিটার পাল্লা। (সেনাবাহিনী)।
(২) অগ্নি– ৪ হাজার কিলোমিটার পাল্লা নির্মাণাধীন (সেনাবাহিনী)।
(৩) পৃথ্বি– ২৫০ কিলোমিটার (সেনাবাহিনী)।
(৪) সাগরিকা– ৩ শত কিলোমিটার পাল্লা (নৌবাহিনী)।
(৫) আকাশ– বিমান বাহিনী।
(৬) ত্রিশূল– সেনাবাহিনী।
(৭) অস্ত্র– সেনাবাহিনী।
(৮) নাগ (ট্যাঙ্ক বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র)।

পাকিস্তান

ক্ষেপণাস্ত্র শক্তি অর্জনে পাকিস্তান বহু উন্নতি করেছে। সামরিক শক্তির যতগুলো দিক রয়েছে তার অধিকাংশ ক্ষেত্রে পাকিস্তান ভারতের চেয়ে পিছিয়ে থাকলেও এই ক্ষেপণাস্ত্র শক্তির দিক দিয়ে পাকিস্তান পিছিয়ে নেই। গত ২৫ মে থেকে ২৮ মে এই চারদিনের মধ্যে পাকিস্তান ধারাবাহিকভাবে পর পর তিনটি ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ ঘটায়। তিনটি বিস্ফোরণই অত্যন্ত সফল বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এসব মিসাইলের (ক্ষেপণাস্ত্র) আদি নাম রাখা 'ঘোরী', 'শাহীন, 'গজনবী' ও 'আবদালী'। গত ২৫ থেকে ২৮ মের মধ্যে শাহীন ছাড়া অপর তিনটি ক্ষেপণাস্ত্রের সফল পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে। পাকিস্তানের ক্ষেপণাস্ত্র শক্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

১। ঘোরী (হাতফ-৫) ঃ পাল্লা ২০০০ কিঃ মিঃ।
২। শাহীন (হাতফ-৪) ঃ পাল্লা ৭৫০ কিঃ মিঃ।
৩। গজনবী (হাতফ-৩) ঃ পাল্লা ২৯০ কিঃ মিঃ।
৪। আবদালী (হাতফ-১) ঃ পাল্লা ১৮০ কিঃ মিঃ।

www.pathagar.com

পাক-ভারত পারমাণবিক শক্তি

সামরিক শক্তি স্বাভাবিকভাবেই প্রতিটি রাষ্ট্রের জন্য একটি গোপনীয় ও স্পর্শকাতর বিষয়। আর পারমাণবিক শক্তিতো একেবারে টপ সিক্রেট বিষয়। এ ব্যাপারে বিগত সাড়ে ৪ বছর ধরে পাক-ভারতের পারমাণবিক শক্তি সম্পর্কে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রিপোর্ট বেরিয়েছে। দেখা যায় ঐ সব রিপোর্টে পাকিস্তানের পারমাণবিক বোমার সংখ্যা ১২ থেকে ৭২ পর্যন্ত দেখানো হয়েছে। পক্ষান্তরে ভারতের সংখ্যা ৫০ থেকে ২৫০ পর্যন্ত দেখানো হয়েছে। সুতরাং এসব রিপোর্টকে খুব নির্ভরযোগ্য বলে গ্রহণ করা যায় না। ২০০০ সালের ২৯ অক্টোবর ইসলামাবাদে পাকিস্তানের বর্তমান প্রেসিডেন্ট জেনারেল মোশাররফের সাথে আমার দেখা হয়েছিলো। তখন আমার সাথে অন্যান্যের মধ্যে একজন রুশ সাংবাদিকও ছিলেন। তিনি জেনারেল মোশাররফকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'মহামান্য প্রেসিডেন্ট, আপনাদের এ্যাটম বোমার সংখ্যা কত? উত্তরে স্মিত হাস্যে প্রেসিডেন্ট জবাব দেন, "অবশ্যই আমাদের পারমাণবিক বোমা রয়েছে। তবে সংখ্যা আমি বলব না। আপনিতো জানেন, ওটা গোপনীয়। সুতরাং এ বিষয় নিয়ে জল্পনা-কল্পনা করা উচিত নয়। তবে 'জেনস ডিফেন্স উইকলি' প্রতিরক্ষা সম্পর্কে একটি অত্যন্ত মর্যাদাশীল পত্রিকা। অনেক প্রতিরক্ষা বিশ্লেষক এই সাপ্তাহিকের তথ্যাবলীর ওপর আস্থা স্থাপন করেন। এই পত্রিকায় গত ৩০ মে সংখ্যায় পাক-ভারতের পারমাণবিক শক্তি সম্পর্কে একটি তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে। ঐ তথ্যে বলা হয়েছে যে, ভারতের রয়েছে ১৫০টি পারমাণবিক বোমা। পত্রিকাটির মতে, পাকিস্তানের বোমার সংখ্যা এর এক তৃতীয়াংশ। রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, ভারত তার আধুনিক জঙ্গী বিমানসমূহে ২০ কিলো টন পারমাণবিক বোমা বহন করতে পারে। এসব জঙ্গী বিমান হল মিগ, জাগুয়ার এবং মিরাজ। একই ওজনের বোমা ভারতের ক্ষেপণাস্ত্রও বহন করতে পারে। ক্ষেপণাস্ত্রগুলো হল 'অগ্নি' এবং 'পৃথ্বি'। এই ১৫০টি বোমা ছাড়াও ভারতের রয়েছে প্রচুর পরিমাণে পারমাণবিক বোমা উৎপাদনে সক্ষম ইউরেনিয়াম এবং প্লুটোনিয়াম। এই উপকরণ দিয়ে অতি দ্রুত বোমা বানানো সম্ভব।

রিপোর্টে বলা হয়, পাকিস্তানের রয়েছে ২৫ থেকে ৫০টি বোমা। এসব বোমা ২০ থেকে ২৫ কিলো টনের। মার্কিন এফ ১৬ অথবা চীনা জঙ্গী বিমান দিয়ে এসব অস্ত্র বহন করা সম্ভব। পাকিস্তানে 'ঘোরী' এবং 'শাহীন' ক্ষেপণাস্ত্রও এসব বোমা বহনে সক্ষম। বিশেষজ্ঞগণ হিসাব করছেন যে, ১০ থেকে ২০টি বোমা যদি নিক্ষেপ করা যায় তাহলে লাখ লাখ প্রাণহানি হবে এবং ভয়াবহ ধ্বংসসাধন হবে।

www.pathagar.com

পারমাণবিক যুদ্ধ ঃ ১ কোটি ২০ লাখ লোক মারা যেতে পারে

মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা বলেছে, পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যকার পারমাণবিক যুদ্ধের প্রথম দিনই এক কোটি ২০ লাখ মানুষ নিহত হতে পারে এবং পরবর্তীতে আরো বহু প্রাণহানি ঘটবে। সিআইএ'র এ মূল্যায়নের আগে বলা হয়েছে, দু'দেশের মধ্যে সীমিত পর্যায়ের পারমাণবিক যুদ্ধের ফলে হতাহতের সংখ্যা এত বেশি হতে পারে যে, এলাকার সবগুলো হাসপাতাল উপচে পড়বে এবং অবশিষ্ট বিশ্ব বিপুল পরিমাণ ত্রাণসামগ্রী নিয়ে আসতে বাধ্য হবে। মানবিক সংকট এমন পর্যায়ে উপনীত হবে যে, মধ্যপ্রাচ্য ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার প্রতিটি চিকিৎসা সুবিধা দ্রুত হতাহতে উপচে পড়বে। পাকিস্তান ও ভারত উভয়পক্ষ তাদের পারমাণবিক শক্তির পূর্ণ ব্যবহার করলে মৃত্যুর আনুমানিক সংখ্যা দাঁড়াবে ৯০ লাখ থেকে এক কোটি ২০ লাখে। প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, পাকিস্তানের হাতে ১৫০ ও ভারতের হাতে ২৫০ যুদ্ধাস্ত্র থাকতে পারে। এদিকে ভারতীয় সমরবিদগণ সোমবার রাতে উত্তপ্ত ছিটমহল 'চিকেন নেক' নিয়ে বড় ধরনের হামলার প্রস্তুতি নেয়। পাকিস্তান বাহিনী অবশ্যই এ চিকেন থেকে হামলা চালাবে। ভারতীয় সমর বিশেজ্ঞরা সোমবার রাতে বলেছেন, যুদ্ধের প্রথম ৭২ ঘন্টায় ভারত অধিকৃত কাশ্মীরের জম্মু নগরীর অদূরে ব্যাপক লড়াই ছড়িয়ে পড়বে। ভারতীয় সমরবিদরা বিশেষ করে আখনুর অঞ্চলের চিকেন নেক নিয়েই বেশি আতঙ্কিত। এ এলাকাটি পাকিস্তানী ভূখণ্ড দিয়ে তিন দিক থেকে পরিবেষ্টিত। তাছাড়া কাশ্মীর সীমান্তে যে কোন ধরনের অভিযান ভয়াবহ পরিণতির দিকে ধাবিত হতে পারে বলে ভারতীয় সামরিক বিশ্লেষকগণ মনে করেন। ভারতীয় সামরিক কর্মকর্তারা আরও আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেছে যে, পাকিস্তান জাতীয় মহাসড়ক আই এ'র নিয়ন্ত্রণ দখলের চেষ্টা করতে পারে। এ মহাসড়কের মাধ্যমে কাশ্মীর উপত্যকার সাথে ভারতের সংযোগ। পাকিস্তান এ স্থানটিতেই ভয়াবহ হামলা চালাবে। তারা মনে করে, গত তিনবারের যুদ্ধেও এটাই পাকিস্তানের লক্ষ্য ছিলো।

সূত্র ঃ সাপ্তাহিক পূর্ণিমা তাং ৫-৬-২০০২

www.pathagar.com

ভারতের নসিহত ঃ কুঁজোও চায় চিৎ হয়ে শুতে

গত ৯ জুলাই ঢাকা আগমনের পর থেকে গত ১২ জুলাই পর্যন্ত ভারতের অর্থমন্ত্রী ডক্টর মনমোহন সিং বাংলাদেশ তথা সার্ক দেশসমূহের উদ্দেশ্যে যে সমস্ত নসিহত বর্ষণ করেছেন, সে সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে রাজনৈতিক মহল উপরোক্ত মন্তব্য করেছেন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, গত ৯ জুলাই ঢাকায় অবতরণের পর বার্তা সংস্থা ইউএনবি'র সাথে এক সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে সর্বোচ্চ মাত্রায় সামরিক বাজেট কমানোর জন্য ভারতের অর্থমন্ত্রী সার্ক দেশসমূহের প্রতি আহবান জানিয়েছেন। তিনি একথাও বলেছেন যে, সামরিক বাজেট অবশ্য একটি দেশের নিরাপত্তা পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে।

তার মতে সার্ক অঞ্চলে এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি হওয়া উচিত যার ফলে সদস্য দেশসমূহের সামরিক বাজেট হ্রাস করা যায়। বাণিজ্যমন্ত্রী প্রণব মুখার্জী প্রমুখ ভারতীয় নেতৃবৃন্দ ভারত কর্তৃক ট্রানজিট সুবিধা হিসেবে চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহার করার যে আবদার ইতোপূর্বে করেছিলেন গত ১২ জুলাই ব্যবসায়ীদের সাথে আলোচনাকালে ডঃ সিং সেই আবদারের পুরানো রেকর্ড নতুন করে জানিয়েছেন। ভারতীয় অর্থমন্ত্রী ডঃ মনমোহন সিং-এর এসব আপত্তিকর উক্তি ও আবদারের বিরুদ্ধে ঢাকা ও চট্টগ্রামের রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। ঐ মহল বলছে যে, বাংলাদেশের যে ভৌগোলিক অবস্থান এবং ১২ কোটি লোকের যে বিশাল জনসংখ্যা, সেই বিবেচনায় ১৮শ' কোটি টাকা অর্থাৎ ৪৮০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের সামরিক বাজেট প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই অপ্রতুল। শুধু তাই নয় সমগ্র বিশ্বে বাংলাদেশের সামরিক বরাদ্দ রেকর্ড পরিমাণে কম। জাতিসংঘের মানব উন্নয়ন রিপোর্ট '৯৪ অনুযায়ী পৃথিবীতে যারা সবচেয়ে বেশি পরিমাণে এবং সবচেয়ে বেশি অর্থের ও মূল্যের অস্ত্র আমদানী করে তাদের মধ্যে ভারতের অবস্থান শীর্ষে। সেনাবাহিনীর আয়তনের দিক দিয়ে ভারত পৃথিবীর চতুর্থ বৃহত্তম। ভারতের বিমানবাহিনী পৃথিবীর ৬ষ্ঠ বৃহত্তম এবং নৌ-বাহিনী ৭ম বৃহত্তম।

বিশাল সামরিক বাজেট ও বিশাল মিলিটারী মেশিন

পর্যবেক্ষক মহল বলেন যে, ড: মনমোহন সিং এর মতো ভারতের অতীব গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী যখন বাংলাদেশসহ অন্যান্য দেশকে সামরিক বাজেট কমাবার জন্য উপদেশ খয়রাত করেছেন তখন তারা ভারতের অর্থমন্ত্রীকে আয়নায় আপন চেহারা দেখতে বলেছেন। ড়ঃ মনমোহন বাবুর দৃষ্টি আকর্ষণ করে তারা বলেছেন যে, অতীতের খতিয়ান তো পরের কথা, চলতি '৯৪-৯৫ অর্থবছরেও ভারত তার সামরিক বাজেট বিপুলভাবে বৃদ্ধি করেছে। বাংলাদেশের চেয়ে ভারতের জনসংখ্যা ৭ গুণ বেশি। এদিক দিয়ে হিসেব করলেও ভারতের সামরিক বাজেট বাংলাদেশের চেয়ে খুব বেশি হলেও ৭ গুণ বেশি হতে পারে।

www.pathagar.com

হিসেব করলে ভারতের সামরিক বাজেট খুব বেশি হলে সাড়ে ১২ হাজার কোটি টাকা হতে পারে। কিন্তু ভারত গত বছরের সামরিক বাজেট বাংলাদেশী মুদ্রায় ২৮ হাজার কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ৩৫ হাজার কোটি টাকা করলো কোন যুক্তিতে? এক বছরে একেবারে ৮ হাজার কোটি টাকা বৃদ্ধি। অর্থাৎ ভারত ১ বছরে তার সামরিক বাজেট যতটুকু বাড়িয়েছে সেই বর্ধিত পরিমাণই তো বাংলাদেশের সাড়ে ৮ বছরের সামরিক বাজেটের সমান। তারপরেও আবার সামরিক ব্যয় কমানোর নসিহত?

ভারতের সামরিক দানব

ডঃ সিং কি জানেন না যে, ভারতের রয়েছে ২টি বিমানবাহী জাহাজ (যেখান থেকে কয়েক ডজন জঙ্গী বিমান উড়তে পারে এবং নামতে পারে) সেখানে বাংলাদেশের একটিও নেই। ভারতের রয়েছে ২টি আণবিক শক্তিচালিত সাবমেরিন সেখানে বাংলাদেশের একটিও নেই। মনমোহন বাবু কি জানেন না যে, ওটা ছাড়াও ইন্ডিয়ার রয়েছে ১৪টি সাবমেরিন ও ৫টি ডেস্ট্রয়ার আর বাংলাদেশের একটিও সাবমেরিন, ডেস্ট্রয়ার নেই।

পর্যবেক্ষক মহল বলেন যে, ভারতের বড় কর্তারা যখন বাংলাদেশে এসে আমাদেরকে ডিফেন্স সম্পর্কে সবক দেন তখন মনে হয় যে, আমরা বাংলাদেশীরা যেন সব অপগন্ড, কঅক্ষর গোমাংস। মনমোহন সিং-এর অস্ত্র ভান্ডারে থাকবে সাড়ে ৩ হাজার ট্যাংক আর আমাদের ভান্ডারে ১০০টিও থাকবে না, সেটা কেমন কথা? তারা টি-৭২ এর মতো অত্যাধুনিক রুশ ট্যাংক রাখবেন আর আমরা মাত্র কয়েক ডজন টি-৪৫/টি-৫৪ মান্ধাতা আমলের চীনা ট্যাংক নিয়ে পড়ে থাকবো কেন? ভারতীয়রা আড়াই হাজার মাইল দূরপাল্লার 'অগ্নি' নামের ব্যালিস্টিক মিসাইল বানাবেন, 'পৃথ্বি' নামের হাজার মাইলের সারফেস মিসাইল বানাবেন, 'আকাশ' নামের হাওয়াই ক্ষেপণাস্ত্র বানাবেন, 'নাগ' নামের ট্যাংক মারার মিসাইল বানাবেন আর বাংলাদেশ বসে বসে সেই পিতামহ ও প্রপিতামহের জামানার গেঁটে বন্দুক নিয়ে এ্যারোপ্লেন আর ট্যাংক মারবে-এ কেমন কথা?

ওদের অস্ত্র গুদামে থাকবে সাড়ে ৯শ' জঙ্গী বিমান আর আমাদের একশ'টিও থাকবে না সেটাই বা কেমন বিচার? মনমোহন বাবুরা দুনিয়ার সব তাবদ জঙ্গী বিমান যথা মিগ-২৯, মিরাজ-২০০০, ইঙ্গো-ফরাসী জাগুয়ার ইত্যাদি রাখবেন আর আমরা সেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের চীনা মিগ-১৯ রাখবো তাও আবার মাত্র কয়েক ডজন সেটাই বা কোন যুক্তিতে বলেন?

সামরিক বাজেট ও দারিদ্রের মাঝে শুভংকরের ফাঁক

ইঙ্গো-মার্কিন পশ্চিমা দুনিয়ার সাথে ঐকতান ধরে এখন মনমোহন বাবুরাও বলতে শুরু করেছেন এবং বাংলাদেশকে নসিহত করছেন যে, তোমাদের গরীবী হঠাতে হলে সামরিক বাজেট কমাও। তবে এখানেও যে শুভংকরের ফাঁকটা রয়েছে সেটা কিন্তু মনমোহন বাবুর মতো জাঁদরেল আমলা অর্থনীতিবিদ ফাঁস করে দেননি। গত ১০ জুলাই ইউএনবি'র বরাত দিয়ে ঢাকার ইংরেজি দৈনিক 'ডেইলী স্টার' ইউএনডিপি'র সর্বশেষ হিসেবে কথিত একটি রিপোর্ট ছেপেছে। ঐ রিপোর্টে পরিবেশিত পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে, সার্ক অঞ্চলে বাজেট ও জিডিপি'র তুলনায় সবচেয়ে বেশি বরাদ্দ যে দেশটির

www.pathagar.com

সেই পাকিস্তানের মাথাপিছু আয় হলো ৪৪০ মার্কিন ডলার। পক্ষান্তরে মনমোহন বাবু ঢাকায় এসে দাবী করেছেন যে, জিডিপি'র তুলনায় তার দেশের সামরিক বরাদ্দ পাকিস্তানের তুলনায় কম। তদসত্ত্বেও ভারতের মাথাপিছু আয় ৩১০ ডলার কেন? জিডিপি'র অংশ হিসেবে বাংলাদেশ সামরিক ব্যয়ে পৃথিবীর অন্যতম সর্বনিম্ন বরাদ্দকারী দেশ। জিডিপি'র তুলনায় বাংলাদেশের এ বছরের বরাদ্দ মাত্র ১ দশমিক ৭ শতাংশ। তদসত্ত্বেও বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় মাত্র ২২০ ডলার কেন? সামরিক ব্যয় সর্বনিম্ন হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশে দারিদ্রসীমার নিচে অবস্থানকারী জনগোষ্ঠীর পরিমাণ ৪৫ শতাংশ। অথচ ভারত ৩৬ হাজার কোটি টাকা ব্যয় করার পরেও তার দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর পরিমাণ ৩০ শতাংশ কেন? আর পাকিস্তান সামরিক খাতে বেশি ব্যয় করা সত্ত্বেও দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী তার জনগোষ্ঠীর পরিমাণ মাত্র ২২ শতাংশ কেন?

আসলে বাংলাদেশের মিলিটারীকে তারা পুলিশ বানাতে চান

শুধু ভারতীয়রা কেন, বাংলাদেশেও এক শ্রেণীর তথাকথিত বুদ্ধিজীবী এবং অর্থনীতিবিদ বাংলাদেশের সামরিক বাজেট কমাবার জন্য তার স্বরে অহর্নিশ চিৎকার করে যাচ্ছেন। কিন্তু তারা কি বলবেন যে, ভিয়েতনাম যার জিডিপি মাত্র ১৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং লোকসংখ্যা ৭ কোটি ১২ লক্ষ তাদের সশস্ত্র বাহিনীর সংখ্যা ৮ লক্ষ ৫৭ হাজার কেন? থাইল্যান্ডের জনসংখ্যা বাংলাদেশের অর্ধেকের চেয়েও কম। তাদের সামরিক বাজেট ৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলারেরও বেশি। উত্তর কোরিয়ার জনসংখ্যা হল ২ কোটি ৩০ লক্ষ। তাদের সশস্ত্র বাহিনীর সংখ্যা ১১ লক্ষ ২৭ হাজার কেন? তাদের ৩ হাজার ৭শ'টি ট্যাংক, ৮১০টি জঙ্গী বিমান এবং ২৫টি সাবমেরিন কেন? শ্রীলংকার মতো একটি দ্বীপ দেশের সামরিক বাজেটও বাংলাদেশের চেয়ে বেশি অর্থাৎ ৫০০ মিলিয়ন কেন? জর্ডানের সামরিক বাজেট ৫৪২ মিলিয়ন, সুদানের মতো গরীব দেশের ৭৬৫, তিউনিশিয়ার মতো ক্ষুদ্র দেশের ৫৭৫ মিলিয়ন কেন? এমনকি সার্বিয়ার মতো একটি ছোট্ট দেশ যার জিডিপি মাত্র ১৪ বিলিয়ন ডলার তার সামরিক বাজেট পৌনে ৪ বিলিয়ন ডলার কেন? ইসরাইল যার জনসংখ্যা মাত্র ৫২ লক্ষ এবং যার জিডিপি মাত্র ৬৫ বিলিয়ন ডলার তার ডিফেন্স বাজেট সাড়ে ৬ বিলিয়ন ডলার কেন? কোন যুক্তিতে ইসরাইলের ট্যাংকের সংখ্যা ৪ হাজার এবং জঙ্গী বিমান ৭শ'। এ দেশের বামপন্থী বুদ্ধিজীবী যারা কিউবা ও তার নেতা ফিডেল কাস্ট্রোর প্রশংসায় ছিলেন পঞ্চমুখ তার জিডিপি বাংলাদেশের অর্ধেক অর্থাৎ মাত্র ১৩ বিলিয়ন হওয়া সত্ত্বেও এবং তার জনসংখ্যা মাত্র ১ কোটি ১০ লক্ষ হওয়া সত্ত্বেও তার সামরিক বাজেট ১.১৬ বিলিয়ন হয় কোন যুক্তিতে?

ডঃ মনমোহন সিং নিজেই অবশ্য এসব কথার জবাব দিয়েছেন। সামরিক বরাদ্দ নির্ভর করে একটি দেশের নিরাপত্তা ভাবনার ওপর। সেই নিরাপত্তা পরিস্থিতির বিবেচনায় বাংলাদেশের সামরিক বরাদ্দ খুব অপ্রতুল।

সূত্র ঃ দৈনিক ইনকিলাব; তাং ১৭-৭-৯৪

www.pathagar.com

পাকিস্তান ও ভারতের নিজস্ব অস্ত্র উৎপাদন

এশীয় উপমহাদেশে আবার অস্ত্র প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। এই উপমহাদেশের সবচেয়ে বড় দু'টি দেশ ভারত এবং পাকিস্তান থেকে যেসব খবর পাওয়া যাচ্ছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে, এই দুটি দেশ শুধুমাত্র পারমাণবিক অস্ত্র কর্মসূচীই নয় সনাতনী অস্ত্র উৎপাদন ও বিদেশ থেকে সংগ্রহেও নতুন করে উদ্যোগী হয়েছে। তাদের ভান্ডারে অস্ত্রের মওজুদ গড়ে তোলার ব্যাপারে প্রতিরক্ষা উৎপাদন কর্মসূচী একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছে। নিজস্ব কারখানায় নিজস্ব প্রযুক্তিতে ভারত কর্তৃক সমরাস্ত্র উৎপাদনের সংবাদ বেশ কয়েক বছর পূর্বেই পাওয়া গিয়েছিল। বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পত্র-পত্রিকায় এ সম্পর্কে বিভিন্ন সময় সংবাদও প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে পাকিস্তানের অবস্থান সম্পর্কে সাধারণভাবে এ অঞ্চলের মানুষ বিশেষভাবে বাংলাদেশের জনগণ সম্পূর্ণ অন্ধকারে ছিলেন। কিন্তু অতি সম্প্রতি পাকিস্তানের বিভিন্ন দৈনিক ও সামরিক পত্র-পত্রিকা এবং সরকারী প্রকাশনীর মাধ্যমে এক্ষেত্রে নতুন কিছু সংবাদ পাওয়া গেছে। প্রাপ্ত সংবাদ অনুযায়ী পাকিস্তান জঙ্গী বিমান ও ট্যাংক নির্মাণ ও মেরামতে বিপুল অগ্রগতি লাভ করেছে। এছাড়া হালকা ও ক্ষুদ্র অস্ত্রশস্ত্রের ক্ষেত্রেও পাকিস্তানের তিন বাহিনী তাদের সামগ্রিক চাহিদার ৯৫% শতাংশ স্বদেশী অস্ত্র কারখানার উৎপাদন থেকে মেটাচ্ছে।

ভারতের প্রতিরক্ষা উৎপাদন

প্রতিরক্ষা উৎপাদনের ক্ষেত্রে ভারত অসামান্য অগ্রগতি লাভ করেছে। ইতিপূর্বে ভারত 'বৈজয়ন্তী' নামে যে ট্যাংক নির্মাণ করেছে সেই ট্যাংক ভারতের সাঁজোয়া বহরে রয়েছে। এখন 'অর্জুন' নামে আরেকটি নতুন মডেলের ট্যাংক ভারতীয় সেনাবাহিনীতে যুক্ত করা হয়েছে। এ ট্যাংকটির প্রযুক্তি 'বৈজয়ন্তী'র চেয়ে উন্নত। ইতিপূর্বে ভারতীয় বিমান বাহিনীতে 'হান্টার' ও 'ক্যানবেরা' নামক ব্রিটিশ জঙ্গী বিমান অন্তর্ভুক্ত ছিল। এগুলো এখন বাতিল হওয়ার পর্যায়ে রয়েছে। তদস্থলে 'অজিত' নামক স্বদেশে নির্মিত জঙ্গী বিমান স্থলাভিষিক্ত হয়েছে। যুদ্ধ বিমানের ক্ষেত্রে ভারতে অতি শীঘ্রই একটি গুরুত্বপূর্ণ পাতা সংযোজিত হতে যাচ্ছে। আর এটা হল 'লাইট কমব্যাট এয়ারক্র্যাফট' (এলসিএ) বা হালকা জঙ্গী বিমান উৎপাদন। উৎপাদন প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। এখন কয়েকটি কারিগরি ও কৌশলগত কারণে সেগুলো স্টোরে আনা হচ্ছে না। এই বিমানটি প্রযুক্তি এবং গতিবেগের দিক দিয়ে বিশ্বের অনেক উন্নতমানের বিমানের সমকক্ষ হবে বলে ভারতীয়রা আশা করছেন। তিন বাহিনীর হালকা ও ক্ষুদ্র অস্ত্রের চাহিদা মেটাতে ভারতের অস্ত্র কারখানাসমূহ এখন স্বয়ংসম্পূর্ণ।

www.pathagar.com

প্রতিরক্ষা উৎপাদনে ভারত বিস্ময়কর সাফল্য অর্জন করেছে। 'অগ্নি' নামক দেড় হাজার মাইল পাল্লার আন্তঃ মহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র নির্মাণ একটি যুগান্তকারী ঘটনা। এই মিসাইলের আওতায় আনা যাবে তিনটি মহাদেশকে। পাকিস্তানকে মোকাবিলার জন্য বিশেষভাবে নির্মিত হয়েছে 'পৃথ্বি' নামক ১৭৫ মাইল পাল্লার ভূমি থেকে ভূমিতে নিক্ষেপক ক্ষেপণাস্ত্র। এছাড়া ট্যাংক বিধ্বংসী 'নাগ' এবং বিমান বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র 'ত্রিশূল' এখন ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

প্রতিরক্ষা উৎপাদনে পাকিস্তান ঃ ট্যাংক

তক্ষশিলার হেভী ইন্ডাস্ট্রিজ নামক কারখানা কর্তৃক প্রকাশিত বুলেটিন থেকে জানা যায় যে, এই কারখানাটির পরিকল্পনা করা হয় ১৯৭১ সালে এবং উৎপাদন শুরু হয় ১৯৮০ সালে। পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদ থেকে ৪০ কিঃ মিঃ দূরে ১৪৫০ একর জমির উপর এই শিল্প কমপ্লেক্সটি প্রতিষ্ঠিত। গণচীনের সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত এই ট্যাংক ফ্যাক্টরীতে ট্যাংকের নির্মাণ ও পুনর্নির্মাণ এবং আর্মড পারসোনাল ক্যারিয়ার বা সাঁজোয়া যান নির্মিত হচ্ছে। প্রথম পর্যায়ে এই কারখানায় গণচীনের টি-৫৯ মডেলের ট্যাংক পুনর্নির্মাণ করা হতো। পরবর্তীকালে এই কমপ্লেক্সে টি-৬৯ মডেলের সমকক্ষ করে টি-৫৯ ট্যাংককে আপগ্রেড করা হচ্ছে।

এই ফ্যাক্টরীর পাশে আরেকটি ফ্যাক্টরী প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৮৬ সাল থেকে এখানে মেসার্স জেনারেল ডায়নামিক্সের সহযোগিতায় মার্কিন ট্যাংক সাঁজোয়া যান নির্মিত ও পুনর্নির্মিত হচ্ছে। এই কারখানায় মার্কিন ট্যাংক 'এম-৪৮' এবং এপিসি 'এস-১১৩' নির্মিত হচ্ছে। এসব ট্যাংকে যে কামান সজ্জিত হচ্ছে তার ক্যালিবার ১০৫ থেকে ৩০০ মিঃ মিঃ। অতি শীঘ্রই এই মিলিমিটার আরো বৃদ্ধি করা হবে। এসব ফ্যাক্টরীর উৎপাদন ক্ষমতা বছরে শতাধিক ট্যাংক।

নতুন মডেল ঃ আল খালিদ

পাকিস্তানের বহুল প্রচারিত ইংরেজি দৈনিক 'ডন' সাম্প্রতিক অতীতে 'আল খালিদ' নামক একটি নতুন মডেলের ট্যাংক উৎপাদনের খবর দিয়েছে। সাবেক সেনাপ্রধান মীর্জা আসলাম বেগের উদ্ধৃতি দিয়ে ডনের উক্ত খবরে বলা হয়েছে যে, মার্কিন হস্তক্ষেপের কারণে এই ট্যাংকের উৎপাদন বিলম্বিত হয়েছে। এই ট্যাংকটি জার্মান ইঞ্জিন দ্বারা সজ্জিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ইঞ্জিন সরবরাহ না করার জন্য আমেরিকা জার্মানীর ওপর চাপ সৃষ্টি করে, ফলে উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়। এখন বিকল্প সূত্র থেকে এই ইঞ্জিন সরবরাহ করা হচ্ছে বলে সাবেক সেনাপ্রধান জেনারেল আসলাম বেগ জানান। তিনি বলেন, ভারত যদিও ২১ বছর আগে ট্যাংক উৎপাদন শুরু করেছে তৎসত্ত্বেও আল খালিদের মত উন্নতমানের ট্যাংক এখনও তারা উৎপাদন করতে পারেনি।

মিরাজ ও এফ-৬, ৭ পুনর্নির্মাণ কারখানা, কামরা

ইসলামাবাদ থেকে প্রকাশিত ইংরেজি দৈনিক 'মুসলিম' 'দি নিউজ' এবং পাকিস্তান এরোনোটিক্যাল কমপ্লেক্সের ব্রোসিওর থেকে পাকিস্তানের জঙ্গী বিমান পুনর্নির্মাণ সম্পর্কে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া গেছে। সাম্প্রতিক অতীতে প্রকাশিত এসব খবরা খবর থেকে জানা যায় যে, জঙ্গী বিমান মেরামত এবং পুনর্নির্মাণের ক্ষেত্রে পাকিস্তান

www.pathagar.com

অপ্রত্যাশিত অগ্রগতি সাধন করেছে। এসব খবর থেকে জানা যায় যে, ১৯৭২ সালে পাকিস্তান গণচীনের এফ-৬ মডেলের জঙ্গী বিমান পুনর্নির্মাণ কারখানা স্থাপন করে। ১৯৭৪ সালে স্থাপিত হয় 'মিরাজ পুনর্নির্মাণ কারখানা এবং ১৯৭৫ সালে পাকিস্তানের আটক জেলার 'কামরা' নামক স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয় পাকিস্তান এরোনোটিক্যাল কমপ্লেক্স। ১৯৮৬ সালে কামরায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 'এভিয়নিক্স এবং রাডার ফ্যাক্টরী।' বর্তমানে এসব কারখানা পিএসির পাকিস্তানের এরোনোটিক্যাল কমপ্লেক্সের অধীনে ন্যস্ত হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, এফ-৬ ও ৭ মিগ বিমানের উন্নততর সংস্করণ।

পিএসির প্রাথমিক কাজ হচ্ছে নিম্নোক্ত বিমানগুলোর পুনর্নির্মাণ। এগুলো হলো– গণচীনের এফ-৬, গণচীনের এফ-৭, এফ-III, মিরাজ-III এবং মিরাজ-৫। এছাড়া মিরাজ জঙ্গী বিমানের ইঞ্জিন 'অটার ০৯সি' এবং মার্কিন অত্যাধুনিক জঙ্গী বিমান এফ-১৬ এর ইঞ্জিন এফ-১০০ এর মেরামত এবং পুনর্নির্মাণও কামরায় অবস্থিত পিএসিতে করা হয়। ১৯৯১ সালে অস্ট্রেলিয়ার নিকট থেকে পাকিস্তান ৫০টি মিরাজ-৫ জঙ্গী বিমান সংগ্রহ করে। বিমানগুলো সেকেলে হওয়ায় অস্ট্রেলিয়ায় বাতিল খাতায় এই বিমানগুলোর নাম উঠেছিল। কামরার মহাপরিচালক এয়ারভাইস মার্শাল রহিম ইউসুফ জাই দাবী করেছেন যে, পাকিস্তানের এমআরএফে (মিরাজ রিবিল্ড ফ্যাক্টরী) এসব বিমানের অধিকাংশই একেবারে নতুন করে ঢেলে সাজানো হয়েছে এবং এসব বিমান এখন পাকিস্তান বিমান বাহিনীতে ক্রিয়াশীল রয়েছে। অবশিষ্ট বিমানগুলো পুনর্নির্মাণও অতি শ্রীঘ্রই সমাপ্ত হবে।

কারাকোরাম-৮ এবং মুশ্‌শাক বিমান নির্মাণ

ইসলামাবাদের কর্মরত সাংবাদিক এবং কতিপয় পত্রিকায় প্রকাশিত সূত্রে জানা যায় যে, পিএসি মুশশাক নামক একটি হাল্কা প্রশিক্ষণ বিমান নির্মাণ করেছে। এই বিমান ওমান, সিরিয়া এবং ইরানের বিমান বাহিনী এবং পাকিস্তানের বিমান বহর থেকে আকাশে উড়েছে। পিএসি কামরা আরেকটি প্রশিক্ষণ বিমান আকাশে উড়িয়েছে। গণচীনের যৌথ সহযোগিতায় নির্মিত এই বিমানটির নাম কারাকোরাম-৮। খবরে প্রকাশ, উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কারাকোরাম-৮ ক্রয় করার জন্য সৌদি আরব আগ্রহ দেখিয়েছে। মধ্যপ্রাচ্য এবং দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একাধিক দেশও না-কি এই বিমানটি ক্রয়ে আগ্রহী।

সুপার-৭ জঙ্গী বিমান নির্মাণের প্রস্তুতি

এয়ারভাইস মার্শাল ইউসুফ জাইয়ের বরাত দিয়ে ইসলামাবাদের ইংরেজি দৈনিক 'মুসলিম' জানিয়েছে যে, পাকিস্তান গণচীনের যৌথ সহযোগিতায় সুপার-৭ নামক একটি আধুনিক জঙ্গী বিমান নির্মাণের জন্য নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছে। চীন এই বিমানের ইঞ্জিন এবং এয়ারফ্রেম নির্মাণ করবে, পক্ষান্তরে পাকিস্তান যোগাবে এভিয়নিক্স।

সার্ফেস টু সার্ফেস মিসাইল হাতফ্ এবং আন্‌জা

ভারতের ক্ষেপণাস্ত্রকে মোকাবিলার জন্য চীনা এসএএফ (সার্ফেস টু সার্ফেস মিসাইল) ছাড়াও পাকিস্তানে দুইটি ভূমি থেকে নিক্ষেপক ক্ষেপণাস্ত্র তৈরি হয়েছে। এগুলোর নাম 'হাতফ্' এবং 'আন্‌জা'। ভারতের 'পৃথ্বির' তুলনায় এসব ক্ষেপণাস্ত্র এখনও তত শক্তিশালী নয়। তবে এগুলোর উৎকর্ষতার চেষ্টা চলছে বলে প্রতিরক্ষা সংবাদদাতারা জানিয়েছেন।

সূত্র ঃ দৈনিক ইনকিলাব; তাং ১৪ মাঘ ১৪০২

www.pathagar.com

সর্বশেষ ঃ ভারত ইরান প্রতিরক্ষা চুক্তি পাকিস্তানের কি হবে?

প্রায় ৬ বছর শীতল থাকার পর পাক-মার্কিন সম্পর্কের জমাট বরফ গলতে শুরু করেছে। দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক রাজনীতির পর্যবেক্ষকরা অবাক-বিস্ময়ে লক্ষ্য করছেন যে, পাক-মার্কিন সম্পর্ক নবায়নে যে সব মার্কিন নেতা উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ করেছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন–মার্কিন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী উইলিয়াম পেরী, জ্বালানি মন্ত্রী হ্যাজেল ও লেয়ার এবং সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী রবিন র‍্যাফেল। পাক-মার্কিন সম্পর্ক পুনর্গঠনে এই তিন মার্কিন নেতাকে পর্দার অন্তরাল থেকে অকুণ্ঠ সমর্থন দিয়ে গেছেন স্বয়ং প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন। দক্ষিণ এশিয়ার অভিজ্ঞ রাজনৈতিক পণ্ডিতরা স্তম্ভিত বিস্ময়ে লক্ষ্য করছেন যে, পাক-মার্কিন সম্পর্কের উন্নতি সূচিত হয়েছে সেই ডেমোক্র্যাট প্রশাসনে, যারা অর্ধশতাব্দী ধরে সাধারণভাবে ভারতপন্থী বলে পরিচিত। আর পাকিস্তানের সাথে ৫ বছর আগে সম্পর্কের অবনতি ঘটতে শুরু করে সেই রিপাবলিকান প্রশাসনের আমলে, যারা সাধারণভাবে অর্ধশতাব্দী ধরে পাকিস্তানপন্থী বলে পরিচিত। রাজনীতির কি বিচিত্র গতি, যে ভারত-মার্কিন সম্পর্কের অলিন্দে হানা দিয়েছে সন্দেহ এবং অবিশ্বাস সেই ডেমোক্র্যাট প্রশাসনে যারা তাদের সনাতনী মিত্র। ঢাকার কয়েকটি কূটনৈতিক সূত্র এবং ওয়াশিংটনের একাধিক নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে যে, পাকিস্তানের দিকে আমেরিকার এই আকস্মিক হেলে পড়ার প্রধান কারণ হল ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান। এসব সূত্রে জানা গেছে যে, ৫ বছর পর পাকিস্তানের দিকে ওয়াশিংটনের ঝুঁকে পড়ার দ্বিতীয় প্রধান কারণ হল বন্ধুত্বের হাত প্রসারিত করা সত্ত্বেও আমেরিকার প্রতি ভারতের সন্দেহজনক ও অবিশ্বস্ত আচরণ। ওয়াশিংটনে একটি বিশেষ লবির মাধ্যমে জানা গেছে যে, চলতি বছর এপ্রিল মাসের তৃতীয় সপ্তাহে নয়াদিল্লীতে দুইজন আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্বের একই সময়ে যুগপৎ সফরকে কেন্দ্র করে ভারত-মার্কিন সম্পর্কে সন্দেহ ও অবিশ্বাস সৃষ্টি হয়। এই দুই আন্তর্জাতিক ব্যক্তির একজন হলেন, ইরানের প্রেসিডেন্ট আলী আকবর হাশেমী রাফসানজানি এবং অপরজন হলেন আমেরিকার অর্থমন্ত্রী রবার্ট রুবীন।

ভারত-ইরান প্রতিরক্ষা সহযোগিতা

এ বছরের এপ্রিল মাসের ১৭ থেকে ১৯ তারিখ পর্যন্ত ইরানের প্রেসিডেন্ট রাফসানজানি রাষ্ট্রীয়ভাবে তিনদিন ভারত সফর করেন। একই সময় মার্কিন অর্থমন্ত্রী রবার্ট রুবীন দিল্লী সফল করেন। মার্কিন অর্থমন্ত্রী দিল্লী বিমানবন্দরে অবতরণের পর পরই মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেন যে, ইরানের প্রেসিডেন্ট দিল্লী এসেছেন। ইরানী রাষ্ট্রনায়ককে যে বিরোচিত ও ঐতিহাসিক সংবর্ধনা দেয়া হয়েছে তার ছাপ বিমানবন্দর থেকে দিল্লী মহানগরী

www.pathagar.com

পর্যন্ত প্রলম্বিত রাজপথ এবং পথিপার্শ্বস্থ ভবনের আনাচে-কানাচে রয়ে গেছে। অথচ মার্কিন অর্থমন্ত্রীকে সবার অলক্ষে নীরবে-নিভৃতে নিয়ে চলে গেলেন। ঐ সময় অর্থাৎ ১৮ এপ্রিল রয়টারের খবর অনুযায়ী মার্কিন অর্থমন্ত্রী ইরান সম্পর্কে আমেরিকার চরম উদ্বেগের কথা ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরসীমা রাওকে জানিয়ে দেন। একটি বিষয় লক্ষ্য করে মিঃ রবার্ট রুবীন দারুণভাবে ব্যথিত ও মর্মাহত হন যে, তিনি যখন দিল্লী অবস্থান করবেন তখন প্রেসিডেন্ট রাফসানজানিও যে দিল্লী সফল করছেন সে কথা ভারত সরকার তাকে জানাবারও প্রয়োজন মনে করেনি। এমন চরম অনাদর ও অবহেলার মধ্যদিয়ে বিদায় নেয়ার প্রাক্কালে মার্কিন নেতা যখন ইরান সম্পর্কে আমেরিকার চরম অসন্তুষ্টির কথা ভারতকে জানালেন তখন ভারতীয়রা করল সম্পূর্ণ উল্টো কাজ। ভারতীয় পার্লামেন্টের উচ্চ ও নিম্ন উভয় কক্ষের যৌথ অধিবেশনে ভাষণ দিলেন ইরানী প্রেসিডেন্ট। এবং ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী বললেন, "মহামান্য প্রেসিডেন্ট ভারতে আপনার এই সফর আমাদের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে একটি যুগান্তকারী ঘটনা হিসাবে চিহ্নিত থাকবে।"

ভারতের প্রাক্তন পররাষ্ট্র সচিব জেএন দিক্ষীত এ সম্পর্কে একটি বিরল তথ্য প্রকাশ করেছেন। তিনি জানিয়েছেন যে, ১৯৯১ সাল থেকেই ভারত ইরানের সাথে সম্পর্ক জোরদার করাকে তার বিদেশনীতিতে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার হিসাবে স্থান দিয়েছিল। ভারতের দূতিয়ালী এবং সুপারিশেই রাশিয়া ইরানে দুইটি 'কিলো' শ্রেণীর সাবমেরিন সরবরাহ করেছে। আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে ইরানী নৌবাহিনীতে আরও একটি সাবমেরিন যুক্ত হবে। ভারতের রাষ্ট্র সমর্থিত আন্তর্জাতিক ও প্রতিরক্ষা বিষয়ক গবেষণা প্রতিষ্ঠানের পরিচালক শ্রীধর একটি চাঞ্চল্যকর তথ্য দিয়েছেন। ঐ তথ্যে বলা হয়েছে যে, ইরান ৫০০ কোটি ডলার মূল্যের (২০ হাজার কোটি টাকা) অস্ত্র ক্রয়ের জন্য রাশিয়ার সাথে একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে।

পারমাণবিক অস্ত্রের সন্ধানে ইরান

'৯৪ সালের শেষে এবং '৯৫ সালের শুরুতে তিনটি আণবিক চুল্লী স্থাপনের জন্য ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান গণচীন এবং রাশিয়ার সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করে। এই তিনটির মধ্যে দুইটি রিএ্যাক্টর সরবরাহ করবে চীন এবং একটি দেবে রাশিয়া। ইরানের প্রেসিডেন্ট রাফসানজানি বিগত এপ্রিল মাসে যখন ভারত সফর করছিলেন ঠিক একই সময় মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়ারেন ক্রিস্টোফার নিউইয়র্কে চীনা পররাষ্ট্রমন্ত্রী কিয়েন কিচেনের সাথে এক বৈঠকে মিলিত হন। ঐ বৈঠকে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানান যে, এটা একটা ভয়ংকর চুক্তি। এ দু'টি চুল্লী থেকে ইরান পরমাণু অস্ত্র নির্মাণ করবে। তাই চুক্তিটি বাতিলের জন্য তিনি চীনা পররাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রতি সনির্বন্ধ অনুরোধ জানান। কিন্তু চীনা পররাষ্ট্রমন্ত্রী অত্যন্ত বিনয়ের সাথে কিন্তু দৃঢ়ভাবে মার্কিন অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন। এ ব্যাপারে মস্কোর প্রতিক্রিয়া আরো কঠোর। তেহরানস্থ রুশ রাষ্ট্রদূত অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে জানান যে, আমেরিকার শত চাপের মুখেও রাশিয়া পারমাণবিক চুল্লী বিক্রির সিদ্ধান্ত বাতিল করবে না।

www.pathagar.com

ভারত-মার্কিন সম্পর্কে ভাটা

চলতি বছরের ২৪ মে ভারতের নতুন পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রণব মুখার্জী যখন আমেরিকা যান তখন তাঁর মার্কিন প্রতিপক্ষ ওয়ারেন ক্রিস্টোফার জনসমক্ষে ইরানের বিরুদ্ধে বিষোদগার করেন। মার্কিন মন্ত্রীর অভিযোগ মোতাবেক ইরান তিনটি অপকর্ম করছে। ১. রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস, ২. মধ্যপ্রাচ্য শান্তি প্রচেষ্টা বানচাল এবং ৩. পরমাণু অস্ত্র নির্মাণ প্রচেষ্টা। ক্রিস্টোফারের ইরানবিরোধী আক্রমণের মুখে প্রণব মুখার্জী স্থির এবং অচঞ্চল কণ্ঠে মার্কিন নেতৃবৃন্দকে জানিয়ে দেন, "আমেরিকার সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের পাশাপাশি রাশিয়া এবং ইরানের সাথেও ভারত তার ঐতিহ্যবাহী সম্পর্ক অটুট রাখবে।"

উপসাগরীয় যুদ্ধ এবং কমিউনিজমের পতনের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যখন একক পরাশক্তি হিসাবে আবির্ভূত হয় তখন থেকেই ভারত-মার্কিন সম্পর্কোন্নয়নের প্রক্রিয়া শুরু হয়। কিন্তু ১৯৯৪ সালের ২৮ অক্টোবর সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী রবিন র‍্যাফেল ঘোষণা করেন, "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কাশ্মীরকে একটি বিতর্কিত এলাকা বলে মনে করে। কাশ্মীরের ভারতভুক্তি চূড়ান্ত নয়।" ঐ বছর ডিসেম্বর মাসে হোয়াইট হাউস থেকে কাশ্মীরের সশস্ত্র স্বাধীনতা যোদ্ধাদের একটি উপদলের কমান্ডরের কাছে লিখিত পত্রে বলা হয়, "কাশ্মীরে শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্য আমি আপনার এবং অন্যান্যদের সাথে কাজ করার জন্য অপেক্ষা করছি।" এটা ছিল ভারত-মার্কিন সম্পর্কে এক আমোচনীয় দাগ।

দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়ার মার্কিন নীতির পুর্নমূল্যায়ন

দক্ষিণ এশিয়ার মার্কিন পর্যবেক্ষকদের মতে স্নায়ু যুদ্ধোত্তর সময়ে আমেরিকা এশিয়ার সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ দেশ, যথা- চীন, ভারত, রাশিয়া (আংশিকভাবে এশিয়ান) এবং পাকিস্তানের সাথে দ্বিপাক্ষিক ভিত্তিতে সম্পর্ক গড়ে তোলায় সচেষ্ট হয়। বাহ্যিকভাবে সম্পর্ক স্বাভাবিক দেখাবার কসরত থাকলেও ভারত, চীন ও রাশিয়ার মধ্যে একটি মার্কিনবিরোধী অলিখিত বন্ধনের নীরব উন্মেষ ঘটতে শুরু করে। ঐদিকে পশ্চিম এশিয়ায় ইরান নতুন করে সামরিক শক্তি অর্জন করতে শুরু করে। ইরানকে জঙ্গী বিমান, ট্যাঙ্ক, ক্ষেপণাস্ত্র ও সাবমেরিন সরবরাহ করে রাশিয়া, চীন ও উত্তর কোরিয়া। সামরিক প্রযুক্তি বিনিময় করে ভারত। পাকিস্তানের সাথে সম্পর্ক তিক্ত হওয়ার ফলে আমেরিকা ইরান, মধ্য এশিয়ার ছয়টি মুসলিম রাষ্ট্র- আফগানিস্তান ও পাকিস্তানে বন্ধুহীন হয়ে পড়ে। এক্ষণে ভারত, চীন ও রাশিয়ার সখ্যতা বৃদ্ধির লক্ষণ দেখে আমেরিকা বুঝতে পারে যে, এশিয়ার বিশাল বিস্তীর্ণ অঞ্চলে আমেরিকা কোণঠাসা হয়ে পড়ছে। এমন একটি বন্ধুহীন বিপন্ন অবস্থায় আমেরিকাকে স্মরণ করতে হয় পুরাতন মিত্র কিন্তু বর্তমানে পরিত্যক্ত পাকিস্তানকে।

পাকিস্তানের অসাধারণ স্ট্র্যাটেজিক গুরুত্ব

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই বিলম্বিত বোধোদয় হয়েছে যে, আফগানিস্তান এবং মধ্য এশিয়ার মুসলিম দেশসমূহের সাথে ভৌগোলিক সংলগ্নতা রয়েছে ইরানের। আফগানিস্তান এবং মধ্য এশিয়ার সাথে একই অবস্থান রয়েছে অপর একটি রাষ্ট্রের। সেটা হল পাকিস্তান। এ ছাড়াও পাকিস্তান গণচীন ও ইরানেরও নিকট প্রতিবেশী। মধ্য এশিয়া, ইরান, আফগানিস্তান এবং গণচীন সকলের সাথেই পাকিস্তানের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ।

www.pathagar.com

গত সেপ্টেম্বর মাসে সিনেট ফরেন রিলেশন্স কমিটিতে রবিন র‍্যাফেল সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, চীন ও পাকিস্তানের প্রভাব খর্ব করার জন্য মধ্য এশিয়া এবং আফগানিস্তানে ভারত তার প্রভাব সম্প্রসারিত করতে চায়। এ জন্য ভারত ইরান থেকে শুরু করে আফগানিস্তান ও মধ্য এশিয়া হয়ে রাশিয়া পর্যন্ত ল্যান্ড ট্রানজিট প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় রত। রবিন র‍্যাফেলের সাক্ষ্য অনুযায়ী পাকিস্তান ও তুর্কমেনিস্তান পর্যন্ত গ্যাস পাইপ লাইন প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী। দ্বিতীয়ত আমেরিকার জানি দুশমন ইরানকে গণচীন গ্যাস সেন্ট্রিফিউজ চালিত আণবিক চুল্লী সরবরাহ করছে। এই চুল্লী থেকে আণবিক অস্ত্র নির্মাণ সম্ভব। সুতরাং আমেরিকা এই বিষয়টি নিয়ে ঘোরতর উদ্বিগ্ন। তৃতীয়ত আমেরিকা ভারত উপমহাদেশে শক্তিসাম্য একদিকে সম্পূর্ণ ঝুলে পড়ুক সেটা এখন আর চায় না। এর ফলে ভারতের উপর তার প্রভাব নিঃশেষ হবে না। চতুর্থত যদি পাকিস্তানে সামরিক সাহায্য পুনরারম্ভ করা না হয় তাহলে ভারত ভীতির কারণে পাকিস্তান তার আত্মরক্ষার তাগিদে পরমাণু শক্তির ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে পড়বে। রবিন র‍্যাফেল গত মার্চ মাসে বলেন যে, ইরান পাকিস্তানের সামরিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য ব্যাপক অর্থনৈতিক সাহায্যের প্রস্তাব করেছে। বিনিময়ে চায় পারমাণবিক প্রযুক্তি। গত সেপ্টেম্বরে তিনি পুর্নবার বলেছেন যে, এখন পর্যন্ত পাক-ইরান পরমাণু ও সামরিক গাটছড়ার কথা শোনা যায়নি। মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী উইলিয়াম পেরীর মতে, চীনের ভয়ে ভারত আণবিক বোমা বানিয়েছে। অনুরূপভাবে ভারতের ভয়ে পাকিস্তান আণবিক বোমার দিকে ঝুঁকে পড়েছে।

আত্মরক্ষার তাগিদে পাকিস্তান যাতে শতকরা ১ শত ভাগ চীনের উপর নির্ভরশীল না হয় এবং মার্কিনবিরোধী ইরান-চীন অক্ষশক্তিতে যোগ দিতে বাধ্য না হয় সে জন্য ভারতের অনিশ্চিত ও অবিশ্বস্ত বন্ধুত্বের চেয়ে পাকিস্তানের পরীক্ষিত বন্ধুত্বকেই বেশি করে গুরুত্ব দিচ্ছেন প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন, প্রতিরক্ষামন্ত্রী উইলিয়াম পেরী, জ্বালানিমন্ত্রী লেয়ার এবং সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী রবিন র‍্যাফেল।

সূত্র ঃ দৈনিক ইনকিলাব তাং ২১-১০-৯৫

www.pathagar.com

ভারতের মোকাবিলায় হাইড্রোজেন বোমা নির্মাণের পথে পাকিস্তান

গত ১৮ ও ১৯ আগষ্ট জার্মান নগরী বার্লিনে ইউরেনিয়াম এবং প্লুটোনিয়াম পাচারের কথিত পরিকল্পনা ফাঁস হওয়ার পর ভারত এবং পাকিস্তানের পারমাণবিক ক্ষমতা এবং ভবিষ্যৎ কর্মসূচী সম্পর্কে কতিপয় অজানা তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। অসমর্থিত ঐসব তথ্য মোতাবেক ভারতের অস্ত্রভাণ্ডারে ইতোমধ্যেই ১শ'টি পারমাণবিক বোমা মজুদ রয়েছে। পক্ষান্তরে পাকিস্তানের অস্ত্র গুদামে ৮ থেকে ১৬টি আণবিক বোমা মজুদ রয়েছে। ১৯৮৪ সালে মার্কিন সিনেটর এ্যালান ক্র্যানস্টন সিনেটে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন যে, পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদের নিকটস্থ কাহুটা এ্যাটমিক প্ল্যান্টে ৪৫ কেজি উচ্চমানের ইউরেনিয়াম উৎপাদন ক্ষমতা রয়েছে। এই ইউরেনিয়াম দিয়ে ১৫ থেকে ২০ কিলোটন ক্ষমতাসম্পন্ন পারমাণবিক বোমা বানানো সম্ভব। ক্র্যানস্টন সেদিন আরো বলেছিলেন যে, পাকিস্তান তার কাহুটা পারমাণবিক চুল্লির ক্ষমতা সম্প্রসারণ করছে। এর ফলে ৯০ থেকে ১২০ কেজি উচ্চমানের সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম উৎপাদন করা সম্ভব হবে। এই সম্প্রসারিত ক্ষমতায় ৫ থেকে ৭টি আণবিক বোমা বানানো সম্ভব হবে।

১৯৮৯ সালের এপ্রিল মাসের মার্কিন 'টাইম' ম্যাগাজিন এবং ১৯৯৩ সালের 'কনস্টেমপোরারি সাউথ এশিয়া' প্রভৃতি সাময়িকীকে উদ্ধৃত করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের সাময়িকীর সর্বশেষ সংখ্যার এক রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, ১৯৯০ সালের শেষে পাকিস্তান কাহুটা কমপ্লেক্সের ক্ষমতা বাড়িয়ে ৩২৫ কেজি করেছে। এর ফলে ৮ থেকে ১৬টি বোমা বানানো সম্ভব, যেসব বোমার প্রতিটি হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে নিক্ষিপ্ত বোমার চেয়ে অনেক গুণ বেশি শক্তিশালী। ১৯৯৩ সালের শেষে লন্ডনের স্ট্র্যাটেজিক স্ট্রাডিজ ইনস্টিটিউটে পাকিস্তানের পররাষ্ট্র সচিব জনাব শাহরিয়ার খানের একটি উদ্ধৃতি দেওয়া হয়। জনাব খান বলেন যে, একটি স্ক্রু ড্রাইভার মোচড় দিতে যতটুকু সময় লাগে আণবিক বোমা বানানোর ব্যাপারে পাকিস্তান ঠিক ততটুকু সময় দূরে রয়েছে।

পক্ষান্তরে ভারতের পারমাণবিক ক্ষমতা সম্পর্কে বিভিন্ন সূত্র থেকে বিক্ষিপ্তভাবে যেসব খবর আসছে ঐসব খবর থেকে দেখা যায় যে, অসংখ্য বোমা বানাবার জন্য যে বিপুল পরিমাণ উপকরণ প্রয়োজন সেসব উপকরণ ভারতের শেলফে বিপুল পরিমাণে মওজুদ রয়েছে। আরও মওজুদ রয়েছে একাধিক বিশেষজ্ঞ দল (স্পেশালিস্ট টীম)। এসব টীম এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছে। হুকুম পেলেই তাঁরা মুহূর্তের মধ্যে উপকরণগুলো সংযোজন (এ্যাসেম্বল) করবেন মাত্র। মুহূর্তেই অসংখ্য আণবিক বোমা তৈরি হয়ে যাবে।

www.pathagar.com

'অগ্নি' ও 'পৃথ্বি' ক্ষেপণাস্ত্রের নেপথ্যে

এ ব্যাপারে বাংলাদেশের একজন প্রতিথযশা পদার্থ বিজ্ঞানী ঘরোয়া আলোচনাকালে ভারতীয় পারমাণবিক বিজ্ঞানী ডক্টর ডি, শর্মার একটি উক্তির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ১৯৮৯ সালে ডক্টর শর্মা বলেছিলেন যে, ভারতে প্লুটোনিয়ামের যে বিপুল মওজুদ রয়েছে এবং দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র নির্মাণের জন্য যে বিপুল অর্থ বিনিয়োগ করা হয়েছে এর ফলে আগামী ৫ বছরের মধ্যে ভারত পারমাণবিক ক্ষেত্রে পরাশক্তির মর্যাদা অর্জন করবে। ডক্টর শর্মার এই উক্তির পর পাঁচ বছর গত হয়েছে। এখন ১৯৯৪ সালে ভারত ভূমি থেকে ভূমিতে নিক্ষেপক (এসএএস বা 'সাস') ক্ষেপণাস্ত্র তৈরি করেছে। বর্তমানে এসব ক্ষেপণাস্ত্রের লক্ষ্য ভেদের নির্ভুলতা এবং কারিগরি উৎকর্ষতা নিরূপণে ব্যস্ত ভারত।

'অগ্নি' নামে যে মিসাইল ভারত তৈরি করেছে এটার পাল্লা হল ২৫০০ মাইল। এটাকে আইসিবিএম বা আন্তঃমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র হিসেবে ওরা বিবেচনা করতে চান। 'পৃথ্বি' নামক 'সাস'টির পাল্লা হল ১ হাজার মাইল লন্ডন এবং স্টকহোম থেকে প্রকাশিত এবং অপ্রকাশিত তথ্য হতে জানা যায় যে, ভারতের কাছে আণবিক বোমা বানানো বা মওজুদ করা এখন আর কোন সমস্যার নয়। সমস্যা হল তার ডেলিভারী সিস্টেম। ভারতের কাছে ৬ স্কোয়াড্রন মিরাজ-২০০০ জঙ্গী বিমান আছে। তবে কোন এফ-১৬ বিমান নেই। এফ-১৬ বিমানে পারমাণবিক বোমা বহন করার ব্যবস্থা রয়েছে। ভারতের কাছে এই বিমানটি নেই। পারমাণবিক বোমা পরিবহনের মত কেরিয়ারের অভাব ছিল। 'অগ্নি' এবং 'পৃথ্বি' এই অভাব পূরণ করবে বলে তথ্যাভিজ্ঞ মহল মন্তব্য করেছেন।

রুশ ইউরেনিয়াম ঃ প্রথম চালান না ৫০ নং চালান?

ইতিমধ্যেই এ খবর প্রকাশিত হয়েছে যে, বার্লিনে জার্মান পুলিশ ৭টি ফ্ল্যাটে তল্লাশি চালিয়েছে। এই তল্লাশির পর পুলিশ দুইজন পোলিশ, একজন জার্মান এবং একজন পাকিস্তানী নাগরিককে গ্রেফতার করেছে। জার্মানীর জাস্টিস মন্ত্রণালয় থেকে বলা হয়েছে যে, তল্লাশির পর এমন কিছু দলিল পাওয়া গেছে যেসব দেখে ধারণা হয় যে, গ্রেফতারকৃত তিন ব্যক্তি পাকিস্তানে প্লুটোনিয়াম চোরাচালানের সাথে জড়িত ছিল। আরও ধারণা করা হচ্ছে যে, ঐ প্লুটোনিয়াম হয়তো ইতিমধ্যেই পাকিস্তানে পাঠানো হয়েছে অথবা পাঠাবার প্রস্তুতি চলছিল। এসব প্লুটোনিয়াম পাকিস্তানে পাঠানোর জন্য নাকি রাশিয়া থেকে গোপনে আনা হয়। ঐ খবরে বলা হয় যে, চালানটি পাঠানোর কথা ছিল (বা পাঠানো হয়েছে) তার পরিমাণ ৬০ কেজি বা ১৩২ পাউন্ড। মূল্য ১০ লাখ মার্কিন ডলার ৪শ' কোটি টাকা। পাকিস্তান অবশ্য এসব অভিযোগ দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করেছে।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল এই যে, পুলিশ কিন্তু কোন ইউরেনিয়াম বা প্লুটোনিয়াম উদ্ধার করতে পারেনি। এ সম্পর্কিত দলিলের কথাই বলা হয়েছে মাত্র। এতদসত্ত্বেও পশ্চিমের একটি মহল বলছেন যে, জার্মান পুলিশ রাশিয়া থেকে পাচার করে

www.pathagar.com

আনা ইউরেনিয়াম ও প্লুটোনিয়ামের যে চালান আটক করল সেটা কি প্রথম? নাকি ইতিপূর্বে স্মাগলার হওয়া চালানগুলোর মধ্যে এটা ৫০ নং চালান? এইরূপ ধারণার স্বপক্ষে বলা হচ্ছে যে, রাশিয়া এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্যান্য প্রজাতন্ত্রের মওজুদ রয়েছে শত শত টন ইউরেনিয়াম এবং প্লুটোনিয়াম। রাশিয়া বা অন্যান্য সাবেক সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রে এগুলোর সংরক্ষণ বা রক্ষাকবচ খুব দুর্বল। সুতরাং পাকিস্তানসহ তৃতীয় বিশ্বের কয়েকটি দেশে ইতিমধ্যে হয়তো এগুলোর একটি অংশ পাচার হয়ে গেছে।

পাকিস্তান ঃ কেন হাইড্রোজেন বোমা?

বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় যে, প্রচলিত অস্ত্র সংগ্রহে ভারত অনেক আগেই পাকিস্তানকে বিরাট ব্যবধানে ছাড়িয়ে গেছে। শুধুমাত্র ১৯৮৭ সালেই ভারত ৫শ' ৭০ কোটি ডলারের অস্ত্র ক্রয় করেছে। এই পরিমাণ ইরান ও ইরাকের সম্মিলিত অস্ত্র ব্যয়ের চেয়ে বেশি এবং পাকিস্তানের ব্যয়ের চেয়ে ১২ গুণ বেশি। পাকিস্তানের পক্ষে ভারতকে এখন একমাত্র পারমাণবিক অস্ত্র দিয়েই মোকাবেলা করা সম্ভব। যদি জার্মান ইউরেনিয়াম পাচারের অভিযোগ সত্য হয় তাহলে এবার আর এ্যাটম বোমা নয়, পাকিস্তান হাইড্রোজেন বোমা বানাবার চেষ্টা করছে। কারণ রুশ ইউরেনিয়াম ও প্লুটোনিয়াম দিয়ে হাইড্রোজেন বোমা বানানো যায়।

সূত্র ঃ দৈনিক ইনকিলাব তাং ২৫-৮-৯৪

www.pathagar.com

নৌশক্তি বৃদ্ধি ঃ আধিপত্য বিস্তারের নীলনকশা

গত ২৮ ফেব্রুয়ারি (শুক্রবার) ভারতে ২০০৩-০৪ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট পেশ করা হয়েছে। এই বাজেটে প্রতিরক্ষা খাতে বরাদ্দ করা হয়েছে ৬৫ হাজার ৩শ' কোটি ভারতীয় রুপি। প্রস্তাবিত বাজেটের একটি দিক ডিফেন্স এ্যানালিস্টদের তাৎক্ষণিক মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। সেটি হলো, অন্যান্য বছরে সেনাবাহিনী ও বিমানবাহিনীর বরাদ্দ থাকত তুলনামূলকভাবে বেশী। কিন্তু এবার পূর্ববর্তী বছরগুলোর ব্যতিক্রম ঘটিয়ে নৌবাহিনীর বরাদ্দ বিপুলভাবে বৃদ্ধি করা হয়েছে। সাউথ এশিয়া ওয়াচাররা একবাক্যে বললেন যে, এই বরাদ্দের মাধ্যমে ভারতে ডিওস্ট্র্যাটেজিক অর্থাৎ ভূ-রাজনৈতিক রণকৌশলগত চিন্তাধারার আমূল পরিবর্তন প্রতিভাত হয়েছে। এতদিন ধরে ভারতের প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্রনীতির এক নম্বর টার্গেট ছিল পাকিস্তান। এবার পাকিস্তানকেন্দ্রিক সমর-নীতি থেকে সরে এসে বৃহত্তর আঞ্চলিক আধিপত্য বিস্তারের ইঙ্গিত পরিস্ফুটিত হয়েছে। এতদিন পর্যন্ত ভারতীয় সেনাবাহিনীকে নতুন নতুন অস্ত্রে সজ্জিত করার সময় দু'টি বিষয় বিবেচনায় রাখা হতো। প্রথমটি হলো পাকিস্তানের তুলনায় সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব রাখা। দ্বিতীয়টি যত স্বল্প সময়ে সম্ভব গণচীনের সমকক্ষতা অর্জন। কিন্তু এবার নৌবাহিনীর প্রতি অতিরিক্ত মনোযোগ দেয়ার ফলে ভারতের বিশাল উপকূলবর্তী উপসাগর ও সাগরসমূহ বিশেষ করে ভারত মহাসাগরের ওপর ভারতের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ও আধিপত্য বিস্তারের উদ্দেশ্য প্রকাশিত হয়েছে। বস্তুত গত বছর থেকেই ভারতের নৌবাহিনী অন্যান্য কয়েকটি দেশের সাথে মিলে মালাক্কা প্রণালীর ওপর টহলদারী শুরু করে। এবার তার নজর বিস্তৃত হলো আরও পূর্বে।

ভারতেরও পলিসি ঃ 'লুক ইস্ট'

ভারত এখন পূর্বদিকে তার নজর ফিরিয়েছে। ভারত মহাসাগরের সীমানা পেরিয়ে ভারত এবার এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায় একজন গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড় হতে চায়। এবার সামরিক বাহিনীর জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ৩৪ হাজার ৫৭৪ কোটি রুপী। বিমান বাহিনীর বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে ২৪.২৪ শতাংশ। কিন্তু নৌবাহিনীর বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে ৩৯.২২ শতাংশ। গত বছর বিমান বাহিনীর জন্য বরাদ্দ ছিল ১২ হাজার ৪০৩ কোটি রুপী। প্রস্তাবিত বাজেটের পরিমাণ ১৫ হাজার ৪১০ কোটি রুপী। বৃদ্ধি ৩ হাজার ৭ কোটি রুপী বা ২৪.২৪ শতাংশ। নৌবাহিনীর বরাদ্দ ১১ হাজার ৭৪৪ কোটি রুপী। গত বছর বরাদ্দ ছিল ৮ হাজার ৪৩৫ কোটি রুপী। বৃদ্ধি ৩ হাজার ৩০৯ কোটি রুপী বা ৩৯.২২ শতাংশ। ভারতীয় নৌবাহিনীতে সে দেশের স্বাধীনতার পর এটাই বৃহত্তম বরাদ্দ।

www.pathagar.com

সমরাস্ত্র ক্রয়ে নৌবাহিনীর প্রাধান্য

প্রতিরক্ষা বাজেটে 'ক্যাপিটাল ফান্ড' বলে একটি খাত দেখানো হয়েছে। সেই ফান্ডে বরাদ্দ করা হয়েছে ২০ হাজার ৯৫২ কোটি রুপী। এই অর্থ ব্যয় হবে নতুন নতুন সমরাস্ত্র ক্রয়ের পেছনে। নতুন সমরাস্ত্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল কির্ভক শ্রেণীর নৌযান, 'এ্যাডমিরল গরশভ' নামক বিমানবাহী জাহাজ এবং রাশিয়া থেকে টিইউ- ২২ নামক নৌ-জঙ্গী বিমান ক্রয়। এ সব কিছুই করা হচ্ছে নৌবাহিনীর শক্তি বৃদ্ধির জন্য, যাতে করে করাচীর উপকূলবর্তী আরব সাগর থেকে থাইল্যান্ড উপকূলবর্তী আন্দামান সাগর পর্যন্ত সুবিস্তৃত এলাকা ভারতীয় নৌবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে থাকে।

বাংলাদেশ সীমান্তে ভারতীয় প্রতিরক্ষা জোরদার

বাংলাদেশের সাথে ভারতের সম্পর্কের ক্রমাবনতি ঘটছে। এই সম্পর্কের উন্নতি ঘটার কোন আশু সম্ভাবনা নজরে আসছে না। সম্ভবত এ কারণেই বাংলাদেশের সাথে ভারতের সীমান্ত প্রতিরক্ষা শক্তি জোরদার করার জন্য প্রস্তাবিত বাজেটে বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে ৩০০ শতাংশ। সীমান্ত শক্তি জোরদার করার পদক্ষেপ সমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ভারতের সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর (বিএসএফ) জন্য টহল বিমান সমুদ্র উপকূলের জন্য টহল রণতরী ক্রয়। বাংলাদেশ সীমান্ত সম্পর্কে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণখাতে বরাদ্দ ১০০শ' ভাগেরও বেশি বৃদ্ধি। গতবছর কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ খাতে বরাদ্দ ছিল ৩৬ কোটি টাকা। প্রস্তাবিত বাজেটে সেই বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে ৮০ কোটি টাকা। বাংলাদেশের সীমান্ত সংলগ্ন পাকারাস্তা নির্মাণ খাতে বরাদ্দ করা হয়েছে ১২০ কোটি টাকা।

৯ হাজার কোটি টাকার গোপন ফান্ড

এবারের বাজেটে একটি বিরাট চালাকি করা হয়েছে। সেটা হল ৩শ' কোটি টাকার বৃদ্ধি। বলার চেষ্টা করা হচ্ছে যে প্রতিরক্ষা খাতে এবার কোন ব্যয় বৃদ্ধি করা হয়নি। কিন্তু একশ্রেণীর প্রতিরক্ষা বিশ্লেষক, যারা বেশ কিছুদিন ধরে বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়ার ওপর শ্যেন দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছিলেন, তারা একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলেছেন। তারা জানতে চাচ্ছেন যে, চলতি প্রতিরক্ষা বাজেটের বরাদ্দ থেকে ৯ হাজার কোটি টাকা অব্যবহৃত থেকে গেছে। সেই টাকা গেল কোথায়? প্রশ্নবানে জর্জরিত হয়ে অর্থমন্ত্রী স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, ঐ অর্থ প্রস্তাবিত বাজেটে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই বিশাল অর্থ নৌবাহিনীর জন্য সাবমেরিন, অপর একটি রণতরী এবং প্রশিক্ষণ বিমান ক্রয়ে ব্যয় করা হবে। সুতরাং প্রস্তাবিত বাজেটে সামরিক ব্যয় বাড়ানো হয়নি বলে ভারত যে প্রচারণা চালাবার চেষ্টা করছিল, সেই প্রচারণা শুরুতেই মুখ থুবড়ে পড়েছে। কারণ সেখানে রয়েছে ৯ হাজার কোটি টাকার এক বিরাট শুভঙ্করের ফাঁক।

সূত্র ঃ দৈনিক ইনকিলাব; ৪-৩-২০০৩

www.pathagar.com

www.pathagar.com

লেখক পরিচিতি

জনাব মোবায়েদুর রহমান ১৯৪২ সালের এপ্রিল মাসে বগুড়া শহরে জন্মগ্রহণ করেন। বগুড়া জিলা স্কুল ও আজিজুল হক কলেজ, বগুড়া থেকে যথাক্রমে ম্যাট্রিক ও আই.এ পাশ করেন। তিনি ১৯৬২-৬৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে অনার্স ও এম.এ ডিগ্রী লাভ করেন। ছাত্র জীবনে তিনি 'দৈনিক আজাদের' রিপোর্টার হিসাবে সাংবাদিকতার সাথে যুক্ত হন। পরবর্তীতে বিসিকে (ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থা) ডেপুটি ডিরেক্টর এবং বিটিএমসির অধীন ৬টি রাষ্ট্রায়ত্ব কারখানায় প্রধান নির্বাহী হিসাবে মোট ২০ বৎসর চাকুরী করেন।

সাংবাদিক জীবনে তিনি 'দৈনিক আজাদ' ও 'দৈনিক পূর্বদেশে' রির্পোটিং ও সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ করেন। এ ছাড়া তিনি অধুনালুপ্ত 'দি মর্নিং সানে' নিয়মিত কলামিষ্ট এবং 'বাংলাদেশ অবজারভারে' সম্পাদকীয় লেখক হিসাবে কাজ করেন। তিনি অধুনালুপ্ত সাপ্তাহিক 'ঝান্ডা' ও 'দৈনিক সকালের খবরের' প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন।

জনাব মোবায়েদুর রহমান বর্তমানে 'দৈনিক ইনকিলাবের' বিশেষ সংবাদদাতা এবং নিয়মিত কলামিষ্ট। **রূপকার ছদ্ম** নামে তিনি দৈনিক ইনকিলাবে **'রাজনৈতিক রঙ্গালয়'** শীর্ষক যে নিয়মিত সাপ্তাহিক কলাম লিখতেন সেটা বাংলাদেশে অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। জনাব মোবায়েদুর রহমান 'দৈনিক দিনকাল', 'বাংলাবাজার পত্রিকা' এবং 'দৈনিক সংগ্রামে' ফ্রি ল্যান্সার হিসাবে লিখে থাকেন। একজন বুদ্ধিজীবি হিসাবে বিভিন্ন সেমিনার ও গোল টেবিল বৈঠকে তাঁর বক্তব্য সচেতন জনগোষ্ঠির মাঝে বিপুল ভাবে আলোচিত হয়।

২০০১ সালের অক্টোবর মাসে আমেরিকা যখন আফগানিস্তান আক্রমণ করে তখন জনাব মোবায়েদুর রহমানই বাংলাদেশের একমাত্র সাংবাদিক যিনি আফগান রনাঙ্গণ এবং বেলুচিস্তান ও সীমান্ত প্রদেশ থেকে এই যুদ্ধ কাভার করেন। রনাঙ্গণ থেকে প্রেরিত তাঁর এই সব রির্পোট বিপুল ভাবে আলোচিত ও প্রসংশিত হয়।

পেশাগত কাজে জনাব মোবায়েদুর রহমান এশিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকার অনেক শহর একাধিকবার সফর করেন।

মোঃ গফুর হোসেন

প্রকাশক